# অসমীয়া গল্প সংকলন

আদান-প্রদান

# অসমীয়া গল্প সঙ্কলন

সম্পাদনা

নির্মলপ্রভা বরদলৈ

অনুবাদ

সুজিৎ চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

## সূচীপত্র

# অসমীয়া ছোট গল্পের ধারা

জীবনের কোনো কোনো চরম মুহূর্তের শিল্পসম্মত প্রকাশ শুধুমাত্র ছোটগল্পের মাধ্যমেই ঘটতে পারে, তাই আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে ছোটগল্প আজ এতটা জনপ্রিয়। অবসরহীন দ্রুত গতিবেগ সম্পন্ন আজকের সমাজে দীর্ঘতম মহাকাব্য অপেক্ষা ছোট অথচ রসঘন শিল্পের আদর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। লোকায়ত সমাজে যুগযুগ ধরে প্রচলিত উপকথা বা নীতিগল্প যা প্রচলিত, যথা— হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের গল্প, জাতকের আখ্যান, ঈশপের উপকথা, বাইবেলের প্যারাব্‌ল ইত্যাদিও আয়তনে ছোট। তাহলে সেগুলোকেই বা ছোটগল্প বলা হবে না কেন? বলা হবে না কারণ টেক্‌নিক্‌ এবং বিষয়বস্তু দুয়েরই পার্থক্য রয়েছে। উপকথা বা নীতিগল্পে হ্রস্বতা এবং ঔৎসক্য থাকলেও ছোট গল্পে জীবনের খণ্ডিত রূপের যে বুদ্ধিদীপ্ত, অর্থপূর্ণ এবং মোহনীয় ব্যঞ্জনা থাকে, তা সেখানে অনুপস্থিত। উপকথায় কল্পনা থাকলেও তা গতানুগতিক। উপকথা বা নীতিগল্পে ছোটগল্পের অন্তরালবর্তী ইঙ্গিতময়তা থাকে না।

অসমীয়া ছোটগল্প গড়ে ওঠে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শেখভ, মোপাসাঁ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গল্পকারের গল্প পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আর তার প্রভাব আসামকেও স্পর্শ করেছিল। স্বনামধন্য লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই অসমীয়া সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রথম রূপকার হিসাবে সম্মানিত। আসামের মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীন সমাজের টাইপ চরিত্রগুলির সঙ্গে বেজ-বরুয়ার নিবিড় পরিচয় ছিল। তিনি সেই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে মহত্ব, মানবিক দোষগুণ, হাসি-অশ্রু, বেদনা-হতাশা ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক রূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন (যেমন ভদরী, পাতমুগী, আশার সংসার ইত্যাদি)। হাস্যরসাকীর্ণ, তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সমাজের কুসংস্কার, মিথ্যাচার, পাশ্চাত্য জীবনরীতির অন্ধ হাস্যকর অনুকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর রসাল গল্প লিখে তিনি তাঁর 'রসরাজ' উপাধির সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছিলেন (ভেমপুরিয়া মৌজাদারা, সেঁউতি, জগরা মণ্ডলের প্রেমাভিনয়, মলক্‌ গুইন্‌ গুইন্‌, ভোকেন্দ্র বরুয়া ইত্যাদি)। বেজবরুয়ার গল্পের গাঁথুনি সকল সময়ে নিখুঁত নয়, কিন্তু তাঁর গল্পে সমসাময়িক অসমীয়া সমাজ যথাযথ ভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং এই চিত্রায়নই তাঁর গল্পকে কালজয়ী করেছে।

সাহিত্যে রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী বৈষম্য, সামাজিক অবিচার, ক্ষমতার নিষ্পেষণে জনগণের লাঞ্ছনা, প্রেমের মহত্ত্ব, অবৈধ প্রণয়ের রোমাঞ্চ ইত্যাদি বিষয় সমূহের উপর লেখকদের দৃষ্টি পড়ল আর সংস্কারকামী মনোভাব নিয়ে সেই সমস্ত বিষয়বস্তুকে সুতীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপিত করার মাধ্যম হিসাবে ছোট গল্পের ব্যবহার শুরু হল। উপন্যাস সম্রাট রজনীকান্ত বরদলৈ-এর 'গাধন' নামক গল্প এবং শরৎচন্দ্র গোস্বামীর 'ময়না' এবং 'গল্পাঞ্জলী' নামক দুটি গল্পসংকলনে গ্রথিত কয়েকটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গোস্বামীর 'বনরীয়া প্রণয়' নামক গল্পে বাধার প্রাচীরে প্রতিহত মিরি তরুণ-তরুণীর বন্য প্রেম, 'নদরাম' নামক গল্পে সাধারণ মানুষের মহত্ব, 'যাত্রী' এবং 'ব্রহ্মপুত্রের বুকত' নামক দু'টি গল্পে অবৈধ প্রণয়ের মাদকতা সুন্দর কৌশলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে গোস্বামীর বাস্তবধর্মী গল্পগুলোতে বালবিধবার করুণ ক্রন্দনও ধ্বনিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র গোস্বামী, রজনীকান্ত বরদলৈ-এর সমসাময়িক হিসাবে দণ্ডিনাথ কলিতার নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলিতার গল্পের চরিত্রগুলি এই বৈষম্যপূর্ণ সঙ্কীর্ণ সমাজকে সংস্কার করে আদর্শের আলোয় বিভূষিত করতে উন্মুখ। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতেও এই সমস্ত চরিত্র পরাজয় মেনে নেয় না। 'সাতশরী'তে যে গল্পগুলো স্থান পেয়েছে তাতে অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'হরিচরণর বিয়া' নামক গল্পে জাতিভেদের উপর কুঠারাঘাত করে ব্রাহ্মণ যুবক এবং শূদ্র কন্যার মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

এই সমস্ত গল্পকারের পর লক্ষ্মীধর শর্মার গল্পগুলি রচিত হয়, যেগুলি সম্প্রতি "ব্যর্থতার দান" নামক সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর গল্পের মাধ্যমে অসমীয়া ছোটগল্প যেন নূতন একটা মর্যাদার স্তর অতিক্রম করল। লক্ষ্মীধর শর্মা বিপ্লবী মনোবৃত্তি সম্পন্ন লেখক, তাঁর গল্পে রয়েছে সমাজ সচেতনতা এবং জটিল মনোবিশ্লেষণ। সামাজিক ভীরুতাকে তাঁর গল্প যেন নিঃশেষ করে দিতে চায়, সমাজের অগ্রগমনের দিকনির্দেশ যেন তাঁর সংগ্রামী চরিত্রগুলো নিজস্ব কর্মের মাধ্যমেই উপস্থাপিত করতে চায়। তাঁর 'বিদ্রোহিনী' নামক গল্পে সামাজিক অন্যায় অবিচারের পটভূমিতে একজন বিধবার বিদ্রোহী মনোভাব স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

অসমীয়া ছোট গল্পের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সূত্রপাতকে প্রকৃতপক্ষে বর্ষার কলোচ্ছ্বাসের মতো পরিপূর্ণ করে তোলে "আবাহনী যুগ"। "আবাহন" পত্রিকার বিস্তৃত বক্ষে গল্প লেখকদের গল্পস্রোত অবিরাম বইতে শুরু করে। 'আবাহন'-এর প্রাণপুরুষ নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর 'আবাহনে' প্রকাশিত অনেক গল্প এখন "বীণার ঝংকার" এবং "নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প" নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেম এবং জীবনই তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। আবাহন যুগের আরো দুজন জনপ্রিয় লেখক নলিনীকান্ত বরুয়া এবং চিত্রভানু চৌধুরী। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক নলিনীকান্ত বরুয়া অকালমৃত্যু

বরণ করেন। "জীবনের খলা-বমা" নামক গল্পের মাধ্যমে চিত্রভানু চৌধুরী প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা নিয়ে সদানন্দ দাসও অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনের আন্তরিক চিত্রণ এবং পরিবেশ রচনার দক্ষতায় ঔপন্যাসিক রাধিকামোহন গোস্বামী নিজেকে একজন কৃতী গল্পকার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। "নিয়তি", "দেবতার সমাধি", "অসমাপ্ত", "স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট" প্রভৃতি গল্প সত্যিই স্মরণীয়। কৃষ্ণ ভূঞা এবং মুনীম বরকটকী তাঁদের মনোবিশ্লেষণাত্মক নূতন ধরনের গল্প 'আবাহন'-এর পাতাতেই লিখতে শুরু করেন। কিন্তু এই দুজনের লেখনী অসময়ে নীরব হয়ে যায়। "অতীতের স্মৃতি" নামক গল্প সংকলনের লেখক শ্রীহরেন্দ্রনাথ কলিতাও আবাহন যুগেরই গল্পকার।

মহীচন্দ্র বরা, ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী, হলিরাম ডেকা, লক্ষ্মীনাথ ফুকন, বীণা বরুয়া —এই সকল সার্থক রচয়িতাও আবাহন যুগেরই। একাধারে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং কবি মহীচন্দ্র বরার মূল বৈশিষ্ট্য হল হাস্যরসের আভাস মেশানো তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা কৌশল। সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে বিরাজমান ভণ্ডামি, মূঢ়তা ও শংকটের মুখোমুখি নিশ্চল নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন এবং জীবনের মধ্যে নিহিত ছোট ছোট প্রহসন অতীব দক্ষতার সঙ্গে এই লেখক অঙ্কন করেছেন। "অসার খলু সংসার", "যোগ এবং বিয়োগ", "জয়-পরাজয়", "উকিলের জন্ম-রহস্য" ইত্যাদি মহীচন্দ্র বরার গল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জাষ্টিস হলীরাম ডেকার গল্পে রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনের সৌন্দর্য, শঙ্কা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদিকে কখনও বা করুণভাবে, কখনও বা হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপন করার রীতি। "মরা ঘোরা আরুরে বড়ে ভাই" গল্পের আবেদন এমনিতেই চিরন্তন। আজীবন সংবাদসেবী লক্ষ্মীনাথ ফুকনের গল্প সংকলন 'ওফাই দণ্ডিত"-এ অন্তসারশূন্য আধুনিক চরিত্রের বাইরে-দেখানো মিথ্যা ভড়ং-এর নিপুন ছবি অঙ্কিত হয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা এবং জুৎসই ইডিয়মের যথাযোগ্য প্রয়োগের মাধ্যমে সরল এবং রসালো গল্প লিখে শ্রীফুকন খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন কৃতী সমালোচক শ্রীত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী বাস্তবধর্মী ও সংস্কারমুখী সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে গল্পকার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। "অরুণা" এবং "মরীচিকা" নামক দুটি গল্প সংকলনে বালবিধবার অসহায় যন্ত্রণার মতো সামাজিক নিষ্ঠুরতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় জাত নৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতিগ্রস্থ পরিবেশে মানবাত্মার দ্বিধা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। ডঃ বিরিঞ্চকুমার বরুয়াই বীণা বরুয়া ছদ্ম-নামে এই সময়ে নিখুঁত বর্ণনাত্মক রীতির গল্প লিখে চরিত্র এবং পরিবেশ বর্ণনায় সাবলীল দক্ষতা দেখিয়েছেন। "পট পরিবর্ত্তন", "অঘোনিবা" গল্প দুটি এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ঔপন্যাসিক দীননাথ শর্মা নিজস্ব মৌলিক রীতিতে, শিক্ষাবিদ উমানাথ শর্মা মনোবিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে, প্রেম নারায়ণ দত্ত অতিশয়োক্তি

এবং হাস্যরসের মাধ্যমে, নির্মলা দেবী সহজ সরল সাবলীলতায় এবং সুপ্রভা গোস্বামী প্রকৃতিপ্রীতির নিদর্শনে গল্প লিখে আবাহন যুগকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

আবাহন যুগের সবচাইতে জনপ্রিয় লেখক রমা দাস আজও খ্যাতিমান লেখক। তাঁর গল্পে উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত জীবনের রোমাঞ্চ মূল উপজীব্য। মানব চরিত্রের অন্তরালে চিরপ্রবাহিত জৈবিক বাসনা শিক্ষিত সমাজের কল্পনা বিলাসিতার সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং কত অবাধ ভাবে বিচরণশীল, তার মনোরম চিত্র বড় আকর্ষণীয় ভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের রূপায়ণের ব্যাপারে নিখুঁত প্লটের গঠন এবং মনোরম ভাষা তাঁকে সাহায্য করেছে। "সেতু-বন্ধন", "অচল টাকা" "জাহ্নবী" ইত্যাদি তাঁর উৎকৃষ্ট গল্প।

সৈয়দ আবদুল মালিকের আবির্ভাব আবাহন যুগের শেষের দিকে। তারপর আজ পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে অভাবনীয় জনপ্রিয়তার দ্বারা তিনি অসমীয়া ছোট গল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। জীবন বিচিত্র, জীবন ব্যাপক, জীবন মহত্বপূর্ণ এই প্রত্যয় নিয়ে জীবনকে অতি অন্তরঙ্গ ভাবে মালিক অধ্যয়ন করেছেন। প্রথম দিকে চিরন্তন মানবীয় আবেগ, প্রণয়, বেদনা, ভুল বোঝা বা না বোঝার সূক্ষ্ম ছবি এঁকে মালিক সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেন। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে মনোবিশ্লেষণাত্মক কৌশলে সমাজের প্রতিটি স্তরের চরিত্রকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। রাজনৈতিক অবিচার অথবা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে সৃষ্ট কারুণ্য, সামাজিক বৈষম্য, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার সংঘাত, অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত শিল্প প্রতিভা, যৌনধর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিকে কখনও বা মার্ক্সীয়, কখন ও বা ফ্রয়েডীয় এবং সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টির সাহায্যে মালিক অঙ্কন করেছেন। মনোরম ভাষা এবং শেষ পর্যন্ত উৎকণ্ঠা বাজায় রাখার কৌশল মালিকের গল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব ইতিমধ্যেই আসামের জীবন এবং সাহিত্যের উপর পড়েছিল। পুরানো ধ্যান-ধারণা আদর্শ ইত্যাদিকে দ্বিতীয় মাহাযুদ্ধ প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনও একই সময়ে ভারতকে প্রচণ্ড ভাবে আলোড়িত করেছিল। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যুগ নূতন একদল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল। এদের ভিতর কবি ও যশস্বী ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের নাম প্রথমেই করতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পত্র-পত্রিকাদি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর "রামধেনু"-র উদয়ে নূতন এক যুগের সূচনা হয়। "রামধেনু-র" মাধ্যমে নূতন একদল লেখকের সৃষ্টি হয়। অবশ্য "জয়ন্তী" এবং "পাছোয়া" নামক পত্রিকা দুটির অবদানও স্বীকার্য।

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের গল্পের পটভূমিরূপে আসাম, আসামের প্রতিবেশী পাহাড় এবং সাগরের ওপারের দেশকে একই সঙ্গে উপস্থাপিত করার ব্যাপারটা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে আসামের গ্রামীণ কৃষক শ্রেণীর স্বাধীনতার

জন্য কামনা, সেই কামনা থেকে গড়ে ওঠা স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের মর্মন্তুদ পরিণতি এবং সামাজিক অবিচারের পটভূমিতে বিপ্লবের বিদ্যুৎ স্পর্শ বুলিয়ে বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য জোরালো সব-গল্প লিখতে শুরু করেন। তিনি একাধারে যেমন মানব চরিত্রের অবচেতনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ফ্রয়েডীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে কিছু গল্প লিখেছেন, অথবা সংস্কারধর্মী মহৎ আদর্শকে মানসিক সংঘাতের আবহে ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে তেমনি আণবিক বোমার বিস্ফোরণে সংঘটিত মানব-জীবনের করুণতম ট্র্যাজেডির চিত্র তুলে ধরে আন্তর্জাতিক বিষয় বস্তুর উপর গল্প রচনার আদর্শ স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর নিপীড়িত মানবতার প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ তার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক হিসাবে সুখ্যাত যোগেশ দাস এ যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের অন্যতম। গভীর সহানুভূতি এবং হৃদয়গ্রাহী সরলতা নিয়ে এই লেখক মানব-চরিত্রের গহনে প্রবেশ করতে আগ্রহী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রসূত নৈতিক বিকার, হৃদয়, মস্তিষ্ক অথবা ব্যক্তি বনাম সমাজের চিরন্তন সংঘাত, উচ্চ আদর্শ, সামাজিক অন্যায়, মানব মনের চিরন্তন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কুশলী হাতে ফুটিয়ে তুলতে যোগেশ দাস সক্ষম। ইঙ্গিতময়তা তাঁর গল্পের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সমসাময়িক সুদক্ষ লেখক মহিম বরার গল্পে রয়েছে দ্বিমুখী প্রবাহ। অসমীয়া গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবেশ এবং চরিত্র নিখুঁত রূপে অঙ্কন করে পাঠকের হৃদয়কে করুণ রসে সিক্ত করার ক্ষমতা যেমন তাঁর রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাঁর হাতে বলিষ্ঠ হাস্যরসের অফুরন্ত সম্ভার। সঙ্কট, উৎকণ্ঠা, আর নীরসতার চাপে পিষ্ট এই বিবর্ণযুগে হাস্যরস সৃষ্টি করা সত্যিই একটি কঠিন ব্যাপার। "অপরাজিত", "চক্রবৎ", "লাড়ুগোপালের প্রেম", "মই", "পিপলি", "পূজা" ইত্যাদি গল্পে একই সঙ্গে হাস্যরস ও করুণরসের সংমিশ্রণে বরা যে রকম সক্ষম হয়েছেন, তেমনি "টোপ", "মাছ" বা "মানুহ্" ইত্যাদি গল্পে জীবন এবং প্রকৃতির মধ্যেকার মিস্টিক সম্বন্ধও তিনি দেখিয়েছেন।

ব্যঙ্গ, হাস্য এবং করুণ রসের উপাদানে সুসংগঠিত ও ঘনীভূত গল্প লিখেছেন লক্ষ্মীনন্দন বরা। পরিবর্তনের পটভূমিতে অসমীয়া গ্রামীণ জীবনের ক্ষয়িষ্ণুরূপ ও প্রতিক্রিয়া, যান্ত্রিক যুগের আমদানী করা অধঃপতন, মেশিনের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে করুণ আবেদন সম্পন্ন গল্প লিখে তিনি সুদক্ষ কলাকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তদুপরি সাম্প্রতিক কালের সামাজিক ভণ্ডামির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ গল্পের ধারাটিকে শ্রীবরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ডঃ ভবেন শইকিয়া, সৌরভকুমার চলিহা এবং হোসেন বরগোঁহাই অসমীয়া গল্প সাহিত্যের আরো তিনজন শক্তিশালী লেখক। তিনজনের গল্পের স্টাইলও স্বতন্ত্র।

ভবেন শইকিয়া খুবই জনপ্রিয় লেখক, তাঁর টেক্‌নিক্ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্ণ এবং আশ্চর্যজনক ভাবে ইঙ্গিত প্রধান। সকল ধরনের মানুষের মনের জটিল আঁকাবাঁকা পথের সন্ধান তিনি দিতে জানেন। "বর্ণবোধ", "বাণপ্রস্থ" এবং "এন্দুর" নামক গল্পে একাধিক ভিন্ন ধরনের নারীর মনের খবর তিনি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে চরিত্রগুলো অসমীয়া, আবার একই সঙ্গে সর্বদেশীয়ও বটে। আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু নিয়েও তিনি অভিনব গল্প লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, আনন্দের উচ্ছ্বলতা অথবা হাস্যমধুরতা দিয়ে তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই সূত্রপাত, কিন্তু পরিণামে তার সবগুলি মর্মস্পর্শী এবং করুণ, অন্তিম পর্যায়ে তা পাঠকের মনকে বেদনায় বিবশ করে তোলে।

হোসেন বরগোঁহাই-এর ভাষা বলিষ্ঠ, চিন্তাধারা নূতন এবং তাঁর গল্পের চরিত্র-গুলো আকর্ষণীয়ভাবে অগতানুগতিক। বিকৃত মানসিকতার উপর লেখা তাঁর কয়েকটা গল্প চমকপ্রদ এবং অসমীয়া সাহিত্যে নূতন সুরের। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব এবং অস্তিত্ববাদের প্রভাবও তাঁর কোনো কোনো স্মরণীয় গল্পে পড়েছে। নিপীড়িত জনতা এবং রাজনৈতিক ভণ্ডামির চিত্র, যৌবনের চিরন্তন ধর্মের ছবি খোলা-খুলি আঁকার সাহস ববগোঁহাইর রয়েছে।

সৌরভকুমার চালিহার স্টাইল অসমীয়া সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি যেন মুহূর্তের মধ্যে বিরাটের সংস্পর্শে পাঠককে নিয়ে যান। চেতনা স্রোতের ব্যবহারে অস্থির যুগের রুগ্ন মানসিকতা, ধূলি-ধূসরিত স্বপ্ন ইত্যাদি অতি সুদক্ষভাবে এই লেখকের গল্পে অঙ্কিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে এই লেখকই অসমীয়া সাহিত্যে "ইম্প্রেশনিস্টিক" রীতির প্রথম প্রবর্তন করেন।

"রামধনু" যুগের বিশিষ্ট লেখক রোহিনীকুমার কাকতির গল্পে ব্যক্তি এবং সমাজের দ্বন্দ্ব করুণ ভাবে ধ্বনিত। তাঁর স্বাভাবিক প্রবনতা এ যুগের দ্বিধাজর্জর চরিত্র অঙ্কনের দিকে। "মৃত্তিকা" নামক দীর্ঘ গল্পে তিনি বন্যার পটভূমিতে অসমীয়া জীবনের স্বরূপ ও মাটির মোহ সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মেদিনী চৌধুরী বিশ্বাসযোগ্য ভাবে জনজাতীয় সমাজের ছবি এঁকেছেন, সঙ্গে জীবনের ছোট ছোট সমস্যাগুলিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়ার গল্পে সাধারণত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। বাস্তব জীবন এবং আদর্শের দ্বন্দ্ব তাঁর পরিমার্জিত ভাষায় সুন্দর রূপ নেয়। এযুগের আরেক জন লেখক হলেন হেম শর্মা। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট রহস্য, ক্ষুদ্র লঘু প্রহসন ইত্যাদি নিয়ে জীবনের খণ্ডিত ছবি স্বল্প পরিসরে আঁকার ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ব। "মদার ফুলের মালা" এবং "বাটর দূর বিবরণত"-এ তাঁর গল্প সংকলিত হয়েছে। ডঃ হেম বরুয়া, যোগেন শর্মা, ক্ষীরোদ শইকিয়া, রাজেন হাজরিকা, কমল গগৈ, ললিতা বরা, গোবিন্দচন্দ্র পৈরা, দেবীদাস

নিওগ, হেমকান্ত ভূঞা, ফুল গগৈ, ঘনকান্ত চেতিয়া ফুকন, দুল ফুকন প্রভৃতি "রামধনু" যুগের বিশিষ্ট গল্পকারদের সঙ্গে যে সমস্ত মহিলা গল্প লেখিকা "রামধনু'-র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁরা হলেন স্নেহ দেবী, নিরুপমা বরগোঁহাঞি, প্রীতি বরুয়া, এবং ডঃ নীলিমা শর্মা। "নিরর্থক" নামক গল্প সংকলনের রচয়িতা প্রীতি বরুয়ার গল্প লেখা ছেড়ে দেওয়াটা দুঃখজনক। তাঁর 'হিমঘর' নামক মনোলগ্‌ধর্মী গল্প পাঠকের বহুদিন মনে থাকবে। ডঃ নীলিমা শর্মা নারী চরিত্রের রহস্য উন্মোচনে পারদর্শী ছিলেন, এখন তিনি প্রবন্ধ রচনায় নিয়োজিত। স্নেহ দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞি দরদী লেখিকা, দুজনেই জীবনের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন।

সৌমারজ্যোতি, বরদৈচিলা, মনিদীপ, অসমীয়া, নীলাচল, আমার প্রতিনিধি, নতুন প্রতিনিধি প্রভৃতি পত্রিকার অবদান অসমীয়া গল্প সাহিত্যে অনস্বীকার্য। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা ও পূজা সংখ্যায় অনেক ভাল গল্প বেরিয়েছে। যেমন সৌমারজ্যোতিতে সর্বপ্রথম সুলেখক কাঞ্চন বরুয়ার প্রতিভা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্ভাবনাময় গল্প লিখে অনেক প্রতিভাই নীবর হয়ে যায়, এটা বড়ই দুঃখজনক। বেতারকেন্দ্র থেকেও কোনো কোনো সময়ে ভাল গল্প প্রকাশিত হয়, যদিও তার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। 'রামধনু' যুগের শেষ পর্যায়ে 'রামধনু' বা অন্য পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যে সমস্ত গল্পকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন, অতুলানন্দ গোস্বামী, নিরোদ চৌধুরী, ইমরান শ্বাহ, ছাইদুল ইসলাম, মামনি রয়চম গোস্বামী, পদ্ম বরকটকী, ডঃ ভূবনমোহন দাস, সদা শইকিয়া, বীরেশ্বর বরুয়া প্রভৃতি। অতুলানন্দ গোস্বামীর করুণ আবেদন হৃদয়গ্রাহী। ছাইদুল ইসলামের গল্পে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা ইত্যাদি সমসাময়িক জীবনের ছবি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট। একাধারে ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার নিরোদ চৌধুরীর গল্পের পটভূমি বিচিত্র। আসামের চা বাগানের পরিবেশ তাঁর গল্পে উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। রোমাণ্টিক ভাষার প্রয়োগ তাঁর বৈশিষ্ট্য; পদ্ম বরকটকী মনোসমীক্ষণ মূলক উপন্যাসের লেখক, তাঁর ছোটগল্পে সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্লেষ স্থান পেয়েছে। ইমরান শ্বাহের গল্পে সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং মুসলিম সমাজের পরিবেশ অঙ্কিত হয়েছে। মামনি রয়চম গোস্বামী সাধারণত নারী চরিত্রের বৈচিত্র্য বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটাতে আগ্রহী। ডঃ ভূবনমোহন দাস এবং সদা শইকিয়া দুজনই বাস্তবধর্মী সাহসী লেখক।

ষষ্ঠ দশকের মধ্য বা শেষ পর্বের যে সমস্ত গল্প লেখক নূতন চিন্তা এবং অন্বেষণে শিল্প সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং যাঁরা অগ্রজদের সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে নগেন্দ্র শইকিয়া এবং অপূর্ব শর্মার নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার যন্ত্রনায় বিদীর্ণ প্রাত্যহিক চেতনা

প্রতিধ্বনিত হয়েছে নগেন শইকিয়া এবং অপূর্ব শর্মার রচনায় এবং একই সুরের মূর্চ্ছনা শোনা গেছে তুলনামূলক নূতন লেখক হেমেন গগৈর গল্পে। মৃত্যুচ্ছায়ায় আকীর্ণ জীবনের বর্ণনাও অপূর্ব শর্মা এঁকেছেন সুদক্ষ হাতে। নগেন শইকিয়ার মনোবিশ্লেষণাত্মক গল্পের চমকপ্রদ কৌশল উল্লেখযোগ্য। দুর্নীতির কর্কট রোগগ্রস্থ শীর্ণরূপ শ্রমজীবী কৃষক শ্রমিকের হাহাকার এবং সংগ্রাম সংকল্প ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ ভাবে বা বক্রোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে অরুণ গোস্বামী, কুমুদ গোস্বামী, চিনু হাজরিকা এবং নিত্য বরার গল্পে। অরুণ গোস্বামী এবং কুমুদ গোস্বামীর স্টাইল বলিষ্ঠ এবং সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। নূতন পুরুষের ক্রোধ এবং অস্থিরতা মূর্ত হয়েছে মহেন্দ্র বরঠাকুরের গল্পে। এ যুগের দ্বিধা, সংশয় এবং নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর তীক্ষ্ণ দৃকপাত করে সুন্দর গল্প লিখছেন গোবিন্দপ্রসাদ শর্মা। সমসাময়িক সমাজের জীর্ণ রূপ ফুটিয়ে তুলে এক নূতন সমাজের জন্ম কামনা করছেন শীলভদ্র, কেশব শইকিয়া, মুকুট বরদলৈ, তীর্থ ফুকন, অমূল্য ফুকন, হরেন ভূঞা প্রভৃতি তাঁদের গল্পে। শীলভদ্রের গল্পে সমাজ সচেতনতা এবং বিদ্রূপ উল্লেখযোগ্য। ভদ্রেশ্বর রাজখোয়া, ভুবনমোহন মোহন্ত ও কালীপ্রসাদ গোস্বামীর গল্পে গ্রাম্য জীবনের হাসি কান্না বড় আন্তরিক ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। মাত্র কয়েকটা গল্পেই অন্যতর একটি স্বাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন প্রণবজ্যোতি ডেকা। তাঁর গল্পে সমাজ চেতনা এবং ব্যঙ্গ বড় তীব্ররূপে ফুটে উঠেছে। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে অনু বরুয়া, ডলি তালুকদার, রুণু বরুয়া, উমা বরুয়া প্রভৃতি সামনের সারিতে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রবীনা শইকিয়া, চিত্রলতা ফুকন, দীপালি ডেকা, আরতি বৈরাগীর গল্পে সুন্দর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কোমল ভাষায় অনিমা দত্ত জীনের মহত্ব এবং তুচ্ছতার ছবি যে ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, তেমনি অনু বরুয়া এবং ডলি তালুকদার বিচিত্র জীবনের খণ্ডিত ছবি বড় সুন্দর করে আঁকেন। পবিত্র ডেকা, সতীশ ভট্টাচার্য, ত্রৈলোক্য গোস্বামী, কুসুম বরা, উপেন কাকতি, কামিনী ফুকন, আলিমুন্নিছা পিয়ার প্রভৃতির গল্পও কোনো কোনো সময়ে সুন্দর সৃষ্টি ক্ষমতার সংকেত দেয়। এছাড়াও নূতন লেখক লেখিকা অনেকে লিখছেন। তাঁদের প্রতিভা বিচারের সময় এখনও আসেনি।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের মতো মহৎ একটি প্রতিষ্ঠান এই সংকলনটি আগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। অসমীয়া সমাজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। আসামের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের পক্ষ থেকে ট্রাস্টের কর্ম-কর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে গল্প সংকলনটির সকল ত্রুটি ক্ষমা করে জনসাধারণ যদি সাদরে গ্রহণ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হবে।

**নির্মলপ্রভা বরদলৈ**
গুয়াহাটি
1972

**লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া**

জন্ম 1868 খৃষ্টাব্দে শিবসাগরের বিখ্যাত বেজবরুয়া পরিবারে। মৃত্যু 1938 খৃষ্টাব্দে। শিবসাগর থেকে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবন মুখ্যতঃ উড়িয়্যায়, সম্বলপুরে কাঠের ব্যবসায়। সাহিত্যিক অবদান ঃ অসমীয়া সাহিত্যে রোমাণ্টিক ভাবধারার প্রথম পথপ্রদর্শকদের মধ্যে অন্যতম। নূতন যুগের পতাকাবাহী 'জোনাকি' নামক অসমীয়া পত্রিকার সুখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। অতঃপর 'বাহী'র প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক। প্রখর বুদ্ধি এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই যুগান্তসৃষ্টিকারী মনিষী স্বদেশ প্রেমের কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, ব্যঙ্গাত্মক রচনা, হাস্যরসাত্মক বিবিধ সৃষ্টি, সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ ইত্যাদির বহুমুখী অবদান দিয়ে অসমীয়া সাহিত্যে প্রাতঃস্মরণীয় তথা অমর আসন লাভ করেছেন। হাস্যরসের যাদুকর হিসাবে বেজবরুয়া জনগণের নিকট 'রসরাজ' নামে খ্যাত হন। আসামের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত 'অ মোর আপনার দেশ' বেজবরুয়ার সুদক্ষ লেখনীর নিদর্শন। চরিত্র গ্রন্থরাজির মধ্যে জোনবিবি, সুরভি, কদমকলী, পদুম কুঁয়রী, বরবরুয়ার কাকতর টোপলা, বরবরুয়ার ওভতনি, বরবরুয়ার ভাবর বুরবুরানি, কামর কৃতিত্ব লাভের সঙ্কেত, লিটিকাই, পাচনি, সাধুকথার কুফি, জয়মতী কুঁয়রী, চক্রধ্বজ সিংহ, চেলিমার, কাকা দেউতা নাতিলরা, ভাঙ্গীয়া দীননাথ, বেজবরুয়ার জীবনচরিত, শঙ্করদেব, ভগবৎকথা, তত্বকথা, শ্রীকৃষ্ণকথা, মোর জীবনের সোয়রণ ইত্যাদি। অতুল চন্দ্র হাজরিকা সম্পাদিত দুই খণ্ডে সংকলিত 'বেজবরুয়া গ্রন্থাবলী'তে বেজবরুয়ার সবগুলি রচনাই সংকলিত হয়েছে।

# জলকন্যা

রূপহী ছোট্ট নদী। গ্রীষ্মে জল তিরতির করে বয়ে যায়। মনে হয় কোথা থেকে ভেসে আসা ফটিক জল। কিন্তু বর্ষার জল ঘোলা কর্দমাক্ত। আশ্বিন-কার্তিকের রূপহী নির্বাক ক্ষীণকায়া আর লজ্জাবতী। আষাঢ়-শ্রাবণের রূপহী মদমত্তা, বেগবতী আর নৃত্যময়ী। দেখলে চেনা যাবে না যে এই সেই রূপহী।

রূপহীর পারে একটু আড়াল করা জায়গায় কতকগুলো ডুমুর গাছ ঝোপ তৈরী করেছে। সেই ঝোপের নীচে একটি তরুণীকে সকাল-সন্ধ্যা বসে থাকতে দেখা যায়। তার দৃষ্টি রূপহীর বুকে একটি ঘূর্ণির উপর নিবদ্ধ থাকে। ঘূর্ণি না বলে তাকে বরঞ্চ রূপহীর মুখগহ্বর বলাই ভাল। গাছ নলখাগড়া যাই ভেসে আসুক,

এই ঘূর্ণিতে এসে তলিয়ে যায়। মেয়েটির প্রাত্যহিক কাজ হচ্ছে এক গুচ্ছ খাগড়া কুড়িয়ে আনা, তারপর একটা একটা করে ঘূর্ণিতে ফেলে দেওয়া। সেগুলো প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত বেগে উলট পালট ডিগবাজি খেয়ে অবলীলায় তলিয়ে যায়, মেয়েটি বসে বসে সেই দৃশ্য দেখে। আরেকটি কাজ হচ্ছে রূপহীর সঙ্গে আপনমনে সংলাপ চালিয়ে যাওয়া, আর মাঝে মধ্যে রূপহীকে গান শোনানো। সে গানের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। একটা গান নীচে দেওয়া হল।

তুমিও রূপসী আমিও রূপসী
মাতনে বাড়িল রূপ
শরবন পানে তরী বাহি গেল
মাঝ গাঙে দিল ডুব।

ষোলো বছরের যৌবনবতী একটি মেয়ে এই ধরনের ছেলেমানুষি করে কি করে যে সময় কাটায় তা সে জানে আর ঈশ্বর জানেন।

সময়ের সঙ্গে মেয়েটির সদ্ভাব নেই। তার মতো গাছের নীচে বসে থাকতে সময়ের ঘোরতর আপত্তি। সংসারে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে সে মানুষকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। কালক্রমে তাই একজন যুবক জুটলো এবং মেয়েটির বিয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। যুবকের বয়স বাইশ বৎসর, দেখতে ভাল, শুনতে ভাল, কুলে-মানেও ভাল। মেয়ের মায়েরও মত হল, বাপেরও মত হল, বিয়ের পথে কোনো বাধা আর রইল না। যুবক-যুবতীর মধ্যে আলাপ পরিচয়ও হল। বিয়ের আর মাত্র সাত দিন বাকী। কিন্তু মেয়েটির মনের টান ভাবী বরের চাইতে রূপহী নদীর প্রতিই যেন বেশি বলে মনে হল। বিয়ে যে এসে গেল, তার জন্য কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। এখনও রূপহীর পারে বসেই তার দিন কাটে। দেখেশুনে ভাবী বরের বুকে অসন্তোষ দানা বাঁধে।

একদিন সন্ধ্যায় নদীতীর থেকে ঘুরে এসে মেয়েটি শুনলো যে বর বেঁকে বসেছে বিয়ে করবে না, কালই সে বিদেশ চলে যাবে। কথাটা তীরের মতো এসে তার বুকে বিঁধল। একবার ভাবল, 'যাই, রাতেই তাকে হাতে পায়ে ধরে আটকাই গে।' আবার ভাবল 'লাজ লজ্জার মাথা না খেলে এমনটি করা যায় না।' দুশ্চিন্তায় রাতে তার ঘুম এল না। বাইরে ঝকঝকে জ্যোৎস্না। পাটিপাতা বিছানা ছেড়ে মেয়েটি ঘোরের মধ্যে রূপহীর পারে পৌঁছল। রূপহীর স্রোত তার চিন্তা ভাবনাকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কতকগুলো খাগড়া যোগাড় করে আবার সে একটা একটা করে নদীতে ছুড়তে লাগল। হঠাৎ দুটো তপ্ত হাত এসে তার চোখদুটোকে ঢেকে দিল। সবলে হাত দুটো সরিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখে তার ভাবী বর। দুজনে হেসে সারা হল। রূপহীর ওপার থেকে প্রতিধ্বনিও সে হাসিতে যোগ দিল। ডুমুর গাছের ওপরে ছিল পেঁচক দম্পতি। আনন্দের এই প্রবাহে তারাও

চুপ করে থাকতে পারল না, ডেকে উঠল। যে কটি খাগড়া পড়ে ছিল সবগুলো একসঙ্গে জড়ো করে ঘূর্ণিতে ফেলে দিয়ে যুবতীটি তিনটি তালি বাজাল।

যুবক—কি করলে?

তরুণী—(সহাস্যে) এই ঘূর্ণিতে একজন কুমারী আজ ডুবে মরল। আমি ময়না পাখী, খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখবে, নিয়ে চলো। ❐

# সিরাজ

**লক্ষ্মীধর শর্মা**

জন্ম 1898 সনে তেজপুরের ভীর গ্রামে। 1934 সালে অকালমৃত্যু। মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী বীর লক্ষ্মীধর শর্মা অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জনসাধারণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর সাহিত্যিক অবদানের মধ্যে ব্যর্থতার দান, অনাগতের অভিশাপ, নির্মলা, দেশর কথা, নিষ্ঠা আরু জীবনস্মৃতি প্রসিদ্ধ। তিনি কিছু সুন্দর কবিতাও লিখেছেন।

কন্দর্প আগের দিন রাত্রে বাড়ী ফিরেছে। কলকাতায় থেকে সে কলেজে পড়ে। এবার আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে সে কদিনের জন্য পুরী বেড়াতে গিয়েছিল, এখন বাড়ী এসেছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। কন্দর্পর বাড়ি ফেরার দিন রাতে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখল তাদের বাড়ির সামনের ফুলবাগানের অবস্থা শোচনীয়। কিছু ফুলগাছের ডালপাতা যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কিছু ফুলের পাপড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে পড়েছে। পূর্বদিকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ঝড়ের পর প্রকৃতির এখন শান্ত সৌম্য ভাব। কোথাও কোনো গাছের পাতার এতটুকু স্পন্দন পর্যন্ত নেই। কেবল দূর থেকে পাখি-পাখালির কলস্বর ভেসে আসছে। গত রাতে আমের মুকুল বিস্তর খসে পড়েছে; থোপ থোপ ঝরা মুকুল বাগানটাকে সাদা আবরণে মুড়ে দিয়েছে। তার উগ্র মধুর গন্ধ কন্দর্পর নাকে ঢুকল।

কন্দর্প ভেতরে গেল, মায়ের কাছে বসে চা খেল, তারপর আবার বাইরে এল। বাইরের বারান্দায় একটুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর একটা হাই তুলে আরাম কেদারায় বসে পড়ল। পরীক্ষা শেষ—সামনে অগাধ ছুটি। কথাটা ভাবতেই আরামের আবেশ লাগল, কন্দর্প তাতেই মগ্ন হয়ে রইল। কোথাও চিন্তার লেশমাত্র নেই। শুধুই বিশ্রাম।

কন্দর্প বাইরে তাকাল। দেখল বাগানের মধ্যিখানে পুকুরপারের আমাগাছের নীচে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খোঁপায় ফুল পরছে মেয়েটি। মুখখানা পুরো দেখা যাচ্ছে না। কন্দর্প যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে একটা পাশই শুধু ভাল করে চোখে পড়ে। কন্দর্পর মনে হল মেয়েটির মুখখানা বড় সুন্দর। একটু দীর্ঘায়ত। রং ফর্সা। পোষাকের দিকে চোখ পড়ল। সাদা সাধারণ রিহা মেখেলা পরেছে মেয়েটি, সঙ্গে আটপৌরে সাদা ব্লাউজ, কিন্তু পরিষ্কার। মেয়েটি মুখ ঘোরানোতে পুরো মুখখানাই এবারে নজরে এল। সুন্দর টানা চোখ, পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটো। চিবুকটুকু হ্রস্ব। মেয়েটি তখনও খোঁপায় হাত দিয়ে রয়েছে। বুকের সমুন্নত অংশটুকুর উপর দৃষ্টি পড়তেই কন্দর্প চোখ সরিয়ে নিল। মনে একটা

স্নিগ্ধ অশান্তি দানা বাঁধছে। মেয়েটি চোখ তুলে কন্দর্পর দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়ল, তারপর দুজনেই লজ্জায় মুখ নীচু করল। ভাবের তরঙ্গ দুজনের মনেই খেলছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে কন্দর্পদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। কন্দর্প একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখল মেয়েটির চলনে একটা অচঞ্চল লালিত্য রয়েছে।

মেয়েটির নাম সাবিত্রী। যোরহাটের কাছে একটা বড় চা বাগানে একজন মুহুরী কাজ করতেন। ভদ্রলোকের বাড়ি গোয়ালপাড়া, দেখতে সুপুরুষ। কিছুদিন কাজ করার পর বাগানের পাশের গ্রাম মরনৈগুড়ির একজন কেওটের বিধবা মেয়েকে তিনি নিয়ে আসেন, আর তাকে নিয়েই সংসার পাতেন। সাবিত্রী সেই গোয়ালপাড়ীয়া ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান। সাবিত্রীর বয়স পনেরো হল, ভদ্রলোক মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে শুরু করলেন, আর তখনই নিউমোনিয়ায় তিনি মারা গেলেন। সে কন্দর্পর বাড়ি ফেরার আগের বছরের ঘটনা। ভদ্রলোকের অসুখের খবর শুনে গোয়ালপাড়া থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা এসে উপস্থিত হলেন। সাবিত্রীর বাবা মারা গেলেন। আর তাঁর যাবতীয় জিনিষপত্র টাকাকড়ি সব বাক্সবন্দী করে তাঁরা গোয়ালপাড়ায় ফিরে গেলেন। সাবিত্রীর মা ভেবেছিল সুখের দিনে নিজের ভাইদের সে অনেক যত্নআত্যি করেছে, দুঃখের দিনে আজ তারা তাকে বুকে তুলে নেবে। কিন্তু বাস্তবে বিপরীতটাই ঘটল। গাঁয়ের সবাই তাকে দেখলেই সরে সরে থাকে। কন্দর্পর মায়ের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। থিয়েটার দেখতে গিয়ে আরো অন্য দু-এক জায়গায়ও দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। এই পরিচয়টুকুর উপর নির্ভর করেই সাবিত্রীর মা একদিন মেয়েকে নিয়ে বরুয়ানী অর্থাৎ কন্দর্পর মায়ের কাছে হাজির হল। বরুয়ানীর মন গলল এবং ঢেঁকিশালের পাশের একটা ঘরে তাদের আশ্রয় জুটল। ধান ভানা, উঠান নিকানো ইত্যাদি বাইরের কাজই প্রথম সে করত। কিন্তু ধীরে ধীরে জল গরম করা বা এই জাতীয় আরো কিছু অধিকারও মা-মেয়ে অর্জন করল। সাবিত্রীর সৌন্দর্য আর গুণ দেখে বরুয়ানী সত্যিই মোহিত হয়েছিলেন। তিনি বরুয়াকে ধরলেন তার জন্য একটা ছেলে ঠিক করে দিতে। বরুয়া মুখে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে নিজেদের চা বাগানেরই যুবক মুহুরী কাউকে ঠিক করবেন, কিন্তু কার্যতঃ বড় একটা গা করলেন না। ঠিক এই সময়েই কন্দর্পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

কন্দর্প বেড়াতে বেরুল। এক বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলে আর পর্যাপ্ত চায়ের শ্রাদ্ধ করে বাড়ি ফিরল প্রায় একটা নাগাদ। মায়ের কাছে মধুর বকুনি শুনে ভাত খেল, তার পর ইংরেজী নভেল একখানা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। খেতে বসে সাবিত্রীর কথা সবই সে মায়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। বাগানের পাশে বৈঠকখানার লাগোয়া ছোট্ট ঘরখানিতেই বিছানা করতে বলেছিল। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ঘরখানা কন্দর্পর নিজস্ব।

রেলের ধকলে প্রথমে কন্দর্পর একটুখানি ঘুম লেগেছিল, কিন্তু স্বপ্নে দেখল

সে যেন রেলগাড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছে। হক্‌চকিয়ে উঠে বসল। তারপর ঘুম আর এল না। একটু গরম পড়েছে। গত রাত্রের ঝড়ে গাছগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, সেগুলো থেকে মৃদু একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। সে গন্ধ কন্দর্পর মনকে বড় উতলা করে দিল। একটা অস্থিরতা, একটা ব্যাকুলতা, অজানা এক চঞ্চলতা, অজান্তেই তার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে দুটো মৌমাছি ঢুকে তার অস্থিরতাকে যেন শব্দময় করে তুলল। কন্দর্প এপাশ ওপাশ করল, কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না। বইখানা খুলে ধরল, কিন্তু বইয়ে মন বসছে না। আমগাছের সারির মধ্য থেকেই বোধহয় কোকিল একটা দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ডেকে উঠল। কোকিলের কণ্ঠস্বরের এমন লালিত্য মাধুর্য কন্দর্প কোন দিনই আর লক্ষ্য করেনি। কোকিলের সুমধুর সঙ্গীত দুপুরের নির্জনতাকে মধুময় করে তুলল। কন্দর্প হৃদয়ে অনুভব করল একটা মৃদু কম্পন, একটু মৃদু চঞ্চলতা। একটু পরে সাবিত্রী এসে দরজা খুলে বলল, "আপনাকে ভেতরে চা খেতে ডাকছেন।" কন্দর্প হক্‌চকিয়ে উঠে বসল। এমনি করে উঠতে দেখেই বোধহয় সাবিত্রী মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সাবিত্রীর পরনে ফর্সা সাধারণ পোষাক। আকাশী রঙের একখানা শাড়ী। খোঁপায় গোঁজা ভোরের সেই ফুল, অর্কিডই বোধহয়। সাবিত্রীর সৌন্দর্যই যেন কন্দর্পকে গভীর ভাবে আঘাত করল। তার চোখ দুটো কী গভীর অথচ স্নিগ্ধ। মুখখানা কী সুন্দর। ছোট্ট দাঁতগুলো সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ। কুঞ্চিত কেশদামের অবাধ্য গুচ্ছগুলো কপালে উপ্‌চে পড়েছে। কন্দর্প কি একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। সাবিত্রী তখনও কন্দর্পর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টিতে অনন্ত সরলতা। সাবিত্রীর কণ্ঠ যেন সুধার আধার।...একটু পরে কন্দর্পর যেন মোহ ভঙ্গ হল। বলল, "আমাকে মুখ ধোয়ার জল দিতে বলবে।"

"স্নানের ঘরে জল দিয়েছি" বলে সাবিত্রী ভেতরে চলে গেল।

এপ্রিল মাসের রাত্রিগুলিও একটা মাদকতা নিয়ে আসে বোধহয়। সেদিন রাতেও কন্দর্পর ভাল ঘুম এল না। সাবিত্রীর রূপ কন্দর্পর মনে একটা প্রতিক্রিয়া করে চলছে, এটা নিশ্চিত। তাছাড়াও এই সময়ে আকাশে বাতাশে কি যেন একটা ঘুরে বেড়ায়, আর সুযোগ পেলেই মানুষকে আত্মবিস্মৃত করতে সে ভোলে না।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ কন্দর্প ভেতর বাড়ীতে এক কাপ চায়ের জন্য বলে পাঠালে একটু পরে সাবিত্রী চা নিয়ে এল। পেয়ালাটা টেবিলে রাখতে যাচ্ছে, কন্দর্প হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও"। পেয়ালা ধরতে গিয়ে হাতে হাত লাগল। কন্দর্প হয়তো ইচ্ছা করেই পেয়ালা নেবার সময়ে সাবিত্রীর আঙ্গুলে একটু চাপ দিল, দুজনেরই মুখ রাঙা হয়ে উঠল। পেয়ালা রেখে সাবিত্রী দৌড়ে চলে যেতেই কন্দর্পর মনের মধ্যে ছোটখাট একটা ঝড় উঠল। ছি ছি সাবিত্রী কি ভাবল? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর আঙুল যে একটুক্ষণের জন্য হলেও তার আঙুলকে ছুঁয়ে গেছে, এই অনুভূতিটা তাকে আনন্দ দিতে লাগল। লজ্জায় আরক্ত হলে সাবিত্রীর

মুখখানা যে রাঙা গোলাপের মত দেখায়, এই স্মৃতিটাও তাকে আনন্দ দিল।

সেদিন বিকেলে চা জলখাবার সাজিয়ে সাবিত্রী তার ঘরে ঢুকল। বরুয়ানী বাড়ী নেই। খোঁপায় আজ একটা গোলাপ ফুল। শাড়ীখানা ফিরোজা রঙের। সাবিত্রীকে দেখে কন্দর্প বড়ই অস্থির বোধ করল। বুকে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বনের একটা বাসনা তার মনে দানা বাঁধতে লাগল। মনের ভেতরে বাসনাটি যতই স্পষ্ট হতে লাগল, ততই লজ্জায় কন্দর্প আকুল হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে সে খাবারটুকু খেয়ে নিল। খেতে এতখানি সময় নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য সাবিত্রীকে কাছে আটকে রাখা। এইবার কথা বলব, এইবার হাতখানা ছোঁব, এইবার পেয়ালাটা আগ বাড়িয়ে দেব—এ সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতেই সময় বয়ে গেল। না হল গল্প জুড়ে দেওয়া, না হল হাতখানা এগিয়ে দেওয়া, কোনোটাই সাহসে কুললো না। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে সাবিত্রী ভেতরে ফিরবে, তখন সে কোনোক্রমে বলল, "সাবিত্রী, আমি কিন্তু ফুল বড্ড ভালবাসি, সময় পেলে আমার টেবিলে কয়েকটা রাখবে তো।" সাবিত্রীর মুখ রাঙা হল। কিন্তু মুচকি হাসিতে অন্তরের আনন্দটুকুও প্রকাশ করল। না করে পারল না। যৌবন-রাজ্যে কন্দর্প নবাগত অতিথি, যৌবনের প্রকৃত রূপটুকু তখনও তার দেখা হয়ে ওঠেনি। জীবনের গতি হঠাৎ সঙ্গীত আর নৃত্যময় হয়ে উঠছে দেখে তার মাধুর্যকে সে স্তব্ধ হয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল। জীবনের তীব্রতম প্রকাশগুলো লজ্জা আর শঙ্কার আবরণে এমন ভাবে ঢাকা পড়েছিল যে মনের কোণে উগ্রগন্ধী ফুলের মত যে কামনাগুলোর জন্ম হয়েছিল, সেগুলো সংগোপনে চাপা ছিল। কিন্তু এবারে জীবনের আহ্বানে সে আগুয়ান হল। দিনে দিনে সাবিত্রীর প্রতি তার আকর্ষণ বেড়েই চলল। এক প্রবল উন্মাদনায় যেন একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরছে। এ উন্মাদনা, এ আনন্দের অন্ত নেই। একে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বললেও হয়তো ভুল বলা হয় না।

কন্দর্প মা-বাবার একমাত্র ছেলে। বয়স উনিশ হলেও মা-বাবার দৃষ্টিতে সে এখনও ছেলেমানুষ। তাদের ছেলেমানুষ কন্দর্পই যে ধীরে ধীরে যৌবনে উত্তীর্ণ হচ্ছে আর সাবিত্রীর মত যৌবনবতী সুন্দরীর সঙ্গ যে তার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নাও হতে পারে, সে কথা তাদের মনেই আসেনি। তাছাড়া বরুয়া প্রায় বাগানে থাকেন। আর, অন্য দশজন মায়ের মতই স্নেহের পর্দা বরুয়ানীর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

বসন্ত এল, পৃথিবীর বুকে এক নূতন মত্ততার সঞ্চার হল। জীবনের জয়গানে চারদিক মুখরিত হওয়ার যোগাড় হল। গাছলতা, পশুপক্ষী, মানুষ, আকাশ বাতাস সবারই দেহমন আত্মা এক নূতন অনুভূতিতে ব্যাকুল। জীবনের পরিধি যেন হঠাৎ বদলে গেল, রক্তে ধমনীতে এক নূতন ছন্দের মাতন।

কন্দর্পর হৃদয়েও জীবনের মহাসঙ্গীত বেজে উঠল। অস্থির অদম্য চঞ্চলতায়

সে আত্মহারা হয়ে উঠল। জীবনের তীব্র গতিবেগ আর মাধুর্যের প্রাচুর্য দেখে সে অভিভূত হয়ে গেল। এই অজানা ছন্দের দোলাকে সে দমাতে পারল না। সৃষ্টির আহ্বানে সে আর সাবিত্রী আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। জগত, সংসার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যেন তাদের যৌবনের জয়গীতি বেজে উঠল।

এমনি করে দিন যায়। হৃদয়ে চলছে সীমাহীন আনন্দের উৎসব, তার তীব্র আলোড়নে দুজনে ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে গেল।

কথাটা আস্তে আস্তে চাউর হল। মা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। বাবাও একদিন বললেন, "ছোটলোকের সঙ্গে সংশ্রব রাখাটাই ভুল হয়েছিল।" কোনো এক অজ্ঞাত শক্তির বশবর্তী হয়ে মা কিন্তু এই মেলামেশাকে কোনো মূল্য দেন নি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ছেলেটা দুদিনের জন্য মন ভোলাচ্ছে, ভোলাক। চাকর বাকরের মুখে কথাটা বাইরেও রাষ্ট্র হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে জগতে যে সমস্ত কথা কারো বা কারো জীবন মরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোই অন্যের ব্যঙ্গ আর ঠাট্টার সামগ্রীতে পরিণত হয়। অবশ্য এটা মনুষ্য সমাজের চিরদিনের রীতি।

ইতিমধ্যে কলেজ খুলল। পাশের খবর আগেই এসেছিল। একটা গভীর দুঃখের বোঝা নিয়ে কন্দর্প এবারে কলকাতা গেল।

সেবারে পূজার ছুটিতে বরুয়া-বরুয়ানী গুয়াহাটি গেলেন। কন্দর্পর কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরা হল না, কারণ বরুয়া-বরুয়ানীই বাড়ি ফিরলেন না। নানা ধরনের বুদ্ধি করেও কন্দর্প যোরহাট যাওয়ার সুযোগ করতে পারল না।

গরমের ছুটিতেও বাবা-মা গুয়াহাটি এসে কন্দর্পকে নিয়ে শিলং চলে গেলেন। কলেজ খোলা পর্যন্ত সেখানেই রইলেন, তারপর কন্দর্পকে কলকাতায় পাঠিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন।

সে বছরই অক্টোবর মাসে বরুয়ানী মারা গেলেন। কন্দর্প বাড়ি ফিরে মায়ের শোকে উতলা হয়ে উঠল। শোকের আবেগ কিছুটা কমলে সাবিত্রীর খবর করল। শুনল যে সেবছর কলকাতা ফিরে যাওয়ার পরই সাবিত্রী জ্বর হয়ে মারা গেছে। এতদিন সাবিত্রীকে না দেখে তার মনে অশান্তির অবধি ছিল না। আজ সাবিত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ভবিষ্যৎ জীবন হঠাৎ অন্ধকার ঠেক্‌ল। কাজকর্ম শেষ করে সে আবার কলকাতা ফিরে গেল।

সেবার কন্দর্প কলকাতা রওনা হওয়ার পরই সাবিত্রী বুঝতে পারল যে সে অন্তঃসত্ত্বা। প্রথমে ভয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। সেই ভয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রইল না। কন্দর্পর সন্তান তার গর্ভে, এই চিন্তাই কন্দর্পর বিচ্ছেদে আজ তাকে আনন্দ দিতে লাগল। মাতৃত্বের অজানা আনন্দে তার হিয়া পরিপূর্ণ হয়ে রইল। ধীরে ধীরে বাস্তবতার চাইতেই কল্পনাই তার আসল সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল।

কল্পনায় নিজের সন্তানের কোমল দেহটি বুকের মধ্যে অনুভব করে, তার ছোট্ট হাত পায়ের লীলাগতি আর স্পর্শের কথা ভাবে, তার আধো আধো কাকলি যেন শুনতে পায়,—সাবিত্রী তন্ময় হয়ে যায়। সে মুর্খ ছিল না,—জানত যে এই আনন্দের অন্তরালে কোথাও একটা মহা নিরানন্দময় দৃশ্য অপেক্ষা করে আছে। তবুও আজকের আনন্দ সাবিত্রীকে এমন মগ্ন করল যে আগামী কালের দুঃখকে সাবিত্রী ভুলে গেল। এই দুঃখের দিনকে যতখানি দূরে ঠেলে রাখা যায়, ততই ভাল, এই ভেবে সাবিত্রী তার অবস্থার কথা আর কাউকে জানাল না।

এদিকে সাবিত্রীর বিয়ের কথা চলছে। বরুয়ার বাগানেই কাজ করে, নগাঁও-এর একটি ছেলে একদিন তাকে দেখতে এল। কিন্তু জ্বর হয়েছে বলে সাবিত্রী শুয়ে রইল—মেয়ে দেখা আর হল না। পুজোর পর বিয়ের তারিখ তবু ঠিক হয়ে রইল।

কিছুদিন পর সাবিত্রীর মায়ের চোখে সাবিত্রীর অবস্থাটা ধরা পড়ে গেল। ধীরে ধীরে বরুয়া-বরুয়ানীও কথাটা টের পেলেন। সাবিত্রীর গর্ভের সন্তানটি কার, সে বিষয়ে কারো সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। মা আর বরুয়ানী দুজনে মিলে সাবিত্রীকে নানা ভাবে বোঝালেন। সাবিত্রীর সেই একই কথা "আমি পারব না, পারব না, পারব না।" একদিন সন্ধ্যায় বরুয়ানীর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সাবিত্রী শুনতে পেল তার মায়ের সঙ্গে বরুয়ানীর কি যেন কথাবার্তা চলছে।

মায়ের গলা শুনতে পেল, "তেমন একটা ওষধ পেলে তো কোনো কথাই ছিল না।" শুনে সন্দেহ হল যে তাকে খাওয়ানোর ঔষধ নিয়েই আলোচনা চলছে। বরুয়ানীর জবাব থেকে প্রমাণিত হল যে তার অনুমানই সত্য। বরুয়ানী বল্লেন, "আমি চেষ্টা করে কোনোক্রমে যোগাড় করেছি। ভাত বা তরকারীর সঙ্গে দেবে। একটু গন্ধ আছে তবে টের পাবে না বোধহয়।"

ভয়ে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল, রাম! রাম! পেটের সন্তানকে বধ করার জন্য কি গভীর ষড়যন্ত্র। ঘরে ফিরে এসে সে ভাবতে বসল। আগে থেকেই সংকল্প স্থির করেছিল যে কন্দর্পর সন্তানকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। বলা বাহুল্য সন্তানকে রক্ষার জন্য মাতার যে আকুলতা স্বাভাবসিদ্ধ, সেই আকুলতাই এই সংকল্পে প্রেরণা দিচ্ছিল। আজ হঠাৎ বিপদের সামনে পড়ে সাবিত্রী ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার চিন্তারাজ্যে গর্ভের সন্তানটি নানা ভুবনমোহন রূপে আনাগোনা করতে লাগল, সাবিত্রী অস্থির বোধ করল। শেষ পর্যন্ত ভাবী সন্তানের সম্ভাব্য মৃত্যুর বিভীষিকাই তার মনে বল যোগাল। মা ঘুরে এসেছে টের পেয়ে সে অসুখ বলে শুয়ে পড়ল। না হলে রাতে ভাত না খাওয়ার কোনো অজুহাত দেওয়া যাবে না। আর ভাত খেলেই ওষুধ খেতে হবে। সময় যায় আর তার চিন্তার স্রোত তীব্র হয়ে উঠে। রাতে মা খেতে ডাকল, সে অসুখ বলে শুয়েই রইল। মা ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত্রির নিস্তব্ধতা মানুষের চিন্তারাশিকে বাস্তবের স্পর্শ থেকে বোধহয় দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। এমন অবস্থায় মস্তিষ্ক অকারণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আর সকল বস্তুই একটা নবরূপ ধরে। সাবিত্রীর তাই হল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্থিরতাও বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত যে ধারণাটা তার মনে জীবন্ত আর দৃঢ়মূল হল, তা হচ্ছে না পালালে তার সন্তানকে সে বাঁচাতে পারবে না। মা তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সাবিত্রী ঘর ছাড়ল। মাঝ রাতে রাস্তায় নেমে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়াল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সাবিত্রীর ক্লান্তি লাগল। একটি গাছের নীচে সে বসে পড়ল। সামনে চোখে পড়ল বিরাট প্রান্তর। কাছাকাছি লোক বসতির চিহ্ন মাত্র নেই। ভয়ে সাবিত্রীর প্রাণ উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল অপদেবতা যেন তার পিছু নিয়েছে। তারপর কতটা পথ যে অতিক্রম করল, খেয়াল নেই। ধীরে ধীরে তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল, পা দুটো অচল হয়ে এল। ভয়ে তবু সে চলতেই থাকে। মাথা খাড়া রাখা যাচ্ছে না, বুক ফেটে যাচ্ছে, শরীর অবশ হতে শুরু হল। তবু সে একটু বিশ্রাম নিতে সাহস পেল না, তার চলার গতির সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পিছু তাড়া করছে বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত সব অন্ধকার হয়ে এল, সে জ্ঞান হারাল।

......বি.এ পরীক্ষা দিয়ে কন্দর্প বাড়ি ফিরল, এবারে এসে শুনল, ঘর থেকে পালিয়ে সে একজন মুসলমানের সঙ্গে গিয়েছিল, আর তারপর সে মারা গেছে। পালিয়ে যাওয়ার কারণও সে জানতে পেল। সাবিত্রীর জন্যে তার হৃদয় হাহাকার করে উঠল। তার মহাপাপের ক্ষমা নেই, এমন একটা দুশ্চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলল। দুঃখ আর অশান্তির বোঝা নিয়ে কন্দর্প বাড়ি ছেড়ে চলে এল। সাবিত্রী সন্তান-সম্ভবা ছিল। কিন্তু সন্তানকে নিয়ে কোনো চিন্তা কন্দর্পর মনে জাগল না, তার হৃদয়ের কেন্দ্র বিন্দুতে একা সাবিত্রীই মূর্ত হয়ে রয়েছে। আত্মগ্লানিতে তার জীবন অসহ্য হল। সময়ের ব্যবধানে শোক আর গ্লানির গভীরতা কমে এল, কিন্তু তার হৃদয়ে সাবিত্রীর আসনখানি অটুট রইল। বাবা তাকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। অনেক উপযুক্ত মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এল। কিন্তু বিয়ে সে করল না।

সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সাত বছর কেটে গেছে। আইন পাশ করে কন্দর্প বাড়িতে উকিল হয়ে বসল। বাবার অবস্থা ভাল। ওকালতি না করলেও চলে। কিন্তু চা বাগানের কাজের চাইতে কোর্ট-কাছারীর কাজই কন্দর্পর পছন্দসই ছিল। জেলা সদর থেকে ছয় মাইল দূরের গ্রামে বরুয়াবাড়ি, একটি মামলার সরজমিন তদন্তে হাকিমকে একদিন সেখানে যেতে হল। কন্দর্প এক পক্ষের উকিল, অতএব তাকেও যেতে হল। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে সাইকেলে করে সে গাঁয়ের মোড়ল সিরাজের বাড়ি এসে উপস্থিত হল। সিরাজের বাবা আগে মৌজাদার ছিলেন, এখন কাকা মৌজাদার। ঘর-বাড়ি অবস্থা সবই ভাল। সিরাজের বয়স পঁয়তাল্লিশের মত। কন্দর্পর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। গোটা গ্রাম, গ্রাম কেন

গোটা মৌজার মধ্যেই সাধু মানুষ হিসাবে সিরাজের পরিচিতি ছিল। দুঃখীকে সাহায্য, বিপন্নের সহায়তা, সৎকাজে উৎসাহ দান আর অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিরস্ত করা ছিল সিরাজের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। অল্প ব্যবসাপাতি রয়েছে, জমি জমাও আছে। অতএব খাওয়া পরার চিন্তা আদৌ ছিল না। তার সরল এবং ভদ্র ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ।

সিরাজের বাড়িতে কন্দর্প আর সিরাজ বসে কথা বলছিল। কন্দর্প দেখল ছ'সাত বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে এসে সিরাজকে দাদু বলে ডেকে পানের থালা রেখে গেল। ছোট ছেলেমেয়ের সংশ্রবে কন্দর্প বড় একটা যায় নি, অতএব মানুষের মনে তারা কি ধরনের প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে কন্দর্পর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আজকের এই মেয়েটিকে দেখে কিন্তু তার মনে পুলকের একটা প্রবাহ বয়ে গেল। সে তাকে দুহাত বাড়িয়ে কোলে নিল, তারপর চমকে উঠল। ছোট্ট সরল এই মুখখানি কার যেন এমন তরো মুখের কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। সেই গভীর চোখ, দীঘল সুন্দর মুখ, পাতলা সরু ঠোঁট, সেই হ্রস্ব চিবুক। তার বুকে কাঁপন লাগল। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল।

আত্মসংবরণ করে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি নাম মামনি?" মেয়েটি বলল, "নূর, কিন্তু আসল নাম সীতা।" তার কথায় কার যেন কণ্ঠস্বরের আভাষ। কন্দর্প নিজের আত্মবিস্মৃতির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল। তারপর মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে বলল, "হাজরিকা, এটি আপনার মেয়ে?" সিরাজ হাজরিকা হেসে উত্তর দিল, "ভাঙরিয়া (মহাশয়), এটি আল্লার দান, আমার নাতনী।"

কন্দর্প—"মানে আপনার—"

সিরাজ—"আমার কন্যার মেয়ে, সেই কন্যাও আল্লার দান।" কন্দর্প সিরাজের কথা ভাল করে বুঝতে না পেরে বলল—"হাজরিকা, সকল ছেলেমেয়েই ঈশ্বরের দান। কিন্তু আপনি এই মা-মেয়ের কথা যেভাবে বলছেন, তার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?"

সিরাজের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "আল্লা একদিন এই দেবকন্যাকে আমার আশ্রয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই দেবকন্যার গর্ভে নূরের জন্ম। নূরের মা আসলে আমার সন্তান নয়।"

কন্দর্পর গোটা শরীর শঙ্কায় কেঁপে উঠল। তবে হয়তো সিরাজই সাবিত্রীকে আশ্রয় দিয়েছে। সাবিত্রীর গর্ভেই হয়তো নূরের জন্ম। সব কথা জানার বাসনা তার উদগ্র হয়ে উঠল। ঠিক সেই সময়ে কোটপেণ্ট পরা দুজন সাইকেল আরোহী উপস্থিত হলেন। একজন হাকিম, আরেকজন বিপক্ষের উকিল। সিরাজকে রেখে তারা একত্রে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে যাওয়ার সময়ে হাকিম কন্দর্পকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। 'একটু কাজ রয়েছে' বলে কন্দর্প গেল না। হাকিম আর উকিল দুজনে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চলে গেলেন।

কন্দর্প সিরাজের বাড়ি এসে নূরের মায়ের কথা জানতে চাইল। সিরাজ সবিনয়ে জানাল যে সে কথা তার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। কন্দর্প বুঝতে পারল যে প্রকৃত কথা ভেঙ্গে না বললে সিরাজকে টলানো যাবে না। অনেক চেষ্টার পর সিরাজের কাছ থেকে একটা মাত্র কথা সে জানতে পেল—নূরের মায়ের নাম। সিরাজ বলল সাবিত্রীর মত মহাসতী বলেই বোধহয় তার নাম সাবিত্রী রাখা হয়েছিল। নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কন্দর্প চারদিকে অন্ধকার দেখল।

কোনক্রমে নিজেকে সংযত করে সে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। সাত মাইল পথ সে কি করে এল সে নিজেই বলতে পারবে না। আজ সে নিঃসংশয় যে তার সাবিত্রীর সন্তান নূর—তার নিজের সন্তান নূর। সাবিত্রীর আত্মাই যেন আকুতি করছে নূরকে হৃদয়ে ঠাঁই দেওয়ার জন্য। দুশ্চিন্তা কন্দর্পকে এক প্রকার মাতাল করে দিল। সঙ্গে অনুশোচনার আঘাতও তাকে বিদ্ধ করল।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুতে গেল, কিন্তু চিন্তা ধরে যেন তাকে অস্থির করে তুলেছে।

পরদিন সকালে সে আবার সিরাজের বাড়ি গেল। সিরাজকে সব কথা খুলে বলল। সিরাজ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল ঃ

"সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি সদর দরজার সামনে একটি যুবতি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমি তাড়াহুড়ো করে ঘরে এনে সেক তাপের ব্যবস্থা করলাম, তার জ্ঞান ফিরল। একটু গরম দুধ খাইয়ে দেওয়ার পর সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি বড় নিরাশ্রয়।' আমি ভরসা দিলাম, সে একটু সুস্থির হল। তারপর নূরের দিদিমাকে তার প্রকৃত অবস্থা জানাল। সমাজের চোখে সে কলঙ্কিনী, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে নিষ্পাপ। সে হিন্দুঘরের মেয়ে, আমি মুসলমান। একটু বিপদেই পড়লাম। তাকে আমি কেমন করে রাখি। সেদিন এই মেয়েটি যে জ্ঞানটুকু আমাকে দিল, তা অমূল্য। সে বললে, "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার পার্থক্য তো ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি, তিনি তো সকলেরই পিতা। পার্থক্য তো মানুষ সৃষ্টি করেছে।" তবু সে আলাদা রান্নাবাড়া করতে চাইল, আমি তার ব্যবস্থা করে দিলাম।

মেয়েটির ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রথম দর্শন থেকেই আল্লা মেয়েটির জন্য আমার মনে এক ধরনের স্নেহ সঞ্চার করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই স্নেহ ক্রমশই বাড়তে লাগল। তার নাম ছাড়া তার অতীত সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পেলাম না। চেহারা আর ব্যবহার থেকে বুঝতে পেরেছিলাম সে ভাল ঘরের মেয়ে।

যথাসময়ে নূরের জন্ম হল। তারপর তার জ্বর হল। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় আমাকে ডাকল। আমাকে 'বাবা' বলত, নূরের দিদিমাকে ডাকত 'মা।' বলল, 'বাবা, আমার সময় হয়ে গেছে। মেয়ের ভার আপনার উপর রইল। সে বড় হলে বা তার

বাবাকে যদি কখনও পান, তাকে জিজ্ঞেস করে নূরকে মুসলমান করবেন। আর যদি কোনোদিন আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাকে বলবেন যে তাঁর উপর আমার কোনো রাগ নেই। তাঁর চরণের ধ্যান করেই আমি মরতে সাহস পাচ্ছি।' সেদিন রাত্রেই সাবিত্রীর মৃত্যু হল। তার ইচ্ছা মতই আমি নূরের আরেক নাম দিয়েছি সীতা। সীতার মতই আমার সীতা পবিত্র, কারণ সাবিত্রীর মত সতীর গর্ভে তার জন্ম।

নূরের জন্য আমি বাড়িতে মুর্গী পোষা এমনকি খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করেছি। আমার মনে সাবিত্রীর স্থান কোথায় তা বলে বোঝাতে পারব না। নূরই এখন আমার জীবনের সম্বল। এই মেয়েটিই ধর্মের জ্যোতির মত আমার আর তার দিদিমার জীবনকে উজ্জ্বল করে ধরে রেখেছে।

সিরাজ স্তব্ধ হয়ে রইল। কাহিনীটি কন্দর্পকে তীব্র ভাবে আঘাত করল। তার চোখের দুধার দিয়ে অবাধে অশ্রুর প্রবাহ বইল। কোনোক্রমে বলল, "হাজরিকা, নূরকে আমায় দিয়ে দিন। তাকে আমি কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করব।" সিরাজের মুখ ম্লান হয়ে গেল। একটু পরে দুহাত উপরে তুলে বলল, "আল্লা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি নূরকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। অবশ্য আমার হৃদয় নূরময়। নিয়ে গেলেও মাঝে মধ্যে তাকে যেন একটু দেখতে পাই।" কন্দর্প বুঝল যে সিরাজ নূরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে বলেই এতবড় বিচ্ছেদের বেদনাও বরণ করে নিল। তার চোখ দিয়ে আবার ধারা বইতে লাগল।

কন্দর্প নূরকে নিয়ে কলকাতা গেল। তাকে এখন সে সীতা বলে ডাকে। কলকাতায় ঘর নিয়ে বছর খানেক সীতাকে মাষ্টার রেখে পড়াল, তারপর স্কুলে ভর্তি করিয়ে একটা বোডিং-এ রেখে বাড়ি ফিরল।

সীতাকে ভর্তি করানোর সময় স্কুলের খাতায় কন্দর্প নিজেকে অভিভাবক হিসাবে নাম লিখিয়েছিল। বলেছিল মেয়েটির বাবা তার দূর সম্পর্কের এক দাদা। সুবিমল রায় ছিল তার কলকাতার বন্ধু। সে হাইকোর্টের উকিল। তার কাছেও সেই পরিচয়ই দিল, দিয়ে ছুটির সময় সীতা যাতে তার বাড়িতে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করে নিল। সুবিমলের স্ত্রীর সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল। দুজনের হাতে সীতার ভার দিয়ে সে চলে এল।

ছুটির সময়ে কন্দর্প মাঝে মাঝে সীতাকে নিয়ে পুরী, ওয়ালটেয়ার ইত্যাদি বেড়িয়ে আসে। সিরাজকেও সে তিনচার বার কলকাতা নিয়ে গেছে।

অনিল ছিল সুবিমলের ভাইপো। সীতা যে বছর প্রবেশিকা দিল, অনিল তখন বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছে।

বয়সের সঙ্গে সীতার সৌন্দর্যও বাড়ছিল। সুবিমলের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার

দরুন আরো কিছু পরিবারের সঙ্গে তার জানাশোনা হল। তার সম্পর্ক আর ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে কারো উপায় ছিল না।

অনিল দেখতে ভাল, গান বাজনাও জানে। বাবার টাকা-কড়িও বেশ রয়েছে। অনিল আর সীতার মধ্যে প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর ক্রমে সেই বন্ধুত্ব অনুরাগে পরিণত হল। এই ব্যাপারে সুবিমল, তার স্ত্রী বা কন্দর্প, কারো কোনো আপত্তি ছিল না। দুজনের মধ্যে বিয়ে হবে—এমনি একটা কথা সবাই মনে মনে ধরে নিয়েছিল।

সীতাকে কলকাতায় রেখে আসার পরই কন্দর্প বিয়ে করে। বৈচিত্র্যহীন বিয়ে। সরযূ প্রথমে বড় আশা করেই এসেছিল। শিক্ষিত তরুণী, বড় ঘরের মেয়ে। কিছুটা কাব্য প্রিয়। কন্দর্পর বাড়ি এসে সে পার্থিব সব সম্ভার-ই পেয়ে গেল, কিন্তু একটি জিনিস পুরো করে পেল না। তার শিক্ষিত মন সহেজেই বুঝতে পারল যে কন্দর্পর হৃদয়কে পরিবূর্ণ ভাবে অধিকার করতে সে পারে নি। তার মন ক্রমে কঠোর হয়ে উঠল। বাচ্চা-কাচ্চা না হওয়ায় এ কঠোরতা বাড়তে লাগল।

বিয়ের কিছুদিন পর কন্দর্পর বাবা মারা যান। এই মৃত্যুর ফলে যদিও কন্দর্প আর সরযূ একে অন্যের আরো কাছাকাছি এল, কিন্তু এই সান্নিধ্যও তাদের জীবনে কোনো মাধুর্য সঞ্চার করতে পারল না।

অনেক ভেবেচিন্তে কন্দর্প সীতার কথা সরযূর কাছে গোপন রাখল। জীবনের সুন্দর একটা উপাদান সরযূব রোষদৃষ্টির আগুনে নষ্ট হয়ে যাবে—এমন একটা আশঙ্কা থেকেই এই গোপনতাটুকু বজায় রেখেছিল। সে সুবিমলের সঙ্গে কখনও সরযূকে নিয়ে দেখা করেনি। অবশ্য কাজের অছিলায় বছরে দুবার করে সে একাই কলকাতা যেতো।

সীতার চিঠি-পত্র কন্দর্প পায় কিন্তু নিজের কাছে গোপনে রাখে। টাকা-কড়ি সব সুবিমলকে পাঠায়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে সেবার সীতা তাড়াহুড়ো করে একখানো পোষ্টকার্ড কন্দর্পকে লিখে পাঠাল। তাতে কন্দর্পকে কাকা বলে সম্বোধন করে পরীক্ষা ভাল হয়েছে বলে জানিয়েছে, আর পরদিন বিস্তৃত জানাবে লিখেছে। কিভাবে জানি চিঠিখানা সরযূর হাতে পড়ল। নিচে সীতা নাম লেখা দেখে তার কৌতূহল হল। চিঠি পড়ে বুঝল কন্দর্পর জীবনের কোনো একটা অধ্যায়ের কথা তার অজানা। তার মনে নানা রকমের সংশয় খেলে গেল। কন্দর্পকে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞেস করা সে আত্মসম্মান হানিকর বলে মনে করল। তার মন কিন্তু কন্দর্পর প্রতি বিরূপ হয়ে রইল।

সীতা কলেজে নাম লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে অনিলের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হল। অনিলরা কায়স্থ। তার বাবা-মা দুজনে প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। তাদের বলা হল যে কন্দর্পরাও কায়স্থ। সুবিমল আর তার স্ত্রীর চেষ্টায় প্রায় বছর খানেক

পর তাদের মত পাওয়া গেল। বলাবাহুল্য মেয়ে দেখে তাদের পছন্দই হল। সামাজিক কারণেই তারা আপত্তি করেছিলেন। অনিলকে বিলেত পাঠানো হবে বলায় তাদের আপত্তি ধীরে ধীরে লঘু হয়ে এল।

ঠিক হল অনিল এম.এ. পরীক্ষা দিলেই বিয়ে হবে। সীতা আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে সুবিমলের বাড়ি চলে এল। অনিলের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে বলে তাদের অবাধ মেলামেশায় কেউ আপত্তির প্রয়োজন বোধ করে নি।

এমনিতেই দুজনের প্রতি দুজনে ভয়ানক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। দুজনের কোমল হিয়াতে প্রণয়ের নবসঙ্গীত বেজে উঠল আর দুজনে এক মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। একের অন্যকে অদেয় আর কিছু রইল না। দেহমন সবকিছুকে জড়িয়ে তাদের প্রেমের মন্দাকিনী বইছিল। আর একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছিল।

কন্দর্প ভাবল বিয়ের আগে সরযূ, সীতা আর অনিলের সামনে সব কথা ভেঙে বলা উচিত। তার জীবনের এই বহুমূল্য গুপ্তকথা সিরাজ ছাড়া আর কেউ জানে না। সিরাজ যে একথা প্রকাশ করবে না, সে বিশ্বাস কন্দর্পর ছিল।

অনিলের এম.এ. পরীক্ষার পর কন্দর্প কলকাতা গিয়ে অনিল আর সীতাকে নিয়ে এল। দুজনের মধ্যে গভীর প্রীতির ভাব দেখে তার আনন্দের আর সীমা রইল না। সাবিত্রীর প্রতি যে তীব্র অবিচার করা হয়েছিল, এই বিয়ের মাধ্যমে তার কিছুটা অন্তত প্রতিকার হবে, এই আশায় সে কিছুটা শান্তি পাচ্ছিল।

আসামের সৌন্দর্য দেখে অনিল মুগ্ধ হয়ে গেল। আর এতদিন পর আসাম ফিরে এসে সীতা আনন্দে বিহ্বল হয়ে রইল।

যোরহাট গিয়ে কন্দর্প সরযূকে বলল,—"সরযূ, এই আমার পালিতা কন্যা সীতা আর তার ভাবী স্বামী অনিল। এদের যত্ন-আত্যির সব দায়িত্ব তোমার।"

সীতা আর অনিল তাকে কাকীমা বলে সম্বোধন করল। বাইরের ভদ্রতা সম্পূর্ণ বজায় রেখেও সরযূর অন্তর তেতো হয়ে উঠল। কে এই সীতা যায় সঙ্গে কন্দর্পর পুরানো পরিচয়। সীতার সৌন্দর্য দেখেও সে যে খুব একটা আনন্দ পাচ্ছিল, তা নয়। সুন্দরীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশী, ঈর্ষার ভাবও বড় তাড়াতাড়ি আসে।

সীতা যোরহাট পৌঁছানর পরদিন গাড়ী পাঠিয়ে সিরাজকে আনাল। তার চুল দাড়ি এখন সবই পেকে সাদা হয়ে গেছে। কেবল মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি। তাকে দেখেই সীতা লাফিয়ে উঠে ডাকল, 'দাদু'! সিরাজ দু'হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করল। তার দুই চোখে জলের ধারা বইছে। অনিল আর সরযূ এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তারপর সবাই এসে বৈঠকখানায় বসল। কন্দর্পই শুরু করল ঃ "সরযূ, তোমার

কাছ থেকে একটি কথা এতদিন আমি গোপন রেখেছিলাম। ভাল করেছি কিংবা খারাপ করেছি, বলতে পারব না। আশা করি তুমি আমায় ক্ষমা করবে।"

তারপর অনিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "অনিল, আমি যদি বলি যে সীতা আমার কেউ নয়, আমার জাতের কুলের নয়, কেবল আমার সব স্নেহ আর সম্পত্তির অধিকারিণী, তবুও তুমি কি তাকে বিয়ে করবে?"

প্রথমে অনিলের মুখ ম্লান হয়ে গেল। তারপর বলে উঠল, "আমাদের অন্তরের মিল যে কোনো অবস্থাতেই এক অন্যকে গ্রহণ করার বল যোগাবে।"

শুনে কন্দর্প বলল, "আজ যে কথা বলব, তার সাক্ষী এই বৃদ্ধ সম্মানিত মানুষটি। যার মহত্বের কাছে আমি সব সময়েই মাথা নোয়াই। আশা করি আমার আজকের কথা শেষ হলে তোমরা মানুষটির মূল্য বুঝতে পারবে।"

তারপর সে প্রথম থেকে সাবিত্রীর কথা বলতে আরম্ভ করল। অতীতের দুঃখ সুখের এই বর্ণনার সময়ে তার মন ব্যথায় ভরে গেল। তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে গেল।

সরযূ আজকের এই বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হল। সীতা আর সাবিত্রীর উপর তার রাগের আর সীমা পসিসীমা রইল না। অনিলের মুখ ক্রমশঃই ম্লান হতে লাগল। সিরাজের চোখে জল বয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র সীতাকেই এই ইতিহাসের মাধুর্যটুকু স্পর্শ করল।

কথা শেষ হয়ে গেল, তারপরও সবাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অনিল বলে উঠল, "কি প্রয়োজন ছিল আমাকে এই সমস্ত কথা বলার? এখন আমার সাধ্য নেই সীতাকে বিয়ে করার।"

সীতা আর কন্দর্পর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কন্দর্প সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই অনিল বলল, "যে মেয়ের জন্ম চাকরানীর গর্ভে, আর সে মানুষ হয়েছে মুসলমানের ঘরে, আমার ইচ্ছা থাকলেও তেমন মেয়েকে আমার মা-বাবা কোনোদিনই ঘরে তুলবেন না। আর তাঁদের অবাধ্য হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সীতার মুখখানি আরো ম্লান হয়ে গেল। চেয়ারের হাতল দুটো আঁকড়ে ধরে কোনোক্রমে অজ্ঞান হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করল। তার চোখে একটা ভয়াবহ আতঙ্কের দৃষ্টি। তার মুখ দিয়ে কেবল একটি বাক্য বেরুল, "কিন্তু আমি যে অন্তঃসত্বা।"

এই কথার মর্মভেদী সুর কন্দর্পকে ব্যাকুল করে তুলল। তার হৃদয়খানা যেন ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সে উঠে সীতাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেল। সরযূ তার গলায় হাত দিয়ে বাধা দিল, চিৎকার করে বলল, "বেশ্যা, পতিতা, আমার ঘর থেকে বের হয়ে যা।"

সীতার প্রতি যেটুকু মায়া সরযূর মনে জন্মেছিল, সীতা অন্তঃসত্বা শুনে সেটুকু

দূর হয়ে গেল। তার জায়গায় জাগল একটা ভীষণ হিংসার দাহ। সীতা আর কন্দর্প দুজনকেই আঘাত করার বাসনা তার অদম্য হয়ে উঠল। সে বুঝল যে সীতাকে আঘাত করলেই কন্দর্পকেও আঘাত করা হবে। বিপদের এই গভীরতায় কন্দর্প স্তব্ধ, তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

সরযূর কথা শুনে সীতা জালবদ্ধ হরিণীর মত সিরাজের দিকে তাকিয়ে কাতর কণ্ঠে ডাকল, "দাদু"। চোখের জলে সিরাজের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, এগিয়ে এসে বলল, "চল, আমরা বাড়ি যাই মা।" সীতাকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে কন্দর্পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রথমে কন্দর্পর ইচ্ছা হল চীৎকার করে কেঁদে উঠে। জগতের সকল আলো তার চোখের সামনে নিভে যাচ্ছে। তারপর সব অন্ধকার। ❐

**মহীচন্দ্র বরা**

জন্ম নগাঁও, 1894 খৃষ্টাব্দে। মৃতু 1965 খৃষ্টাব্দ। কৃতী ছাত্র শ্রীবরা রাজনীতিবিদ এবং আইনজ্ঞ হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি আবাহন যুগের একজন প্রথিতযশা গল্প লেখক। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং বিমল হাস্যরসে ভরপুর তাঁর গল্পগুলোর মাত্র একটি সংকলনই বেরিয়েছে। বইটার নাম "উকীলর জন্ম রহস্য।" কবিতার বই "শান্তি শতক।"

# ভূমিকা

বিশ্বেশ্বরকে শরণ দিয়ে পরম বৈষ্ণব গুরুদেব বললেন, "পদ্মনাভর মুখপদ্ম নিঃসৃত গীতার সার কথা হচ্ছে ত্যাগ। সংযম অভ্যাস কর, নিবৃত্তির মার্গ ধরে এগিয়ে যাও—'যত দেখ ধন জন সব বিষ্ণুমায়া', সবই অপার্থিব। সেই মায়া প্রপঞ্চ ভেদ করে দৃষ্টি সব সময়ই উর্ধ্বমুখী করে রাখবে। বিষয়কে বিষবৎ জ্ঞান করবে। জীব মাত্রেই এই সহস্রকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারীর অংশ। কুকুর, গর্দভ, শৃগালের আত্মাও রাম। সুখে বিগতস্পৃহ থাকবে—দুঃখে উদ্বিগ্ন হবে না। আতর সেবা, জীবে দয়া তোমার মূলমন্ত্র হোক।"

বিশ্বেশ্বর নতজানু হয়ে বলল, "আজ থেকে আমার অহংকার সব দূর হোক, আশীর্বাদ করুন প্রভু। যে বেসাত সম্পত্তি ভ্রম বসে নিজের মনে করতাম, জীবের কল্যাণের জন্য সবই প্রভুর চরণে অর্পণ করেছি। নিজগুণে সেগুলোর উচিত ব্যবস্থা করে দিয়ে যান প্রভু।"

"তোমার নিবেদন সথার্থ"—গুরুদেব টোকারী (বাদ্যযন্ত্র) হাতে নিয়ে তার তারে আঙুল বুলায়ে গাইলেন,

"আমাকে কিনে নাও হে প্রভু, আমি তোমার কিনা,<br>
কোনো ধন না লাগে মোর নাথ ধন বিনা।"

গুরুর চোখ দিয়ে ভক্তি অশ্রু ঝরে পড়ছে। মর্মভেদী করুণ কাতরতায় নূতন দিগন্ত উম্মোচিত হয়। বিশ্বেশ্বরের তন্ময়তা ভেঙ্গে প্রভুপাদ বললেন, "বিশ্বেশ্বর, এই টোকারীটা ধর। এর মধ্যে দিয়েই তোমার প্রাণতন্ত্রীতে নামগানের মাহাত্ম্য মূর্ত হয়ে উঠুক।"

বিশ্বেশ্বর বৈরাগী হল।

পুরানো ঘায়ে পোকার চিড়বিড়ানি। মাছির ভ্যানভ্যানানি। পুতিগন্ধময় পরিবেশ। রাস্তার পাশে খালে পড়ে কুকুরটি মরণ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছিল। তার আত্মায়ও যে পরমব্রহ্ম নিহিত, সে উপদেশ যারা পেয়েছে, তারাও নাক বন্ধ করে সরে যায়।

টোকারী বাজিয়ে নাম গান গেয়ে বৈরাগী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু ছেলে

কুকুরটির গায়ে ঢিল ছুড়ছিল, আর তার মৃত্যুকাতর মুখের বিকৃতিকে বাড়িয়ে দিয়ে মজা করছিল।

বৈরাগীর চোখে পড়ল। ভগবানের প্রতীক প্রাণীর যন্ত্রণায় বৈরাগী অস্থির হল। খাল থেকে টেনেটুনে কুকুরটাকে তুলে আলন। অটল শ্রদ্ধায় গভীর নিষ্ঠায় নিয়ে গেল নদীর পারে নিজের আশ্রয়স্থলে। বৈরাগীর শুশ্রূষায়, বৈরাগীর একাগ্রতায়, বৈরাগীর মর্মভেদী কাকুতিতে কুকুরটি নিরাময় হল। কুকুরের নাম দিল বান্ধে (প্রাণসখা)।

বৈরাগীর এক জন সঙ্গী হল। কুকুরকে বুকে নিয়ে শোয়, কুকুরের সঙ্গে এক পাতে খায়। তার সঙ্গে কথা বলে, তাকে নাম কীর্তন করে শোনায়। বৈরাগীর 'প্রাণসখা' এখন বৈরাগীর সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়।

বৈরাগীর দানের টাকায় একটা সেবাসদন হবে, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্যে গুরুদেব প্রভুপাদ সপরিবারে শহরে এসেছেন, উৎসব করছেন। প্রভুর কণ্ঠে ভগবানের নাম মাহাত্ম্যের লীলা-বৈচিত্র্যের কি অপরূপ প্রকাশ। যত্র জীব, তত্র শিব, 'যত জীব, জঙ্গম কীট পতঙ্গম্।' 'অব, খগ, নগ তোমারি কায়া হে', কি প্রাণস্পর্শী বৈদান্তিক ব্যাখ্যা। বিরাট সমারোহ—সবাই বিভোর—তন্ময়। 'অজ্ঞ আমি—এমন কি ওষধির পাতায় পাতায়, ফুলের রেণুতে রেণুতে তার মহিমার স্বাক্ষর।'

গুরুর চরণে প্রণতি জানানোর জন্যে বৈরাগীও সেখানে গেল। গুরুদেবের অস্থায়ী আবাসের বৈঠকখানার কাছাকাছি আসতেই বান্ধে ভুক্ ভুক্ করে দু'তিন বার ডাকল, তারপর তার চাদর ধরে কিছু দূরের বাগানের দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলল। গুরু-কন্যাকে বিষাক্ত সাপে কামড়েছে। সন্ধ্যার নামসেবার জন্যে সে ফুল আনতে বাগানে গিয়েছিল। বৈরাগী আর বান্ধেকে একবার ফণা তুলে দেখে সাপ পালিয়ে গেল। আঙুলের মধ্যে সাপের দাঁতের সুস্পষ্ট ছাপ। সময় নেই—বৈরাগী গুরুকন্যার আঙুলটি মুখে কামড়ে রক্ত শুষে নিল। হাততালি দিয়ে মানুষ ডাকল। গুরুদেবও উৎকণ্ঠায় মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন।—"বৈরাগীর জন্যেই মেয়েটির প্রাণ রক্ষা হল।"

প্রভুপাদ গর্জন করে উঠলেন—"নরকের কীটই গুরুকন্যার অঙ্গক্ষত করে, তার রক্ত পান করে। এতবড় বুকের পাটা, এতবড় সাহস। আমার মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষৎ এই পাষণ্ডই...'

সমস্ত দোষ মেনে নিয়ে মার্জনা চেয়ে বৈরাগী সরে এল। তার বান্ধে একবার গুরুর মুখের দিকে, একবার অন্য মানুষগুলির দিকে তাকায়, তার চোখে ভ্যাবাচ্যাকা দৃষ্টি। এমন পামর, এমন অধম, এমন নির্লজ্জ মানুষগুলো! ঈশ্বরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতার ধ্বজাবাহী অকৃতজ্ঞ জীবসব!

প্রভুর কীর্তন ঘরে তখন ঘোষা (শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য রচিত নাম কীর্তন) চলছেঃ 'ভাই মুখে বল রাম, হৃদয়ে ধরা রূপ।'

শোনো, বন্ধু শোনো। তোমার গুরুকন্যা বৈরাগীর কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। কিন্তু বৈরাগীর জিহ্বায় কালকূটের বিষ তার কাজ করছে।—প্রথমে কথা বন্ধ হল। বিষ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে—হিয়ায় রামের রূপের ধ্যান। তার টোকারীটি ছাড়াই বান্ধে চোখের জল ফেলে।

শেষ বারের মত গুরুকে দূর থেকেই প্রণাম জানাতে বৈরাগী কোনোক্রমে টোকারীটি বুকে তুলে নিল, লাঠির উপর ভর দিয়ে তারপর কাঁপতে কাঁপতে গুরুদেবের প্রাঙ্গনের কাছে পৌঁছাল। টোকারীটির তারগুলো হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। বান্ধে একবার দুবার ডাক ছেড়ে মানুষের সাহায্য চাইল, বৈরাগীর চারপাশে কয়েক বার ঘুরল, গন্ধ শুঁকল—তারপর তার পায়ের উপর মুখটি রাখল।

—"কি সাহস এই পামরের। মরার আর জায়গা পেল না।" গুরু গর্জে ওঠেন। গুরুকন্যাই বৈরাগীকে টেনে নিয়ে কাছের গোরস্থানে ফেলে আসতে বাসব পাচনিকে আদেশ দিলেন। দুহাত তুলে বাসব পাচনি এগিয়ে এল। বান্ধে-এর চোখে তখন আগুন জ্বলছে—অগ্নিকুণ্ড। বাসবের হাতে সে কামড় বসাল।

গুরুদেবের মারে বান্ধের দেহ ক্ষত বিক্ষত হল। কাঁপতে কাঁপতে সামনের ঠ্যাং দুটো কপালে ছুঁইয়ে বৈরাগীর পাশেই সে ধরাশায়ী হল।

বাসব যখন বৈরাগীকে টেনে নিয়ে যায়, তখনই সে মাত্র একবার কেং করে শব্দ করেছিল—সেও প্রায় অচেতন অবস্থায়।

একটু সম্বিৎ পেয়ে সে বৈরাগীকে গোরস্থানে টেনে নিয়ে যেতে দেখল। সে উঠল, আবার পড়ল। শেষ পর্যন্ত আকুলি বিকুলি করে গোরস্থানে ফেলে রাখা বৈরাগীর কাছে পৌঁছল।

বৈরাগী তার দিকে তাকিয়ে মুখখানা হাঁ করল—অগস্ত্যের তৃষ্ণা, মৃত্যু পিপাসা—একটু জল চাইছে।

বান্ধে তার লালা ভরা জিভখানা বৈরাগীর মুখে দিল। অসীম তৃপ্তিতে চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বৈরাগী হাসল।—হাত দিয়ে বান্ধেকে টেনে বুকে জাপটে ধরল।

পরম কারুনিক করুণাময়ের নিষ্করুণ করুণার স্বাক্ষর নিয়ে দুজনে আলাদা হল। দূরে বসে থাকা দুটো শকুন লজ্জায় গলা বেঁকিয়ে ডানার মধ্যে মুখ লুকাল। শোনো বন্ধু, তখন সেখানে আকাশ ছিল না, বাতাস ছিল না, তোমার সর্বব্যাপী ভগবানের ব্যাপকতাও সেখানে ছিল তিমির স্তব্ধ।

কিন্তু এমনি মরণেও কি কোনো ভূমিকা আছে? আছে কি? ❐

## মানদণ্ড

হলীরাম ডেকা

জন্ম সর্থেবাড়ি, কামরূপ, 1901 খৃষ্টাব্দে। 1962 খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। প্রথমে আইনজীবী এবং পরে হাইকোর্টের প্রথম অসমীয়া প্রধান বিচারপতি হওয়ার সম্মান অর্জন করেছিলেন। আবাহন যুগের খ্যাতনামা এই গল্প লেখকের কোনো গল্প সংকলন এখনও প্রকাশিত হয়নি। 'অলকালৈ চিঠি' এবং 'অরুণালৈ চিঠি' নামক দুটি পত্রোপন্যাস শুধু প্রকাশিত হয়েছে।

ছোট্ট গাঁয়ের পক্ষে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিনন্দ পাটোয়ারীর এমন সচ্ছলতা নেই যে মেয়ের শহরে বিয়ে দেন, তাও ধনী ঘরে। তিনি ভাবলেন এটা ঈশ্বরের দান, আর মা ভাবলেন মেয়ের কপালে কি রয়েছে কেউ তো আর বলতে পারে না, বাপ ভাই ভাল বলছে তো নিশ্চয়ই ভাল। অতএব বাবা মনের আনন্দে আর মা বুকের দীর্ঘশ্বাস চেপে যে যার বিভাগে বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। এটা সেটা কত রকমের কাজ, কাজের যেন আর শেষ নেই। শহরের বরযাত্রী এসেই চা চাইবে, শুধু পান দিলে চলবে না, এলাচ দারুচিনি মশলাপাতি লাগবে। কেউ হয়তো পান খায় না, শুধু বড় এলাচের দানা খায়। চা যারা খায় না তাদের জন্য সরবৎ লাগবে। তারপর কেউ বা ভাত খাবে, কেউ শুধু জলখাবার, কেউ লুচি, কেউ মাংস, আরো কত কি মান অভিমানের ব্যাপার রয়েছে। সদর দরজার সামনের ঘাসগুলো তুলে ফেলা ভাল না রেখে দেওয়া ভাল, স্থির করতে না পেরে বিনন্দ নিজেই কোদাল নিয়ে হাত লাগালেন। ওদিকে সোহাগের ধানগুলো ভানা হয় নি, এয়োতিদের সবাইকে ডেকে এনে ঢেঁকিঘরে ঢোকানো হয়েছে।

তাদের কেউ বলছে, "খুড়ি, তুমি এই সিঁদুর আনালে? আজকাল সুগন্ধি সিঁদুর বেরিয়েছে না? আর এটা কি? হিঙ্গুল? হবে না, হবে না, কি যেন বলে—দাঁড়াও—কুঙ্কুম, হ্যাঁ কুঙ্কুম বেরিয়েছে না, শহরে তো তাই দেয়। এ সমস্ত যদি বিয়ের সময়-ই আমাদের না পরাও, তবে কি পরে সুমিত্রা শহর থেকে এনে পরাবে?" সুমিত্রার মাকে ভরসা দেওয়ার জন্য বয়স্কা আরেকজন এগিয়ে এলেন, "মাগো, সিঁদুর রাঙা হলেই হলো, তাতে আঁসটে বোতলের তেলের মতো হেনতেন গন্ধ মেশানো—ও সমস্ত সাহেবী বস্তু আমাদের মানায় না। আমি বলছি কি সেই যে রসগোল্লা খেয়েছিলাম আমার পিসীর ছেলের বিয়েতে পারলে ও রকম কিছুর ব্যবস্থা কর।" শিশুকে স্তন দিতে দিতে কাপড় সামলে একজন বললেন, "এ-রাক্ষুসীর শুধু খাওয়াটাই আসল কথা। পিসী, জড়োয়া দেবে নাকি গো, না এমনি হার?" মেয়ের মা মৃদুকণ্ঠে বললেন, "আমি সে সব কথা জানি না মা।" কণ্ঠস্বরের মধ্যেই চোখের জলের আর্দ্রতা ঝরে পড়ছে।

বিনন্দর জ্ঞাতি খুড়া হরিনারায়ণ চাকরীতে মণ্ডল হিসেবে শুরু করে কানুনগো হিসেবে অবসর নিয়েছে, লোকে তাকে হরি কানুনগোই বলে। হরি কানুনগো একজন গণ্যমান্য লোক। গণ্যমান্য এই অর্থে যে তার টিনের ঘর আছে, ঘরটি আবার সাতচালা, তার উপর দেউড়ির সামনে পুকুর, চার সারি নারকেল গাছ ইত্যাদি। তদুপরি মাসে একবার গুয়াহাটি না গেলে শরীর মন ভাল থাকে না। যায় অবশ্য পেন্সন আনতে, তবে সে সৌভাগ্যই বা কজনের জোটে। তার নামধামও একটু রয়েছে, সভা সমিতিতে অংশ নেয় ; আজকাল কংগ্রেসের সভায়ও নির্ভয়ে সামনের আসন দখল করে, এমন কি প্রয়োজন হলে সভ্য হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে। তদুপরি শহরাগত কংগ্রেস নেতাদের এখন তার বৈঠকখানায় বসিয়েই ডাব-টাব খাওয়ানো হয়। বিনন্দের মেয়ের শহরে ধনী ঘরে বিয়ে হচ্ছে, আর কানুনগোর মেয়ে চারটির বিয়ে হয়েছে জলকাদার পাড়াগাঁয়ে, বাকী দুটোর ভবিষ্যতও উজ্জ্বলতর মনে হচ্ছে না—এখন অবস্থায় তার যদি একটু ঈর্ষা হয়, দোষ দেওয়া যায় না। বাড়ীর সামনে বিনন্দকে পেয়ে কানুনগো মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "সব শুনেছি বাবা। বড় খুশি হয়েছি। লোকে বলে পুরুষস্য ভাগ্যং। আরে পুরুষস্য ভাগং নয় বাবা, স্ত্রীয়া হে ভাগ্য—মেয়ের ভাগ্যই ভাগ্যং। না হলে বলো তো, তুমি আশা করেছিলে নাকি যে এমন ঘর বর পাবে?"

বিনন্দ মনে মনে কানুনগোকে ভাল যত না বাসেন তার চাইতে ভয় করেন বেশী। কি জানি কোথায় কি ঝঞ্ঝাট বাধান, সেই ভয়ে অতি বিনীত ভাবে বললেন, "মেয়ের ভাগ্যে কি আছে কি করে বলব কাকা, এখন বাইরে দেখতে—"

কেন কি জানি হঠাৎ করে কানুনগোর সংযম সব হারিয়ে গেল। নিজের অজান্তেই মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, "এত বিনয় কেন বাপু। আমার চোখে ধূলো দেওয়ার চেষ্টা করো না। আমি সাত ঘাটের পোড় খাওয়া, তোমার মেয়ের বর কি করে জুটিয়েছো আমি জানি না বুঝি। আমার মেয়েদের আমি তো আর সে পথে যেতে দেব না।"

কানুনগোর রাগ হলে তিনি কেন কামরূপে উজানী আসামের ভাষা বলেন আর উজানী আসামে কামরূপিয়া বলেন, তার কারণ তিনিই জানেন। এই আক্রমণের মুখে বিনন্দ পাটোয়ারী হতবুদ্ধি হলেন, কারণ একজন বর্ষীয়ান মানুষ যে অকারণে এ ধরনের কথা বলতে পারেন, তাঁর ধারণা ছিল না। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে বললেন, "এসেছেন যখন একটু পান মুখে দিয়ে যান।" বুড়া কানুনগোর তাতে তীব্র অপমান বোধ হলো। তিনি বললেন, "কোন্ সাতচালা বৈঠকখানায় বসিয়ে আমাকে পান খাওয়াবে হে? জামাইকে আদর করে এনে জল পান খাওয়াও, ধনী জামাই পেয়েছো, আমাদের কি আর মনুষ্য জ্ঞান করবে? আজকাল মেয়েদের

শহরে পড়তে পাঠানো হয় ছেলে ধরার ফাঁদ পাততে।” শেষ উক্তিটা স্বগত, কিন্তু সোচ্চার।

বিনন্দের হাত কাঁপতে লাগল, একে কেটে ফেললেও কোনো দোষ নেই। কিন্তু সামলে নিয়ে সংযমের সঙ্গে বললেন, “ছি কাকা, বুদ্ধি পরামর্শ নেওয়ার কোনো স্থল নেই। শহরের ধরন ধারণ আমি জানিবুঝি না, আপনি যদি বুদ্ধি পরামর্শ না দেন—” বিনন্দ কোত্থেকে জানি সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করে শিষ্টাচার দেখালেন। কানুনগোর সুর একটু সংযত হলো, ‘হবে হবে’ বলে তিনি সরে পড়লেন। বিনন্দ রোষকষায়িত দৃষ্টিতে সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের কাজে মন দিল। মাটিতে কয়েকটা কোপ বসিয়েই তার মনের মধ্যেও সে কোপের আঘাত সঞ্চারিত হলো, বলল, “আপদ বিদায় হয়েছে, রক্ষা।”

সুমিত্রা সাধারণ গাঁয়ের মেয়ে। দেখতে ভাল—গিয়েছিল মূলতঃ শহুরে পিসীর কাজে-কর্মে সাহায্য করতে, বাড়িতে তার বয়সী মেয়ে ছিল, তাদের সঙ্গে স্কুলেও ভর্তি হল সেই সুবাদে। খোপার বদলে যেদিন বিনুনী বাঁধল প্রথম, সেদিন ঘাড়ের কাছটা জানি কিরকম করছিল, দুই পাশ যেন খালি খালি, বাতাসের সাড় লাগলেই যেন কষ্ট পাবে। কিন্তু সেই ফ্যাশনই সহ্য হয়ে গেল। বই কখানা বাঁ-হাতে বুকে ধরে ডান হাত আস্তে আস্তে দুলিয়ে ধীর পদক্ষেপে সঙ্গিনীদের সঙ্গে যখন পথে চলে, তার সুদীর্ঘ গ্রীবা, ডাগর চোখ আর সহজাত যৌবনশ্রীর প্রভাবে সৌন্দর্য যেন ঝলকে উঠে।

এই সরল গ্রাম্য বালা যখন ধনীর নন্দন নিত্যানন্দ চৌধুরীর নজর কাড়ল, তখন সবাই আশ্চর্য হয়েছিল। বংশগৌরব আর অর্থপ্রাচুর্যের বিচারে ফারাকটা অসীম। একজন ইয়ার তো রঙ্গ করে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, “চৌধুরী, ইনি তোমার অফিসিয়েল স্ত্রী হবেন, না নন অফিসিয়েল?”

“সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস নাই বা করলে, আমার একজন পেলেই হল,” এই বলে নিত্য মোটরে বা সাইকেলে সরে যায়। বন্ধুরা তার পিছনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, “মাতাল কোথাকার!”

বিয়ে নিরুপদ্রবে হয়ে গেল। হরি কানুনগো সন্ধ্যে থেকে এসে শেষ রাতে বিয়ে শেষ করে ফিরল। শহুরে ভাষায় কথা বলার সুযোগ জোটাটাই বা মন্দ কি। তা ছাড়া শহুরে বরযাত্রীদের মধ্যে যদি কংগ্রেসের উপর সারির নেতা কেউ আসেন, তবে সে নিজে গ্রামের উন্নতির জন্য কি কি কাজ ধরেছে, তার একটা ফিরিস্তি দেওয়ারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু উপরের স্তরের কাউকে ধরতে পেল না, মাঝারিদের সঙ্গে কথা বলেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। কানুগোর মনে একটা শোনা কথা সাড়া জাগিয়েছিল যে নিত্যানন্দ যদিও নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে, তার মা-বাবার তেমন মত ছিল না, মা তো বিরোধী-ই ছিলেন।

সুমিত্রার বিয়ের পরবর্তী অধ্যায় বড় সুখের হয়নি। কনের সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা আদর অভ্যর্থনা তো পায়ই নি, বরঞ্চ যা পেয়েছে তাকে বিদ্রূপতা বললেও অতিরঞ্জন হয় না। ঢোল বাঁশী বাজানেওয়ালা অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় যাদের ব্যাণ্ড এবং ক্ল্যারিওনেট আর্টিস্ট বলা হয়, তাদের দিয়ে থুয়ে বিদায় করে বরের বাবা শ্রদ্ধানন্দ চৌধুরী (পূর্ব নাম শ্রদ্ধা মহাজন) বললেন, "ঢুলি মালী গেল, ল্যাটা চুকল। এবার কনের সঙ্গে কারা এলো খবর করে দেখি। এই সমস্ত ছোটলোকের আবার মানের জ্ঞান টন্‌টনে।" তার উত্তরে কনের মামা ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ দুর্জন মোহান্ত বললেন, "আমরা ঠিক আছি, আমাদের জন্য ভাববেন না তো।"

তিনি বাড়ি এসে ভগ্নিপতিকে বললেন, "জামাইবাবু, চোখের মাথা খেয়ে মেয়েটাকে ঐ বাড়িতে দিলে?" বিনন্দ বললেন, "যা হবার হয়ে গেছে। তুমি আবার এ সমস্ত কথা তোমার দিদিকে বলতে যেয়ো না।" "আরে আমি কি কচি ছেলে নাকি।" শ্যালক বললেন। দুজনে মিলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস দুটোই এক ধরনের বস্তু, একটি যেন অন্তহীন সঙ্গীত আর অন্যটা তারই অন্তরা। সুমিত্রার কোমল সুন্দর মুখ হয়েছে মলিন, উজ্জ্বল চোখ নিস্তেজ, সুন্দর গ্রীবার শিরাগুলো দূর থেকেই দেখা যায়। জীবন অন্তহীন, সংসার মূল্যহীন, প্রেম ভ্রান্তি,পূজা নিরর্থক—এই কথাগুলো যেন মনের কুঠুরিগুলোতে আকুলি বিকুলি খেয়ে জবাব খুঁজছে। চার দিকে ঘন অন্ধকার, বাইরে থেকে কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জো নেই। কাকে বলবে, কে বুঝবে? মাকে? মা এখন দূর অতীতের একটি লোভনীয় সামগ্রী। আজ কি তাঁর কাছে সব কথা উজাড় করে বলতে পারবে। দৈহিক অত্যাচারের কথা বর্ণনা করা যায়, কিন্তু মানসিক উৎপীড়নের বেদনা? কোন দুর্বৃত্ত যদি কোনো পুর-রমনীর দৈহিক অপমান করে,তা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু মনের গভীর প্রকোষ্ঠে নিত্যদিন যে নিদারুণ কুৎসিত দৃশ্যের অভিনয় চলছে তার আভাসটুকুই কি কাউকে দেওয়া যায়? মৃত্যু—যদি মৃত্যুকেই বরণ করতে হয় তবে জীবন কেন? অভিমান কার কাছে? মান ভাঙানোর জন্য যদি কেউ চেষ্টা করে, তবেই অভিমানের মূল্য থাকে। প্যাঁচা যখন বাইরে নিম্‌ নিম্‌ করে ডাকে তখন সুমিত্রা ভাবে, "আমার জন্যই বোধহয়। কিন্তু না, এই ডাকও প্যাঁচার অন্তরের ডাক নয়। আমার নিয়তি—যমও বোধহয় আমায় নেবে না।"

নিত্যানন্দ সৌন্দর্য্য পিপাসু, কিন্তু সৌন্দর্য যে চিরস্থায়ী বা একটি আশ্রয়েই স্থিতিশীল, এই বিশ্বাস তার ছিল না। যখন কর্তব্য আর লিপ্সার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হত, তখন সে আকণ্ঠ মদ খেত। বড় লোকের ঘরে এটাই রীতি। এতে নিন্দা নেই। তদুপরি গত যুদ্ধে, অর্থাৎ যুদ্ধের বাইরে থেকে তার সুযোগ নিয়ে, নিত্যানন্দ যে অর্থ উপার্জন করেছিল, তাতে তার পিতা মাতারও বিশ্বাস ছিল যে কাউকে

সবকিছু দান করে নিঃশেষ না করে দিলে শুধুমাত্র ভোগ করে তা সে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তাছাড়া পৈতৃক যে সম্পত্তি রয়েছে তাতে নিত্যানন্দের ছোট ভায়েরও সমান নিশ্চিন্তে জীবন চলে যাবে।

পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। কুয়াশায় ভেজা ফুলের সুগন্ধবাহী হিমেল হাওয়া জানালায় ব্যর্থ মাথা কুটে ফিরে গেছে। এমনি সময়ে ঘরের বাইরে থেকে মদ্যজড়িত কণ্ঠে নিজের স্ত্রীকে ডাকল, "জেগে আছো? দরজা খুলে দাও।" লেপের আশ্রয় ছেড়ে সুমিত্রা দরজা খুলে দিল। স্বামীর চেহারার দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, "আরেকটু দেরী করে একেবারে রাতটা শেষ করে এলেই পারতে।"

নিত্য রাগল না, বলল, "লোকাপবাদ! লোকাপবাদ! রামায়ণ পড়নি? জান, রাম বলেছিল—লোকাপবাদো বলবান মতোমে।"

সুমিত্রা নিত্যর কথায় কান না দিয়ে বলল, "এখন শুয়ে পড়।"

নিত্য স্ত্রীর মানসিক ক্ষুণ্ণতাটুকু উপলব্ধি করতে পারল। বলল, "তুমি হয়তো ভাবছ মাতাল আবার রামায়ণ মহাভারত আওড়ায় কেন? তাই না?"

"তুমি শোবে না? হাত পা ধোবে? জল গরম করে দেব?"

"লোকাপবাদ কি তুমি বোঝ নি?" নিত্য জিজ্ঞেস করল, "ধনীর ছেলে লুকিয়ে বেলেল্লাপনা তো করবেই, দিনে দুপুরে করলেই নিন্দা হয়।" নিত্য একই সুরে বলে গেল।

"নিজে করতে লজ্জা পাও না, আর লোক লজ্জাটাই বড় হলো?" সুমিত্রার কণ্ঠে বিতৃষ্ণা চাপা রইল না।

"ঠিকই বলেছ। কিন্তু ঠিক বলছি বটে, কিন্তু করতে তো পারি না। পারলে তোমার পৌরুষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম," নিত্য বলল।

"পৌরুষ"? সুমিত্রা অতীব ব্যথিত কণ্ঠে বলল, "পৌরুষ তো থাকা উচিত পুরুষের।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, ও পা দুখানা তোমার?"

নিত্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করে। সুমিত্রা ভাবে মাতালের প্রলাপ। কোনো উত্তর দেয় না। "তুমি এত রোগা হলে কি করে?" নিত্য আবার জিজ্ঞেস করে, তার চোখ দুটি স্থিরভাবে সুমিত্রার পায়ের দিকে নিবদ্ধ।

সুমিত্রার ভয় হল কি জানি মূর্চ্ছা যায়। নিত্য সেদিনই প্রথম সুমিত্রার চোখে জল দেখল। চোখ মুছিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে, বলল "সুমিত্রা, তুমি ভেবো না, আমি অন্ধ। মানুষ কখনও অন্ধ হয় না, মদ্যপ হলেও নয়, অস্থানে কুস্থানে যাতায়াত করলেও নয়। এটা একটা হিসাবের ভুল, বিচার শক্তির ভুল। এমনি একটা ভুল হিসাব, একটা অন্ধ অনুমান, এমন ভাবে চেপে বসে যে মনে হয় এটাই সত্যি, এটাই নির্ভুল। কু-অভ্যাস মনুষ্যত্বকে বিকল করে, ন্যায়ের মানদণ্ড, স্নেহ মর্যাদার

মানদণ্ড তখন বজায় থাকে না, ফলে লোকে সুবিচার পায় না।" সুরের পর্দা আরেক ধাপ উপরে তুলে বলল—"মাতালের মুখে এই সমস্ত নীতি কথা তোমার ভাল লাগছে না, না?"

সুমিত্রার অন্তরে অভূতপূর্ব একটা শান্তির নির্ঝর বয়ে যাচ্ছিল, এই প্রশ্নটাতে বাধা পেল।....

শোনা যায়, হরি কানুনগোর মনে বড় দুঃখ। সুমিত্রা এখন সবদিক দিয়ে সৌভাগ্যবতী হয়ে গেছে। সুমিত্রার মায়ের আগের সব কথা মনে পড়ে যায়, ভাবে—মেয়ের ভাগ্য। ❐

**লক্ষ্মীনাথ ফুকন**

প্রবীন সাংবাদিক এবং কৃতী সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ ফুকন 1975 খৃষ্টাব্দে একাশি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। আসামের ইংরেজী দৈনিক আসাম ট্রিবিউন বহুদিন ধরে অতীব দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন। এছাড়াও তিনি দেশের অন্যান্য বহু সংবাদ পত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত তাঁর বহু রচনা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যিক অবদান হলো মালা (ছোটগল্প সংকলন), ওফাইদাং (ছোটগল্প সংকলন), 'মহাত্মার পরা রূপ কোয়ঁরলৈ' (সমালোচনা, সাহিত্য আকাদমি দ্বারা পুরস্কৃত)। কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে।

# বিহু সম্মিলন

সভা শেষ করে ফিরতে বিচিত্রময়ীয় আটটা বেজে গেল। এসে দেখেন বৈঠকখানায় বসে গগন মণ্ডল তাঁর বন্ধু বিশল্যকরণীর সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁদের সামনে দিয়েই বিচিত্রময়ী খট্‌খট্‌ করে বাড়িতে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে পেছনে ঢুকল এক বছরের ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর খাসিয়ানী আয়া।

বিচিত্রময়ী ধীরে ধীরে রান্না ঘরে পৌঁছলেন। ঘরটি অন্ধকার। সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিতেই সমস্তটা ঝলমলিয়ে উঠল। বিচিত্রময়ী দেখলেন তিনি বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে রান্নাঘরের যে জিনিষটি যে ভাবে রেখে গিয়েছিলেন, এখনও ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে, একটুও অদল বদল হয়নি। দরজার সামনে যে কাঠ কখানা ছড়িয়ে ছিল, সেগুলো তেমনি পড়ে আছে। বিচিত্রময়ী যাওয়ার সময়ে চায়ের টিনটি উনুনের কাছে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, ঢাকনাটাও বন্ধ করে যান নি। এখনও টিনের মুখটি খোলাই রয়েছে।

বিশল্যকরণীকে বিদায় দিয়ে গগন মণ্ডল ভেতরে এলেন। বিচিত্রময়ী বললেন, "তোমাকে আমি ভাত রেঁধে রাখতে বলে যাই নি? ভাত তো করোই নি, উনুনটাও ধরাতে পারনি?। এখন থাকো উপোস—"

কদিন হলো ভাত রাঁধার চাকর ছেলেটি রেশন কার্ড আর টাকা নিয়ে বাজার করতে গিয়ে পালিয়েছে। খাসিয়ানী আয়াটি ঘটিবাটি দুচারটা ধোয়, সেও ছোকরা চাকরটি পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে—রান্না ঘরের অন্য কাজ সে করে না। ছেলেটির যত্নআত্যি করতেই তাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়।

গগম মণ্ডল বললেন, "উপোস থাকতে হয় থাকব। বিশল্যকরণী এসে পড়ল, তাকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না?"

বিচিত্রময়ী—"কাজের সময় এলে তো তাড়িয়েই দিতে হয়। এখন আমি আর

রান্নাবান্না করতে পারব না। সমস্ত দিন কি ভূতের খাটুনি গেছে সে আমিই জানি। গোটা সভার সব ঝক্কিঝামেলা আমার মাথার উপর দিয়েই গেছে। খেটে-খেটে আধমরা হলেও কি আমার পরিত্রাণ আছে? বললাম আজ আর আমি বক্তৃতা দিতে পারব না, অন্য কেউ দিক। কেউ শোনে সে কথা? শেষ পর্যন্ত বক্তৃতাও দিতে হল।"

গগন মণ্ডল কোনো কথা না বলে উনুনের ভেতরে কয়েক টুকরো কাঠ ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর কাগজ পাকিয়ে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে দেশলাই ধরালেন। আগুন শেষ পর্যন্ত কাঠে ধরল। সসপেন একটা এনে উনুনের উপর চাপালেন। একটা টিন থেকে ডাল বের করলেন, একটা বাটিতে নিয়ে সেগুলো ধুয়ে ফেললেন, তারপর সসপেনে ঢাললেন। নিজে একটা পিড়ি পেতে বসলেন সামনে।

বিচিত্রময়ী সভার সাজ পাল্টে অন্য পোষাক পরলেন। মুখখানা ভাল করে ধুয়ে মুছে গালের উপর যে চুলগুলি এসে পড়েছিল, সেগুলো ঠিকঠাক করে নিলেন। খোঁপাটা খুলে আবার বাঁধলেন। অতঃপর রান্নাঘরে গেলেন। আপন মনে কথা বলার মত করে বললেন, "আমি না লাগলে ভাত হয়েছে আজ। ডালে নুনই দেওয়া হয়নি, এখানে বসে থেকেই বা হচ্ছে কি? একটু হলুদ বেটে দিলে কি হয়?"

গগন মণ্ডল শিলনোড়া নিয়ে হলুদ বাটতে বসলেন।

## 2

গগন মণ্ডল উকীল। লোকে অবশ্য তাকে বেশী চেনে বিচিত্রময়ীর স্বামী হিসাবে। এমন কি লোকে তাঁর বাড়িকে গগন মণ্ডলের বাড়ি না বলে বিচিত্রময়ীর বাড়ি বলে থাকে। কেউ কেউ তাঁকে মিস্টার বিচিত্রময়ীও বলে। তাঁকে এতে আপত্তি করতে দেখা যায়নি কখনও, বরঞ্চ এমন ভাব দেখান যেন এটাই তাঁর ন্যায়সঙ্গত পরিচিতি। যদি স্বামীর নামের আগে মিসেস বসিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দেওয়া যায়, তবে স্ত্রীর নামের আগে মিস্টার বসিয়ে স্বামীর পরিচয়ই বা দেওয়া যাবে না কেন? তাছাড়া এখন আর আগের দিন নেই।

বিচিত্রময়ী স্বামীকে বলেন, 'মিছিমিছিই উকীল হয়েছ। আমি না থাকলে তোমাকে কেউ পুছতই না। কি করে যে বি. এল, পাশ করেছ কে জানে?। নকল করে পাশ করেছ নাকি? তুমি না হয়ে আমি যদি উকীল হতাম তো দেখতে। এতদিনে দুমহলা প্রাসাদ তুলে ফেলতাম। তোমার মতো ভাঙ্গা সাইকেলে করে কাছারী যেতাম না। সবার চোখে চমক লাগিয়ে গাড়ী করে যেতাম, বুঝলে?"

গগন মণ্ডল উত্তর দেন—"বোঝার কি আর কিছু বাকী আছে। সবই বুঝেছি। এ জন্মে তো আর হয়ে উঠল না। পরের জন্মে তুমি যে উকীলই হবে, সে

আমি ঠিক জানি। তখন আমাকে যেন ভুলো না। অন্য কিছু না হলে অন্ততঃ তোমার গাড়ীর ড্রাইভারের পদে বহাল করো। গাড়ী চালানোর সময়ে তোমাকে কিন্তু আমার পাশে বসতে হবে। আগের কথা আমি আগেই বলে রাখছি।”

বিচিত্রময়ী—“তোমাকে ড্রাইভার করতে আমার বয়ে গেছে। উকীল হয়ে যা দেখালে, ড্রাইভার হয়ে আর যে কি দেখাবে। তোমার চালানো গাড়ীতে চেপে খানাখন্দে পড়ে কে মরতে যাবে? আমি তো নয়ই। আমি যাকে তাকে ড্রাইভার করব না, ভাল করে যাচাই করে নেব। আর উপযুক্ত লোক না পেলে নিজেই গাড়ী চালাব। তুমি যখন এতো করে ধরেছো তখন নেব না হয় ‘হ্যাণ্ডিম্যান’ করে।”

গগন মণ্ডল কি বলবেন? বিচিত্রময়ীর মুখের দিকে তাকান, আর কথা বলার সময় স্ত্রীর কানের দুলগুলো যে দোল খায়, তাতেই মুগ্ধ হন। ভাবেন বিচিত্রময়ী নিতান্ত অকারণে মহিলা মহামণ্ডলের প্রধানা সম্পাদিকা হননি। গুণ রয়েছে বলেই পদটি অধিকার করতে পেরেছেন। গুণ যে রয়েছে সেটা গগন মণ্ডল নিত্যই প্রত্যক্ষ করছেন। বিচিত্রময়ী না থাকলে তাঁর সংসার এমন ভাবে চলত না। টাকা দেওয়ার মক্কেলের চাইতে টাকা নেওয়ার মক্কেলের সংখ্যা গগন মণ্ডলের বেশি।

বিচিত্রময়ী মাঝেমধ্যে গগন মণ্ডলকে বলেন, “তুমি ওকালতির সঙ্গে কোনো একটা সমিতি-টমিতির সাধারণ সম্পাদক হয়ে পড়লেও তো পার। নূতন কোনো সভা সম্মেলন তৈরীও তো করে নিতে পার। ভাল করে চালাতে পারলে ঐগুলিতে পয়সা আছে, জান? সভা সমিতি মানেই হচ্ছে চাঁদা, আর তুমি কার কাছ থেকে কত নিয়েছো, কেই বা খবর রাখছে? হিসাবটা ঠিক রাখতে হয়, সে না হয় আমিই শিখিয়ে দেব। দুর্নীতি নিবারণ বা এ জাতীয় একটা সমিতির সম্পাদক হলে খোদ সরকারও তোমায় খাতির করবে। সুযোগ বুঝে শুধু সরকারকে সমালোচনা করে বক্তৃতা দেওয়া বা মাঝেমধ্যে খবরের কাগজে লম্বা বিবৃতি ছাপানো, ব্যস। কিন্তু তোমাকে এ সমস্ত বলা বৃথা, তোমার মাথায় এ সমস্ত ঢোকেই না।

## 3

কোকিলের কুহুধ্বনিতে জানা গেল বিহু আসছে। অশোক ফুলগুলি টকবগিয়ে ফুটল। মাদার গাছে কচি পাতা উঁকি দিল, বৃষ্টির স্পর্শে ঘাসবন সজীব হল। গাছের পাতায় পাতায় নূতন সবুজের আভাস।

বিহু উপলক্ষে মহিলা মহামণ্ডলের পক্ষ থেকে বিচিত্রময়ী একটি বিহু সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। তাতে মুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্ব করবেন বলে কাগজে খবর বেরিয়েছে। যদিও প্রকৃত পক্ষে মুখমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মাত্র, তাঁর সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি। আরো খবর ছাপা হয়েছে যে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন শ্রীযুক্ত সচেতা কৃপালনী। মহিলা মহামণ্ডলীর সহসম্পাদিকা রূপলাবণ্যময়ী

বিচিত্রময়ীকে বললেন, "সুচেতা কৃপালনীয় নামটা ছাপতে দিলেন কেন? তিনি তো জানিয়েই দিয়েছেন যে আসতে পারবেন না।"

বিচিত্রময়ী—"আরে এটুকুও বুঝলে না। অনুষ্ঠানের গুরত্ব এতে কতখানি বেড়ে গেল। আমরা মেয়েরা যে কম যাই না পুরুষগুলো বুঝুক। দেখলে না, সেবার সোসিয়েলিস্টরা রটিয়ে দিল যে তাদের সম্মেলনে অশোক মেহতা আসছেন। শেষ পর্যন্ত এসেছিলেন নাকি? ডিব্রুগড়ে উকীলরা যখন সম্মেলন ডেকেছিল তখন সভাপতিত্ব করবেন বলে কার নাম ঘোষণা করেছিল মনে নেই? আমাদেরও সুচেতা কৃপালনী যদি শেষ পর্যন্ত না আসতে পারেন তো কি করব? কাগজে নাম তো বেরিয়ে গেল।"

রূপলাবণ্যময়ী—"আপনি দূরের ব্যাপারগুলোও আগে থেকেই ভেবে রাখেন। আমি কথাটা ধরতেই পারি নি।"

বিচিত্রময়ী—"ধীরে ধীরে ধরতে পারবে। সমিতিতে ঢোকার তোমার কদিন হল? বিহু সম্মিলনটি সবদিক দিয়ে জমজমাট করে তুলতে হবে, বুঝেছ? চা-জলখাবারের ব্যবস্থা রাখব ভাবছি। তুমি কি বল?"

রূপনাবণ্যময়ী—"আমি আর কি বলব। খুব ভাল হবে। আমাকে কি করতে হবে বলে দেবেন। টাকা তো তুলতে হবে। চা-জলখাবার করতে হলে টাকা লাগবে। কত মানুষ নেমন্তন্ন করবেন?"

বিচিত্রময়ী—"আমার লিস্টি মত একশ' খানেক হবে। টাকা তো তুলতেই হবে। আমি কি ভেবেছি জান? টাকা আমরা সভ্যদের মধ্য থেকেই তুলব, বাইরের কারো কাছে হাত পাতবো না। ঠিক করেছি প্রত্যেক সভ্যকেই অন্ততঃ তিন টাকা চাঁদা দিতে হবে, আর প্রত্যেককে বাড়ি থেকে অন্তত পাঁচটি করে তিলের পিঠা নিয়ে আসতে হবে। তিলের পিঠে না হলে বহাগ বিহু জমে না। আর দোকানে তো সে পিঠে কিন্তু পাওয়া যায় না, তাই বাড়ি থেকেই আনতে হবে, কি বল?"

—"সে আবার বলতে" বলেই রূপলাবণ্যময়ী গান ধরলেন, "অতিকৈ চেনেহর মুগারে মহুয়া, তাতে কো চেনেহর বহাগর বিহুটি নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ।" (একটি জনপ্রিয় বিহুগীতের অংশ বিশেষ; বঙ্গানুবাদ ঃ অতি আদরের মুগার সূতা আঁটি, তার চেয়েও আদরের বহাগ বিহুটি, তার আয়োজন না করে কি করে থাকি)।

পলাশবাড়ি থেকে সদ্য কেনা মুগার রিহা মেখলায় খসখস শব্দ তুলে ময়ূরভঙ্গী দেবী এলেন, এসেই সরব হলেন—"টাকা না হয় দরকার হলে দুটো বেশী দেব, কিন্তু তিলের পিঠা একটাও দিতে পারব না। চাকরটা বিহুর ছুটি নিয়ে বাড়ি গেল। চাল গুড়ো করে দেবে কে?

বিচিত্রময়ী—"ওজর আপত্তি কিছুই শুনব না। তিলের পিঠা পাঁচটা আপনাকে দিতে হবেই। চাকর নাই তো কি হল? মিস্টার ময়ূরভঙ্গী আছেন তো? চাল

তিনিই গুড়ো করে দিতে পারবেন। আপনি দেশের সেবায় এতখানি সময় দিচ্ছেন, আর তিনি এটুকু করে দিতে পারবেন না। আপনি মিস্টার ময়ূরভঙ্গীকে বুঝিয়ে বলবেন। এও বলবেন যে চাল গুড়ো করে না দিলে তার বিরুদ্ধে আমরা নিন্দা প্রস্তাব আনব।"

রূপলাবণ্যময়ী—"মিস্টার ময়ূরভঙ্গী বলাটা কিন্তু আপনার ঠিক হয়নি, শ্রীমান ময়ূরভঙ্গী বলা উচিত। ইংরেজ যখন গেলই, তখন মিস্টার বলাটা আর শোভা পায় না।"

## 4

গগন মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি একটা নিয়ে বিচিত্রময়ী হুকুমচান্দ গোয়েঙ্কার দোকানে হাজির হলেন। হুকুমচান্দ বাবু গদীতে সমাসীন, সামনে খোলা খাতা, হিসাব মেলাচ্ছেন। তাঁদের দেখে 'রাম রাম' বলে নমস্কার করলেন, দুটো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন এবং সর্বশেষে শুভাগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

বিচিত্রময়ী বললেন, "আমাদের বিহু সম্মিলনের নিমন্ত্রণ চিঠি পেয়েছেন তো। আপনাকে যেতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সভাপতিত্ব করবেন। নেমন্তন্ন একশ' জনকে করা হয়েছে, আরো পঞ্চাশ জনের মতো করতে হবে।"

আসলে ষাট জনের মত নেমন্তন্ন করা হয়েছে এবং এই সংখ্যা আর বাড়ানোর ইচ্ছা বিচিত্রময়ীর নেই। দুশোখানা ছাপানো চিঠির অধিকাংশই যে নামঠিকানা লেখা অবস্থায় তাঁর দেরাজে বিশ্রাম করছে, এটা অন্য কেউ জানে না। রূপলাবণ্যময়ীর ধারণা যে চিঠিগুলো বিলি হয়ে গেছে। কারণ বিচিত্রময়ী তাই বুঝিয়েছেন।

হুকুমচান্দ বাবু খাতাটি বন্ধ করে চশমাটি খাপে ঢোকালেন। তারপর বিচিত্রময়ীর গাল ও মুখ নিরীক্ষণ করে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়। যাবই তো।"

বিচিত্রময়ী—"আপনি শুধু উপস্থিত থাকলে হবে না। আমরা একটু চা-জলখাবারের আয়োজন করেছি, তার খরচটা আপনাকে দিতে হবে। আমাদের মহা-মণ্ডলের সব সভ্যের অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

হুকুমচান্দ বাবু কাপড়ের পারমিটের জন্য দরখাস্ত দিয়েছেন। আর তার জন্যে চেষ্টাচরিত্র তদ্বির তদারক কিছুই বাকী রাখেন নি। এই খরচটা তারই অঙ্গ বলে ধরে নিলেন। কংগ্রেসীমহল তো তার থেকে এ ধরনের টাকা আদায় করে থাকেই—কত চা-চক্রের খরচ জুগিয়েছেন, আর মহিলা মহামণ্ডলকে কি নিরাশ করবেন? এদের হাতে রাখা ভাল, কখনো হয়তো কাজে লাগবে। তার উপর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যে বিহু সম্মিলনের সভাপতিত্ব করবেন, সেখানে পিছু হটা হবে না।

হুকুমচান্দ বাবু বললেন, "আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয়ই দেবে। কত টাকা লাগবে?"

বিচিত্রময়ী—"হিসেব করে দেখেছি তিনশ'র কমে হবে না।" হুকুমচান্দ বাবু তিনখানা একশ টাকার নোট এনে বিচিত্রময়ীকে দিলেন। নোটগুলি বিচিত্রময়ী গগন মণ্ডলকে রাখতে দিলেন। হুকুমচান্দ জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কে? আপনার সেক্রেটারি নাকি?"

বিচিত্রময়ী—"আমার কর্তা। অবশ্য সেক্রেটারিও বলতে পারেন। উনি এখানে ওকালতি করেন, আপনার প্রয়োজন হলে বলবেন।"

হুকুমচান্দ বাবু 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বলে এক ঝলক গগন মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বিচিত্রময়ীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। গগন মণ্ডল কড়াভাবে হুকুমচান্দের দিকে তাকালেন, তারপর বিচিত্রময়ীকে উঠতে বললেন।

বিচিত্রময়ী হুকুমচান্দকে বললেন, "আপনি টাকা দিয়েছেন কথাটা যেন কেউ জানতে না পায়। আমাদের মানুষের স্বভাব তো জানেনেই। আপনি কারবারী মানুষ, নানা জনে নানা অর্থ করবে। বলবে আপনার নিশ্চয়ই কোনো স্বার্থ আছে, নইলে শুধু শুধু চায়ের আসরের জন্য তিনশ টাকা দেবেন কেন? জানলে মুখ্যমন্ত্রীও খারাপ ভাবতে পারেন। তাঁকে অবশ্য আমি পরে জানাব। কি, কিছু খারাপ কথা বললাম?"

হুকুমচান্দ—"কেন খারাপ কথা হবে, ঠিকই বলেছেন।"

ফেরার পথে বিচিত্রময়ী পানবাজারে ঢুকে একশ টাকার একখানা নোট ভাঙ্গিয়ে নিজের জন্য ব্লাউজের কাপড়, জুতো একজোড়া, এক ডিবি পাউডার, ছেলের জন্যে জামার কাপড় ও খেলনা ও গগন মণ্ডলের জন্য দুটো কামিজের কাপড় কিনলেন।

## 5

মুখ্যমন্ত্রী বিহু সম্মিলনে শেষ পর্যন্ত আসতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁকে দিল্লী চলে যেতে হলো। সম্মিলনের সাফল্য কামনা করে তিনি যে বাণী পাঠিয়েছেন, বিচিত্রময়ী তা সবাইকে পড়ে শোনালেন। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে হুকুমচান্দবাবু কিন্তু বড় নিরাশ হলেন।

যৌবনবিলাসিনী দেবী বিহু উপলক্ষে লেখা একটা দীর্ঘ কবিতা টেনে টেনে সুর করে পড়ে শোনালেন। কৃষ্ণবিমোহন বরুয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, আপন মনেই বলে উঠেলেন, "চমৎকার"।

তাঁর পাশে বসা বন্ধু রাধিকামনমোহন চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন, "কি চমৎকার? কবিতা, না মানুষটি?"

কৃষ্ণবিমোহন—"মানুষটিও চমৎকার, কবিতাটিও চমৎকার, তুমি কি বল?"

রাধিকামনমোহন—"আমি বলি মানুষটি চমৎকার বটে, তবে কবিতাটি না।"

কৃষ্ণবিমোহন—"কবিতাটি কেন নয়?"

রাধিকামনমোহন—“কবিতাটির কিছু বুঝতে পারলে?”

কৃষ্ণবিমোহন—“উচ্চমার্গের কবিতা এমনটিই হয়। মানুষে তার সবকিছু বুঝতে পারে না, সেটাই তার বিশেষত্ব। তাছাড়া কবিতা বোঝার বস্তু নয়, উপলব্ধির বস্তু। অসমীয়া ভাষাকে যৌবনবিলাসিনী দেবী নূতন রূপ দিচ্ছেন, জান না কি? তাঁর কবিতার বইটি পড়ে দেখো। আহা-হা-হা! চমৎকার!”

হাততালির শব্দে তারা দুজন থামলেন, এবারে বক্তৃতা দিতে উঠলেন নির্দিষ্ট বক্তা গন্ধমাদন তহবিলদার। তিনি প্রাচীন আসাম সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন আর তাঁর সুখ্যাতির সৌরভে গোটা আসাম এখন উথালপাথাল। তাঁকে নির্দ্দিষ্ট বক্তা হিসেবে পাওয়াটাই মহিলা মহামণ্ডলের পক্ষে বড় সৌভাগ্যের কথা।

গন্ধমাদন তাঁর বক্তৃতায় বললেন, “অনেকের মতে, অনেক না হলেও কারো কারো মতে বিহু কথাটি এসেছে বিষুব শব্দ থেকে। আমি বলি তা ভুল। বিহু এসেছে সংস্কৃত বিহঙ্গম শব্দ থেকে। বিহঙ্গম মানে পাখি। পাখি ওড়ে, মুক্ত মনে আকাশে উড়ে বেড়ায়। বিহুর আগমনে মানুষের মনও উড়ু উড়ু করে। বিহঙ্গম থেকে যদি বিহু শব্দটির উদ্ভব না হতো, তবে বিহুর সময়ে আমাদের মন উড়ু উড়ু করত না। আমাদের সকলের মগজে মুক্তির হাওয়া বইত না। আপনারা অবশ্য প্রশ্ন করতে পারেন যে বিহঙ্গম থেকে তো ‘বিহ’ হওয়ার কথা, এই ‘উ”কারটি আবার কোত্থেকে জুটল? উত্তর অতি সহজ। এই ‘উ’ এসেছে কোকিলের কু-উ-উ ধ্বনি থেকে। বিহঙ্গম থেকেই যে বিহু এসেছে সে বিষয়ে আপনাদের মনে এখন নিশ্চয়ই আর কোনো সন্দেহ নেই।”

হুকুমচান্দবাবু চিৎকার করে বললেন, “নেই, নেই।”

গন্ধমাদনের বক্তৃতা শেষ হলে হাততালি আকাশ ছাপিয়ে গেল। বিচিত্রময়ী উপস্থিত সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সভানেত্রী সুকোমলমতী হাজারিকানী, যৌবনবিলাসিনী, গন্ধমাদনের সঙ্গে হুকুমচান্দ গোয়েঙ্কাকেও তিনি আলাদা ভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিচিত্রময়ী বললেন যে হুকুমচান্দবাবুর মত অন্য মাড়োয়ারীরাও যদি আসামকে আপন করে নেয় তবে আসামের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। হুকুমচান্দবাবুকে হাতে রাখলে যে বিস্তর সুবিধা সে কথা বিচিত্রময়ীর বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বিহু সম্মিলনীটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহিলা মহামণ্ডলের সবাই খুশী; সব চাইতে খুশী বিচিত্রময়ী। সবাইর প্রশংসা তো পেলেনই, তার উপর সরাসরি লাভ হলো তিনশ টাকা।

যাদের নেমন্তন্ন হওয়ার কথা ছিল, তাদের অনেকেই বিহু সম্মিলনে এল না, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত থেকে গেল। সে বিষয়ে ভেবে মাথা ঘামানোতে

কারো উৎসাহ ছিল না। না এল তো বয়েই গেল, বিহু সম্মিলন তো আটকে থাকে নি। গগন মণ্ডল যে এলেন না, সেটা সবারই চোখে পড়ল, কারণ তিনি বিচিত্রময়ীর স্বামী।

রূপলাবণ্যময়ী প্রশ্ন করলেন, "শ্রীমান বিচিত্রময়ী এলেন না কেন?"

বিচিত্রময়ী সোনার হাত ঘড়িতে চাবি দিতে দিতে বললেন, "তাকে বাড়িতে রেখে এলাম, ছেলেটার শরীর ভাল নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে না কি হয়েছে, কে জানে? খাসিয়ানী আয়াটাও শিলং গেল সেদিন, কদিন পর আসবে। তাই কর্তার কাছে ছেলেটিকে রেখে এসেছি। আমি না এলে তো আর চলত না।"

রূপলাবণ্যময়ী—"আপনাকে আমার সত্যিই হিংসা হয়। আমার কর্তাটিকে কিন্তু এখনও এমন বাগে আনতে পারি নি। কাল আমাকে কি বলে জানেন? বলে এইবার বিহুতলীতে মজা দেখতে যাব। অনেক বছর নাকি বিহু দেখা হয় নি।"

বিচিত্রময়ী—"তুমি তখন কি বললে?"

রূপলাবণ্যময়ী—"আমি আর কি বলব। চুপ করে রইলাম।"

বিচিত্রময়ী—"আমি হলে কি বলতাম জান?"

রূপলাবণ্যময়ী—"কি বলতেন?"

বিচিত্রময়ী—"বলতাম যেতে চাইছ, যাও না। আমিও যাব বিহুতলীতে ফূর্তি করতে।"

রূপলাবণ্যময়ী—"তা না বলেই থাকো। বিহুতলী থেকে একজনকে ধরে নিয়ে এলে টের পাবে মজাটা। চল এখন, অন্য সবাই তো চলেই গেল। বাড়িতে কি হচ্ছে কে জানে?"

রূপলাবণ্যময়ীর গাড়িতে বিচিত্রময়ী বাড়ির সামনে নামলেন, তারপর ভেতরে গেলেন। পিছনের অন্ধকার বারান্দায় বাচ্চাকে কাঁধে নিয়ে গগন মণ্ডল পায়চারি করছেন, আর আস্তে আস্তে তার পিঠে চাপড় মেরে গলাকে যথাসম্ভব মিহি করে ঘুম পাড়ানি গাইছেন—

'বাড়িতে টোপাকুলের চারা-আ, সোনার চোখ ঘুমে সারা-আ-আ।'

আকাশে তখন একটি দুটি তারা উঠেছে। ❐

**ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী**

জন্ম নলবাড়ি, 1903 খৃষ্টাব্দ। আজীবন শিক্ষাব্রতী শ্রী গোস্বামী কয়েক বছর আগে নলবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। গোস্বামীর ছোট গল্পের সংকলন অরুণা, মরীচিকা এবং শিল্পীর জন্ম। 'জীয়া মানুহ্' একটি ব্যঙ্গ উপন্যাস। "সাহিত্য আলোচনা" এবং "আধুনিক গল্প সাহিত্য" আলোচনা গ্রন্থ। দ্বিতীয় বইটি সাহিত্য আকাদমি দ্বারা পুরস্কৃত।

# পতিত এবং পতিতা

প্রিয়তমা পত্নীর মৃতদেহ চিতায় তুলে নিজের হাতে মুখাগ্নি করার পর থেকেই আমার মন বিষাদের ঘন অন্ধকারে আবৃত হয়ে রইল। নিঃসঙ্গ জীবন, নিভৃত চিন্তা—এই নিয়েই দিন কাটতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই বিশৃঙ্খল চুলের আবরণে ঢাকা বাসন্তীর ম্লান মুখখানা মনে পড়ে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে লেলিহান শিখার গ্রাস করা মুখের মাধুর্যটুকু। মনকে বোঝাতে পারি না, নির্জনে চোখের জল ঝরে। জীবনের শুরুতেই যে ঝড় আমার প্রিয়তমা পত্নীকে কেড়ে নিয়ে গেল, তা আমার মনে বপন করে দিল গভীর নৈরাশ্যের বীজ। মাথার কাছে রাখা মোহমদ্গরখানা মাঝেমধ্যে নিয়ে পড়ি। প্রায়ই একটা শ্লোক চোখে পড়ে,

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোহমতীব বিচিত্রঃ।

একটুক্ষণের জন্য বাসন্তীর চিন্তা আড়ালে চলে যায়, মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মনে ভাবি ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিদের এই সমস্ত বাণী যদি না থাকত, তবে দুঃখ-শোকে জ্বালা-যন্ত্রণায় সংসারের অধিকাংশ মানুষই আত্মঘাতী হত। আরো দু-একটি শ্লোক পড়ি। কখনো বা তার মাঝেই 'পুত্র কন্যা সকলি অসার' বলে অজান্তেই দু-এক কলি বরগীত গুণগুণ করি। ক্ষণিকের জন্য মনে স্থৈর্য ফিরে আসে। উদাস দৃষ্টিতে কোনো এক দিকে তখন তাকিয়ে থাকি।

মনের এমনি অস্থিরতার সময়েও কর্তব্যকর্মগুলি থেকে যায়। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছি যখন, বেদবিহিত কাজগুলি করতে হবে, মন্ত্রের মাধ্যমে প্রেতাত্মার মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ধীরে ধীরে দানোৎসর্গের দিন এল। যা আমার ছিল মুক্ত হাতে বিলিয়ে দিলাম। মানুষটিই যখন রইল না তখন আর কিছুর আবশ্যক নেই, মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে দ্বিগুণ বিষের জ্বালা আর ভোগ করব না।

বাসন্তীর পারলৌকিক কাজের সেদিনই শেষ দিন। পুরোহিত হুকুম দিলেন, 'বাপু, প্রণাম কর।' গলায় গামছাখানা জড়িয়ে আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। পুরোহিত আশীর্বাদ করলেন—ভগবান যেন আমাকে ধন, সোনা, ঐশ্বর্য দিয়ে বিভূষিত করেন,

আমাকে তেজস্বী যশস্বী করেন এবং অচিরেই যেন আমার বিয়েটা হয়ে যায়। পুরোহিতের শেষ বাক্যে আমি চিৎকার করে বললাম, "ঠাকুর, আমাকে এ আশীর্বাদ করবেন না। সংসারে আমার আসক্তি নেই। মায়াজালে পুনরায় আবদ্ধ হওয়ার আকাঙক্ষা নেই।" ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমাকে বোঝালেন, "বাপুহে সব কিছু ভুলে যাও। সবই পদ্মপত্রে জল। এই আছে এই নেই। তোমার বয়স কম। তিন কুড়ি চার কুড়ি বয়সেই কত লোক নূতন করে সংসার পাতছে। তোমার জন্যে দিনের হিসাব তো আর আলাদা করে বেড়ে যায় নি। মাথার চুলের সমান আয়ু এখনও রয়েছে তোমার। ভুলে যাও। তোমার বৌ তোমার শত্রু ছিল। তাইতো তোমায় ছেড়ে চলে গেল। এখন নূতন করে ঘর-সংসার পাতো, সুখী হও।"

ওরা সবাই আমাকে নানা ভাবে বোঝালেন, আমার মনের গতি অবশ্য পালটালো না। বরঞ্চ এদের উপর আমার রাগ হল। কিন্তু সেদিন তাঁরা আমার বাড়িতে অতিথি, তাই প্রতিবাদ করলাম না, চুপ করে রইলাম।

ক্রিয়াকর্ম শেষ হয়ে গেলে বাসন্তীর বিরহ আরো বেশী করে অনুভব করতে লাগলাম। এ কদিন শ্রাদ্ধাদির আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম, মনের দুঃখ শোকও আড়ালে ছিল। এখন কর্মহীন জীবন, চিন্তাভাবনাগুলো সুযোগ পেয়ে জাপটে ধরেছে। মনটা সব সময়েই ফাঁকা লাগে। ঘরের ভেতর ঢুকলেই চোখে পড়ে বাসন্তীর ব্যবহার করা আরশি, চিরুনি, তেলের শিশি ইত্যাদি। মনের যন্ত্রণা তাতে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এভাবে বাড়ির প্রতি আকর্ষণই আমার কমে যেতে লাগল। অবশেষে একদিন যন্ত্রণার আকর এই বাড়িটি থেকে বেরিয়ে এলাম। হাতে অল্প যে কটি টাকাপয়সা ছিল, তাই সম্বল, বাকি জিনিস-পত্র যেমন ছিল তেমনি রইল। বেরিয়ে পড়েছি, যদিও কোথায় যাব, ঠিক নেই। মনের আশা এমন একটা জায়গা খুঁজে পাব যেখানে বিচ্ছেদের নিদারুণ মনস্তাপ নেই, নেই বিরহের তুষানল।

দুবছর এভাবে ঘুরে বেড়ালাম, ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ভেসে আসা নলখাগড়ার মত স্থান থেকে স্থানান্তরে। কোথাও বেশিদিন থাকিনি, থাকার ইচ্ছেই হয়নি। দুবছর এভাবে গেল। মনে তবু স্থিরতা এল না, মনের সুপ্ত বেদনার পুরো উপশম ঘটল না। অবশেষে এই উদ্দেশ্যহীন জীবনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম এক ধরনের গতানুগতিকতা—যা অস্থির অথচ অভিনবত্বহীন। বিরক্ত লাগল। আবার বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে মাত্র। কাকা এসে আদর করে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন, হয়তো মমতা বশতঃ, হয়তো বা স্বার্থের তাড়নায়। তাঁর ছেলে এখনও নাবালক, অথচ তিনি বৃদ্ধ। এখন আমি তাঁর সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়, গুয়াহাটির যজমানের ঘরে শ্রাদ্ধাদি ও পুজো আচ্চায় একজন সহায়ক দরকার হয়। যজমানের ঘরে গিয়ে পুজো আচ্চা করা আমার নূতন কাজ নয়, আমার

অভ্যাস রয়েছে। শুধু দুবছর এগুলি থেকে সরে থাকার দরুণ মন্ত্রগুলি সব ভাল মনে নেই। সেগুলো ঝালাই করতে সময় বেশি লাগল না।

কাকার কথায় ধীরে ধীরে আবার আমি বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। আগের জীবন ছিল কর্মহীন, এখন তা হয়ে দাড়াল প্রনালীবদ্ধ। ভোরে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে সন্ধ্যা আহ্নিক, দুপুরে খাউন্দের ঘরে শালগ্রাম পূজা আর শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, বিবাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি পুঁথি থেকে মন্ত্রাদি মুখস্ত করা আমার নিত্যদিনের কর্মতালিকার অন্তর্গত হল। এছাড়াও মাঝে মধ্যে কাকার সঙ্গে যেতে হয়, তাকে সাহায্য করতে হয়।

পরকে আপন করে নেওয়ার গুণটি খাউন্দ পরিবারের সকলেরই রয়েছে। ধনীমানী পরিবার হলেও তাঁদের আদর যত্ন আন্তরিকতা ভোলা যায় না। কদিনের মধ্যেই আমার বিমর্ষতা অনেকখানি তাঁরা ঘুচিয়ে দিলেন। আমিও সংসারের টানা-পোড়েনের মধ্যে ফিরে এসে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইছি।

খাউন্দের বাড়িতে শালগ্রাম পূজা করতে সবাই সাহস করে না। অনেকেই দেবতার কোপের ভয় করে। পূজা অর্চনায় ক্রটি হলে দেবতার রাগ হয়, আর সে রাগের আগুনে যথেচ্ছাচারী পূজারী দগ্ধ হয়। লোকে বলে এই শালগ্রাম শিলার শক্তির বলেই খাউন্দের এত বাড়বাড়ন্ত। জাগ্রত এই দেবতার পূজা সেবা যদি ঠিকমতো চলে তবেই খাউন্দের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি অটুট থাকবে।

অন্যরা এমন কথা বললেও খাউন্দ পরিবারের লোকদের কিন্তু এই পূজার ব্যাপারে একটু উদাসীনই যেন মনে হয়। শালগ্রামের ভোগ হোক না হোক বাড়ির সবাই কিন্তু এগারোটা বাজলেই খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় গড়িয়ে নেয়। সেবার সময়টাতে তাঁদের অনেকেরই অকর্মণ্য দেহস্থিত কর্মঠ নাকটি থেকে ঘড়ঘড় শব্দ নিঃসৃত হতে থাকে।

দেবতার সেবা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেন মাত্র একজন হতভাগিনী। তিনি বিধবা, যৌবনের আশা আকাঙক্ষা মুকুলিত হতে না হতেই তিনি ব্রহ্মচারিনী। মন্দিরের পাশের চালা ঘরটিতে তিনি একা নীরবে দেবতার পুজোর প্রতিক্ষায় বসে থাকেন। ফুল বেলপাতা যোগান দেওয়া, দেবতার ভোগ তৈরী করা, সবই যেন তাঁর একারই দায়িত্ব। তাঁর বুড়ি শাশুড়ি রয়েছেন, কিন্তু তাঁর এগুলোতে সেরকম ভক্তি শ্রদ্ধা রয়েছে বলে মনে হয় না। মাঝেমধ্যে তিনিও মন্দিরে আসেন, কিন্তু পূজোর যোগাড় যত্নের জন্যে নয়, বধূটির কাজে ব্যাঘাত দিতে নতুবা তার কাজে কর্মে খুঁত ধরতে। বিধবা বধূটিকে লক্ষ্য করে প্রায়ই বলেন, "পাপীয়সী এসেই মেজ ছেলেটিকে খেয়েছিস। আর কি যে করবে, কে জানে।" শাশুড়ি বোধহয় উত্তরের আশায়ই আমার দিকে তাকান। আমার রাগ হয়, বৌটির জন্যে দুঃখ

হয়। চোখ চুলে তাকালে দেখি যে বৌটির চোখে জল টলমল করছে। আমার মন কেঁদে ওঠে। তাঁর মুখখানি করুণ, বাসন্তীর মুখের মত ম্লান, মায়াময়। শাশুড়ির প্রতি রাগ হয় কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না। কাঠের পুতুলের মত সব কাণ্ডকারখানা দেখি, শেষে সরে গিয়ে বেদীর উপর কুশাসন পেতে বসে পড়ি। সিংহাসন থেকে শালগ্রাম শিলা নামিয়ে স্নান করাই, ফুল তুলসী দিয়ে পূজা শুরু করি। শাশুড়ি সরে যান, বৌটি দূর থেকে পূজাবিধি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। তাতেই বোধহয় তিনি কিছু শান্তি পান। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা পরে আমার পুজো শেষ হয়। ভক্তিভরে বিগ্রহকে সিংহাসনে তুলি, আর বিষ্ণুর পাদোদক গ্রহণ করে বাড়ির পথ ধরি। বৌটি কোনো কোনো দিন ডাকেন, "ঠাকুর মশায়, এখানেই ভাত খেয়ে যাবেন। কাল একাদশী গেল, আজ পালন করতে হয়।"

আমি আপত্তি করি না। বড় আদর যত্ন করে খাওয়ান। তিনি বোধহয় ভাবেন আমাকে খায়ালে তাঁর আগের জন্মের পাপরাশি নিঃশেষ হবে। আলুর দম, কচুশাক, ঢেঁকিশাক জাতীয় সাধারণ আয়োজন হলেও আমি তৃপ্তি করে খাই।

আমার জীবনের এও এক অভিনব অভিজ্ঞতা, আগেকার জীবনের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সংসারের মায়াপাশ আমাকে আবার জড়িয়ে ধরল নাকি?

একদিন মন্দিরে ঢুকে পূজায় বসেছি। সেদিনের আয়োজন অন্যদিনের চেয়ে বেশি, অথচ কোনো উপলক্ষ্য নেই। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সব সামগ্রীই পরিপাটি করে সাজানো, পূজো শুরু করার আগে থেকেই ধূপধূনার গন্ধে গোটা মন্দিরটি আমোদিত। এর অর্থ কি বুঝতে পারলাম না। বোধহয় দুঃখিনী ঐ বিধবাটির এ এক অহৈতকী আনন্দ। বেচারীর সন্তান-সন্ততি নেই। অন্যের ছেলে মেয়েকে বেশি আদর আহ্লাদ করলেও শাশুড়ি দোষ ধরেন, কি জানি পাপীয়সীর পরশে তাদের যদি অমঙ্গল হয়। সেই জন্যই নিদ্রিত মূক দেবতার পূজোর যোগাড় যত্নে তাঁর এত আনন্দ। নাকি নিদ্রিত দেবতার জাগরণ ঘটানোর জন্যই তাঁর এই আকুতি?

চিন্তা করে লাভ নেই, কুশাসনে বসে পূজো শুরু করলাম। বেদীর চারিদিকে সুসজ্জিত নৈবেদ্যর মধ্যে শালগ্রাম শিলাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ভগবানের এ যেন তেজোময় জাগ্রত অবস্থা। দেবতার ধ্যান করে অনেকক্ষণ শালগ্রামের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মন বলছে, 'ভগবান, জাগ্রত হও।' যথারীতি পূজো শুরু করলাম। এত একাগ্রতা নিয়ে কোনোদিন দেবতার পূজো করিনি। নিজের অস্তিত্বই যেন ভুলে গেছি। স্বয়ং ভগবানই যেন আমার হৃদয়ে স্থিত হয়েছেন। ঠিক এই সময়ে পেছনে গলা শুনলাম, "ঠাকুর মশায়"।

চমকে উঠলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি হাঁটু গেড়ে সেই দুঃখিনী বিধবা। তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখে অস্থিরতার ক্ষীণ কম্পন। নিস্তেজ,

কান্তিহীন ছলছল চোখে তিনি শালগ্রামের দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে উপড়ে এনে তিনি যেন দেবতাকে নিবেদন করতে চাইছেন। সাক্ষী আমি, অন্নহীন, হতভাগ্য দরিদ্র এই ব্রাহ্মণ। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কাঁদছেন কেন?"

"বাবা, আমি বড় দুঃখিনী, পাপীয়সী। আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন তাড়াতাড়ি মারা যাই।" তাঁর যন্ত্রণাপীড়িত মুখের উপর চোখের জলের ধারা। আমি ইষ্টনাম নিলাম, ভাবলাম বিলাসকক্ষ, প্রমোদউদ্যানের মধ্যেও জ্বালা-যন্ত্রণার বৃশ্চিক দংশন আছে, তিল তিল করে জীবন নাশের তীব্র হলাহল রয়েছে।

তিনি বলে চললেন, "সত্যিই আমি পাপীয়সী, কাল বাচ্চাকে একটা চড় মেরেছিলাম। আজ তার জ্বর, ছটফট করছে, আর শাশুড়ি আমাকে গালাগালি করছেন। আমার হাতে বিষ আছে—যা স্পর্শ করি তাই বিষাক্ত হয়ে যায়। বাবা, আমি মানুষ, সব কিছু সহ্য করতে পারি না। আমার মরে যায়াই মঙ্গল, আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

"এমন কথা বলতে নেই মা", সান্ত্বনার সুরে আমি ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলাম, "আপনি রাজার ঘরের বৌ, পাপীয়সী কেন হবেন। ভগবানের নাম নিন, তিনিই আপনাকে শান্তি দেবেন। তিনিই সকলের মালিক।"

আবার ঘুরে বসে অর্ধসমাপ্ত পূজোয় মনোযোগ দিলাম। কিন্তু আমার উদাসীনতায় যেন ভগবানের জাগ্রত মূর্তি অন্তর্ধান হয়ে গেছে। সেই তেজোময় দীপ্তির বদলে সামনে এখন একখানা কান্তিহীন প্রস্তর খণ্ড। ভয় এবং অস্থিরতায় আমার অন্তর কাঁপতে লাগল। বাকী পূজো শেষ করতে মন দিলাম। কিন্তু মুখের মন্ত্রের উচ্চারণ আর ঠিক হয় না। তবু অভ্যাস মত ক্রম অনুযায়ী ফুল বেলপাতা দিয়ে যাই। চঞ্চল মনে অস্থিরতার মধ্যে পূজো শেষ করলাম। 'প্রণাম করুন' বলে পিছিয়ে যেতেই অজ্ঞাতে তাঁর পায়ে পা ঠেকাল। সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম নিয়ে তাঁর পা ছুঁতে যাব, তিনি আমার হাত খপ্ করে ধরে বললেন, "কি করেন, কি করেন বাবা, আপনি বামুন, কুলদেবতার পূজক।"

তাঁর শীতল হাতের স্পর্শে গোটা শরীরে একটা শিহরণ অনুভর করলাম। বড় লজ্জা পেলাম। অবশেষে বলি, "আমি আপনাদের সংসারের একজন ভৃত্যমাত্র, মা"।

উত্তেজিত হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি ভৃত্য নও, বাবা। তোমার কাছ থেকে যে সহানুভূতি আমি পাই, অন্যের কাছ থেকে যদি তা পেতাম তবে আমার দুঃখ অনেকখানিই কমে যেত। কিন্তু বাড়ির সবাইর আমি চক্ষুশূল। দিনরাত আমার ভাগ্যে শুধু গালাগালিই জোটে। আমার বেঁচে থাকার দরকার নেই। সংসার আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে। আমি জ্বলে-পুড়ে মরছি, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। আর কত

জালা সহ্য করব”—কথা বলতে বলতে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। দয়া আর করুণায় আমার অন্তর ভরে গেল। প্রবল ইচ্ছা হল তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিই, কিন্তু সাহস হল না। শুধু তাঁর মাথায় ডান হাতখানা রেখে আশীর্বাদ করলাম আর মাথার চুলের উপর পূজার নির্মাল্য ছুইয়ে দিলাম। তারপর বিমর্ষ মনে মন্দির থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

এটাও আমার জীবনের একটা নূতন অভিজ্ঞতা। দুচারটা কারুণ্য মিশ্রিত কথা দিয়েও অন্যের হৃদয় জয় করতে পারি। অন্যের বেদনার অংশ নিতে কোনো কোনো সময়ে মানুষ উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি নিরন্ন, দুর্বল, শক্তিহীন। আমি কি খাউন্দ বাড়ির বধূর দুঃখ মোচনে সক্ষম? মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আমার উদ্ধত প্রকৃতি, উদ্দত্ত চেতনা, তারও নিশ্চয়ই গুরুত্ব রয়েছে, মূল্য রয়েছে। বিষাক্ত আবেষ্টনীর মধ্যে নিঃসহায় বিধবাটির জীবনীশক্তি তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আমি তা দূর থেকে দেখছি। এ ব্যাপারে কি আমি নীরব দর্শক হয়ে থাকব? এই দুঃখিনী বিধবার দুঃখের সহমর্মী হতে আমার প্রকৃতি আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সংসারে কতশত মেয়ের সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে আর কত শত পুরুষের পত্নী-বিয়োগ হয়েছে। তবুও বাসন্তীর বিয়োগে আমার মনের যে অবস্থা হয়েছে, তাতেই আমি এই বিধবার মানসিক যন্ত্রণা অধিকতর অনুভর করতে পারছি। বসন্তের ফুলের কলিটি আধফোটা অবস্থায়ই ম্লান হয়ে গেল। অপরূপ সৌন্দর্যের উপচে পড়া সমারোহ কণ্টকে কণ্টকে বিদীর্ণ হয়ে গেল। কোকিলের পঞ্চম রাগিনীতে এই শুকনো ফুল কি আবার পাপড়ি মেলবে? বিধবার দুঃখে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মনে ভাবি তাঁর দুঃখ মোচন করব, কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু করতে পারি না। একেই বোধহয় বলে নিষ্ফল সহানুভূতি।

আগের মতই খাউন্দের বাড়িতে যাতয়াত করি। ঠিক আগের মতই শালগ্রাম শিলার পুজো করি, কিন্তু ভগবানের সেই উজ্জ্বল রূপ আর সামনে প্রতিভাত হয় না। তবু নিবিষ্টমনে পুজো করে যাই—ধন দৌলত কিছু কামনা করি না, শুধু সেই বিধবাটির সুখ আর শান্তি কামনা করি।

আরেক দিন। পুজো করতে গিয়ে দেখি কিছু যোগাড় নেই। কাছের চালাটাতে বসে বিধবাটি কাঁদছেন। দূর থেকে বলি, “মা ধূপ ধূনো বৈবেদ্য এ সবের যোগাড়—?”

তিনি দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছলেন। বললেন, “করি নি। আর করেই বা কি হবে? মানুষের মত ভগবানও আমার প্রতি বিরূপ। তবু চলুন, এখনি সব করে দিচ্ছি।”

এই বলে তিনি মন্দিরের ভেতরে ঢুকলেন। কুশাসন পেতে আমিও কোশোকুশি ইত্যাদি সাজাতে লাগলাম। নৈবেদ্য সাজাতে সাজাতে তিনি বলেন, “বাবা, আজ

তিন বছর হল ভগবানকে ডাকলাম, কোনো ফল হল না। দুঃখহারী ভগবান দ্রৌপদীর দুঃখ মোচন করেছিলেন সত্য, কিন্তু এই অভাগিনীর দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। এখন দেখছি দেবতা নয়, মানুষই আমাকে সাহায্য করতে পারে। আমার আপন বলতে কেউ নেই। মা বাবা ভাই থাকলে হয়তো উপায় হত কিন্তু তাও আমার নেই। আমার যে কি হবে।" বিধবার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। আমি ইতিমধ্যে শালগ্রামকে স্নান করিয়ে চন্দন তুলসী দিয়ে সাজাচ্ছি। তিনি বলে চলেন, "শাশুড়ির গালাগালি অসহ্য হয়ে উঠেছে। এখান থেকে চলে যেতে পারলে রক্ষা, নইলে সীতার মত আমাকে বনবাসে দেবে, দুর্বৃত্ত নরপিশাচের মধ্যে আমাকে রেখে আসবে।"

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, "বুড়িমা বদরাগী। তাঁর কথা ধরতে নেই।" আমার কথায় তিনি সান্ত্বনা পেলেন না। আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাড়িতে গেলাম। এর পর থেকে পুজো করতে যাই আর বিধবার অশান্তির বৃদ্ধি লক্ষ্য করি। দেবতার পুজো-আচ্চায় তাঁর বিশ্বাস যেন কমে আসছে। তাঁর স্বভাবও আগের চাইতে গম্ভীর হয়ে গেছে, একটা সংশয় যেন তাঁর দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। আমি মাঝেমধ্যে একটা দুটো কথা বলি। একদিন তিনি কাতর কণ্ঠে জানালেন, "সত্যিই এরা আমাকে বনবাসে পাঠাবে।" তারপর কদিন এক নাগাড়ে এই একটি কথাই আমাকে বারবার বলতে থাকেন। আমার বুক আতঙ্কে শিউরে উঠল। প্রতিজ্ঞা করে বললাম, "এমন যদি হয়, আপনাকে আমি উদ্ধার করব, আশ্রয় দেব।"

একটু সময়ের জন্য বিধবাটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর মুখ থেকে বেরুলো, "তাতে তোমার জীবনও দুর্বিষহ হবে।" ধীর পদক্ষেপে তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দিন পাঁচেক পর থেকে দেখলাম শালগ্রাম পুজোর আয়োজন করে দিচ্ছে একটি ছোট মেয়ে আর কখনও বা বুড়িমা নিজেই। প্রতি মুহূর্তে তাঁর কথা মনে পড়ে, মন্দির শূণ্য মনে হয়। শালগ্রাম মূর্তিটাও যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। পুজোয় আমার মন লাগে না। দুঃখিনী বিধবার অনুপস্থিতিতে দেবতাও বুঝি বিরূপ হয়ে গেছেন। অশ্রুজলের অর্ঘ্য দিয়ে বিধবা দেবতার চরণে তাঁর জীবন যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রকৃত পূজারিনী, আমি উপলক্ষ মাত্র। তাঁর অনুপস্তিতিতে দেবতার মুখখানি নিশ্চিতই ম্লান হয়ে গেছে। বিধবার আত্মনিবেদনে দেবতা যে জেগে ওঠেন নি, তাই বোধহয় এই অনুশোচনা।

বিধবার খবর নিলাম কিন্তু সঠিক জানতে পেলাম না। কদিন পরে জানলাম তাঁকে কোন একটা আশ্রমে পাঠানো হয়েছে। তাঁর চরিত্রে সন্দেহ করা হচ্ছে। সন্দেহের কারণ আমি নিজে। বড় লজ্জা হল। এই অপযশে আমি পশুর চেয়েও নিচে নেমে গেছি মনে হল। হঠাৎ মনে হল মন্দিরের দেবতাকে সাক্ষী করে যে

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তার কথা। এই চিন্তা আমার উদ্ধত মনকে উত্তাল করল। প্রতিজ্ঞা করলাম যে বিধবাকে উদ্ধার করে দেখাব যে উৎপীড়িতার প্রতি স্নেহ দয়ার বাইরে আমার মনে কামনার লেশ মাত্র নেই।

সেদিনই খাউন্দের বাড়ির সঙ্গে সকল সংস্রব ছিন্ন করলাম। অনুসন্ধান করে আশ্রমের ঠিকানা নিয়ে গুয়াহাটি ছেড়ে বেরুলাম।

আশ্রমে অনেক যুবতী আর বৃদ্ধা রয়েছেন। শুনলাম আগে সংখ্যা আরো বেশি ছিল, কিন্তু এখন কাউকে কাউকে অন্যের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। আরো কিছু অনাথা আজীবন বহ্মচারিনী ব্রত উদযাপনে ইচ্ছুক।

আশ্রমে গিয়ে আমার ভালও লাগল আবার দুঃখও হল। ভাল লাগল এর প্রণালীবদ্ধ জীবনযাত্রা দেখে আর দুঃখ হল এই হতভাগিনীদের ভাগ্যের কথা ভেবে। জীবনে সামান্য পদস্থলনের দোষে এদের অধিকাংশই নির্যাতন ভোগ করেছে, কেউ কেউ হয়তো বিনা দোষেই স্বজন দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কলঙ্ককালিমায় চিহ্নিত হয়েছে। অথচ আমাদের সামনে কলঙ্কিতের স্থান রয়েছে, প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনার ক্ষেত্র অবারিত। কেবল কলঙ্কিতার স্পর্শে ধূলিকণা কলুষিত হয়ে ওঠে, আকাশ বাতাস বিষবাষ্পে ভরে যায়। লাঞ্ছিতারা তাই সমাজচ্যুতা। খাউন্দ বাড়ির বৌটি লাঞ্ছিতা। তাঁর সঙ্গে দেখা করব এবং পারলে তাকে নির্যাতন থেকে উদ্ধার করব এই আশা নিয়ে এসেছি। পতিতার সংস্পর্শ আমাকে কলুষিত করতে পারবে না। আমি সমাজের নৈতিক মানদণ্ডের বাইরে। আমি তাঁকে খুঁজে বার করলাম। আমাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে দূরে দাড়িয়ে রইলেন। এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আপনার খোঁজে এসেছি। আপনার প্রতি সবাই অবিচার করেছে।"

তিনি আমার হাত দুখানা ধরে বললেন, "বাবা, যদি কোনো উপায় থাকে, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চল। এখানে নানা রকমের মানুষ, সবাই অপরিচিত, পর, কেউ কারো দুঃখ বোঝে না। এখানে থাকলে আমি মরে যাব। আমি ঘরের বৌ ঘরে ছিলাম। এদের সঙ্গে আমি কোনো দিনই মিশতে পারব না। হিন্দুস্তানী বাঙ্গালী কতরকমের মানুষ এখানে, তাদের কথাই আমি বুঝি না। কি জানি কি একটা অজানা ভয় আমার মনে দানা বেঁধেছে। এ এক নূতন অশান্তি। জানি না কি অপরাধে ভগবান আমাকে এই শাস্তি দিয়েছেন। আমার কোনো দোষ নেই বাবা।"

তাঁর কথায় আমার মন আরও নরম হল, প্রতিজ্ঞা-কঠিন হল। "আপনাকে উদ্ধার করার জন্যই এসেছি। স্বয়ং ভগবানকে সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আপনাকে উদ্ধার করব। সেই ভগবানের আদেশ মাথায় নিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।"

আমার কথায় তিনি আশ্বস্ত হন। তাঁর চোখে মুখে বেদনা লাঘবের চিহ্ন ফুটে

উঠল। তিনি আশ্রমের বাইরে যেতে চান, বন্ধন থেকে মুক্তি চান। তার জন্য অজানা ভবিষ্যতের দিকে অন্ধকারে ঝাঁপ দিতেও তাঁর আপত্তি নেই।

মনে মনে তাঁর সাহসের প্রশংসা করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসি। তিনি নিজেই যেখানে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, সেখানে তাঁকে আশ্রম থেকে নিয়ে আসতে কোনো বাধা হবে না বলে মনে হল। কিন্তু আমাদের দুজনের মাঝে একটা দুর্লঙঘ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দুজনে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হই, তবে আশ্রমের পরিচালক তাঁকে আমার হাতে ছেড়ে দেবেন না।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। এমন একটা জটিল সমস্যায় পড়ব বলে কোনোদিন কল্পনাও করি নি। কি করি? দিন রাত ঘুরে ফিরে একই কথা ভাবছি। কিন্তু সমাধানের উপায় বের করতে পারি না। একদিকে মুক্তিকামী বিধবার কাতর অনুনয়, অপর দিকে কামনাশূন্য কর্মের নৈতিক আদর্শ। একদিকে জাগ্রত ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে লোকচক্ষুর বিচার, যা আমাকে স্বার্থ ও লালসার বিষবাষ্পের প্রতিভূ হিসাবে চিহ্নিত করবে। দুটো পথ, কোন্‌দিকে অগ্রসর হলে আমার আদর্শও অটুট থাকবে, আবার বিধবারও মুক্তি হবে। যত ভাবি ততই সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে। তবু আবার ভাবি। মুহূর্ত আগে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মুহূর্ত পরে আবার তা বরবাদ করে দিই।

আজ চারদিন হল তাঁর সঙ্গে দেখা করি নি। তিনি বোধহয় ভাবছেন যে আমি তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছি। আমার মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার সংবাদ তিনি কি করে পাবেন?

পঞ্চম দিনে মনস্থির করে আশ্রমে গেলাম। তিনি আমার সামনে সরে এসে অতি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "আমি কবে এখান থেকে যেতে পাব?"

আমি ধীরস্থির ভাবে বললাম, "আপনার সামনে এক গুরুতর বাধা। যদি সে বাধা অতিক্রম করতে পারেন তবেই মুক্তিলাভ সম্ভব, নইলে নয়।"

তিনি মাথা নীচু করে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। আমি আগের সুরেই বললাম, "আপনি সেই বাধা অতিক্রম করতে পারবেন?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বিধবার বুকে পাথর হয়ে রইল। একটু আগে যে চোখ উজ্জ্বল ছিল, তা দীপ্তিহীন আর স্থির হয়ে রইল। আমি ভাবছি তাঁর সামনে আর কি বলব। ধীরে ধীরে বললেন, "আমার উদ্ধারের কি কোনো উপায় নেই?" তাঁর চোখ ছল ছল করে উঠল। "আমি সব শুনেছি। কিন্তু আমার যে মান ইজ্জত সব গেছে। আমি যে অপযশের বোঝা মাথায় নিয়ে আশ্রমবাসিনী হয়েছি। আমি যে পতিতা।" তিনি হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। "আমার সঙ্গ সকলেই ত্যাগ করবে। আমাকে সবাই লাথি ঝাঁটা দেবে।"

বিধবার অশ্রুপাতে আমার দুঃখ হল না, একদিন মন্দিরে তাঁর চোখের জল

দেখে আমার হৃদয়ে শেল বিঁধেছিল, কিন্তু আজ তাঁর বিদ্রোহের ভাব আমার বুকে সাহস আনল। শুধু নিষ্ফল সহানুভূতি নয়, বিধবার অন্তরের এই শোকশেল উপড়ে এনে সেই বিদীর্ণ হিয়া আমি গন্ধমাদনের বিশল্যকরণী দিয়ে নিরাময় করে দেব।

বিধবা আমার দিকে মাথা তুলে বললেন, "যাও, আমি পতিতা, চিরদিন পতিতা হয়েই কাটাব।"

উত্তেজিত হয়ে বললাম, "আপনি যদি পতিতা, আমিও তবে পতিত। আমাদের সমাজে প্রকৃত পতিতের সংখ্যা হাজার হাজার। এই পৃথিবীতে তাদের স্থান হলে আপনার হবে না কেন?" তিনি আমার কাছে সরে এসে বললেন, "কিন্তু আমার সংস্পর্শে এলে যে তোমার অকল্যাণ হবে।"

আমি তক্ষুণি উত্তর দিলাম, "তা নিয়ে ভাবি না। যদি না পারি, তবে পালিয়ে যাব, হিমালয়ের এক কোণে নিশ্চয়ই আমাদের স্থান হবে।"

আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তিনি বলে উঠলেন, "আমার সম্মান আগেই গেছে। এখন তা আর ফিরে পাব না। এই সমাজের হলাহল থেকে আমরা দূরে পালিয়ে যাব। এত বড় পৃথিবীর কোথাও নিশ্চয়ই আমাদের ঠাঁই হবে।"

পরদিন আড়ম্বরহীণ ভাবে আশ্রমের পরিচালক আর কর্মচারীদের সামনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। মনে পড়ল মন্দিরের মধ্যে সেই যে জাহ্নবী আমার হাত ধরেছিল। এই বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল। নইলে জাগ্রত দেবতা সেদিনই চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে দুজনকে আলাদা করে দিতেন।

ভগবানের আশীর্বাদ আর মানুষের নিন্দাবাদ মাথায় নিয়ে নূতন জীবনপথের যাত্রী হলাম। কাকা আমাকে সমাদরে ঘরে তুললেন না, আত্মীয় স্বজন আমাকে দূরে ঠেলল, কারণ আমি সমাজচ্যুত। তাই সমস্ত মায়া মোহ বর্জন করে আশ্রয় নিয়েছি একটা অচেনা জায়গায়, কিছু পিছিয়েপড়া মানুষের মধ্যে। আমার ভাই বন্ধু সহায় কিছুই নেই, এই পিছিয়েপড়া লোকগুলোই আমার ইষ্ট মিত্র আত্মীয়-স্বজন। কখনও বা তারা আমাকে সম্মান করে, সাহায্য করে। আবার মদ খেয়ে মাতাল হলে তারাই আমাকে শাপশাপান্ত করে, অত্যাচার করতে আসে। তবু এখানেই আছি আর এদের সাহায্যে কিছু জমি নিয়ে চাষবাস শুরু করেছি। এই অভাব অনটনের মধ্যে জাহ্নবীর আশাবাদ দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে নানা ধরনের সংশয়ের ভাবনা এসে আমাকে বিব্রত করে। কখনও ভাবি অন্যত্র সরে যাব। এখনও সত্যিকারের কোনো স্থিরতা আসেনি। তবুও দজনেই আশা করে আছি। ভগবানের আশীর্বাদেই আমাদের মিলন হয়েছে, তার শুভ ফল নিশ্চয়ই লাভ করব। ❐

**রমা দাস**

জন্ম গুয়াহাটি, 1909 খৃষ্টাব্দে। ছোটবেলা থেকেই কৃতী ছাত্র, কলকাতা থেকে বি.এ পাশ করে শিলং-এ আসাম সরকারের উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন। "রমা দাসর শ্রেষ্ঠ গল্প" শিরোনামে একটি গল্প সংকলন বেরিয়েছে, যদিও আরো বহু গল্প ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

# বর্ষা যখন নামে

জয়ন্ত এডমাণ্ডস কলেজের রাজনীতি বিজ্ঞানের যুবক অধ্যাপক। গোটা তিনেক বিরক্তিকর বক্তৃতা শেষ করে সে এইমাত্র মখারের খোলামেলা বোডিং-এ তার নিজের ঘরে ফিরেছে। এখন সে আপন মনে সিগারেট খাচ্ছে।

একটা শেষ হওয়ার আগেই সে আরেকটা সিগারেট ধরায়। মনে হয় যেন টেবিলের উপরে রাখা প্লেয়ার্স নেভিকাটের পুরো টিনটি এক বৈঠকেই শেষ করতে হবে, এমনি একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই সে বসেছে।

শিলং-এর জুন মাস।

ভোর থেকেই উদাস মনসুন বিরতিহীন ধারাবর্ষণ হয়ে ঝরে পড়ছে। স্থির, স্থবির, পঙ্গু মনগুলিও তার প্রভাবে একটু চপল চঞ্চল হয়ে কাব্যের দিকে ঝোঁকে। পূর্ণতার পরিতৃপ্তির মধ্যেও তারা যেন অনাস্বাদিত নূতন কোন এক অপূর্ণতার অতৃপ্তির মধ্যে বারবার অবুঝের মত লীন হয়ে যেতে চায়।

সামনের খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে জয়ন্তর ঘরের মেঝেকে ভিজিয়ে দেয়। পাশের ঘর থেকে ওয়ান নো ট্রাম্প, টু হার্টস্, থ্রি ডায়মণ্ড্স্, ফোর ক্লাব্সের হৈ চৈ বৃষ্টির শব্দ ভেদ করেও তার কানে এসে পৌঁছায়। পাশের কোনো একটা বাড়িতে কারা যেন 'আজি শাওন ঝরে' গানটি গ্রামোফোনের সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে বীভৎস কোরাসে গাইছে। জয়ন্ত তবুও একই ভাবে আকাশ থেকে ঝড়ে পড়া বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শুধু সিগারেটই পুড়িয়ে যাচ্ছে।

কখনও বা সে আধপোড়া সিগারেট মুখে নিয়ে দেয়ালে টাঙানো জাপানী আয়না-খানার সামনে দাঁড়ায়। আবছা হয়ে আসা ঘরের ম্লান আলোয় তার প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ সুগঠিত সুন্দর দেহের সঙ্গে মানানসই সুন্দর মুখখানির মধুরিমা মাখা সুস্পষ্ট রেখাগুলোকে সে বড় আগ্রহের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে। দীপ্ত গৌরবের একটা সংযত হাসির আভাস তার ওষ্ঠের কোণে খেলে যায়। বইয়ের শেলফ থেকে খুব আগ্রহের সঙ্গে সে অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডোরিয়ান গ্রে' খানা পড়ার জন্যে নিয়ে আসে, আবার না পড়েই শেলফের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। অকথিত একটা গানের সুর তার কণ্ঠের ভেতরে অকারণেই গুণগুণ করে ওঠে। ভাল করে না পড়েই কলেজ থেকে আনা যে তিনখানি চিঠি সে টেবিলে ফেলে রেখেছিল, সেগুলো এবার হাতে তুলে নেয়।

ঠিক দু'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম বর্ষণের বেগ হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক ভাবেই কমে আসে।

জয়ন্ত খুব ব্যগ্রভাবে কয়েক বার বাইরে উঁকি মেরে তাকাল, তারপর আধপোড়া সিগারেটটা নিভিয়ে বাইরে ফেলে দিল। বিক্ষিপ্ত মনটাকেও সেই সঙ্গে সামলে নিয়ে সে ঘরের বাতিটি জ্বালিয়েই তার সব চাইতে পছন্দসই পোশাকগুলো তাড়াতাড়ি বেছে নিল, তারপর পরিপাটি করে পোশাক পরায় মন দিল।

ঘরে বিজলীবাতি জ্বলছে। তার আলোয় সুন্দর বেশবাস আর প্রসাধনের দৌলতে জয়ন্তর সুন্দর দেহকান্তি আর মুখমণ্ডল আয়নার বুকে আরো কমনীয় রূপে প্রতিফলিত হল। ওষ্ঠের কোণে লেগে থাকা মুচকি হাসিটি এবার পার ভেঙ্গে গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। আবেগের উচ্ছ্বাসে তার অতি প্রিয় শেলীর 'ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতাটি নিজের অজান্তেই সে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি করে ফেলল। এবারে আয়নার সামনে শেষবারের মতো এসে দাঁড়াল। সুন্দর করে আঁচড়ানো চুলের উপর অকারণেই দুবার ব্রাশ বুলিয়ে নিল, পরিপাটি করে বাঁধা টাইটি দু'বার টেনেটুনে দেখল, টাই আর কোটের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নেওয়া বুক পকেটের রুমালখানা আর বাটনহোলে ঢোকানো কারনেশান ফুলটি এমনি কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখল। তারপর বিপুল উৎসাহে বর্ষাতি আর ফেলট্ হ্যাট হাতে তুলে নিল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে একই উৎসাহে সে ঘরের চারিদিকে চোখ বুলালো। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও সে ফিরে এল। টেবিলের উপরে রাখা চিঠি তিনখানা যেন তাকে পিছু ডাকছে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে উল্লসিত মনকে আরো বেশী উৎসাহিত করার জন্যই যেন চিঠিগুলো সে আবার পড়ল।

অঞ্জলির বিয়ে হয়ে গেছে বহুদিন আগে। সে যোরহাট থেকে লিখেছ ঃ

"চির আরাধ্য প্রিয়তম মোর,

তোমাকে যে আজও আমি ভুলতে পারি নি, সে কথা কেন জানি না আজও তুমি বিশ্বাস করলে না। তুমি হয়তো ভাব যে বিয়ে-থা করে আজ আমি সুখী। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমার সবচাইতে নিবিড় জীবনের তৃপ্তির মুহূর্তগুলি এখনও তোমার অভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তোমার টানা টানা কালো ভুরুর মধ্যে জেগে থাকা সুন্দর চোখ দুটো এখনও কালো সন্ধ্যার মেঘের বুকে আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। রাতের ভারাক্রান্ত বাতাসে রজনীগন্ধার যে সৌরভ ভেসে আসে, তার মধ্যে এখনও আমি তোমার কণ্ঠের অপূর্ব সুরমাধুরী শুনি, আর রাতের জ্যোৎস্না এখনও আমার অতৃপ্ত দেহে তোমার অঙ্গের শীতল স্পর্শ দিয়ে যায়।

কিন্তু তুমি শিলং-এ এমন কি শিকড় গেড়ে বসলে যে আমি এত করে লেখা সত্ত্বেও একবারও এখানে আসতে পারলে না? বিয়ে-থা না করা সত্ত্বেও তোমাকে

যেভাবে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হয়, বিয়ে করে ফেললে বোধহয় আমি অনশন সত্যাগ্রহ করে মরে গেলেও তুমি ফিরে তাকাবে না। তোমার জন্যে সাদা উলের সোয়েটার বুনছি, গলার দিকটা একটু বাকী আছে।"

আরতির বিয়ে আসন্ন। সে আজকের ডাকেই নগাঁও থেকে জয়ন্তকে লিখেছে ঃ

"প্রাণের দেবতা আমার,

যা ভেবেছিলাম তাই হলো। শেষে আপনিও আমাকে পরিত্যাগ করলেন। এত সরল ভাবে আপনাকে বিশ্বাস করে জীবনের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম বলেই বোধহয় আপনি আমাকে এত সহজে উপেক্ষা করে যেতে পারলেন। আমি সব অকপটে আপনার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতাম বলেই বোধহয় আপনি আমাকে দুদিনের সুখের সামগ্রী বলে ধরে নিয়ে, প্রয়োজন ফুরালে পথের ধুলায় পড়ে থাকা বাসি ফুলের মতো পা দিয়ে দলে যেতে পারলেন।

যাক, যা হয়ে গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না। অকারণে তা মনে করিয়ে দিয়ে আপনার সুখের মুহূর্তগুলোকে বিষাক্ত করে তুলতে চাই না। ভাববেন না আপনার বর্তমান জীবনধারার কিছুই আমি জানি না। আপনি ভাগ্যবান, নিজের জীবনের সুখের পথ বেছে নিয়েছেন। আমি দুর্ভাগা, সে সুখ আমি পাব কোথায়? কিন্তু তবু আমি আমার পথ খুঁজে নিয়েছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মা বাবা শত নির্যাতন চালিয়েও আমার উপর তাদের ইচ্ছা কখনও চাপাতে পারতেন না। আমি তো আর ক খ না জানা অশিক্ষিতা গাঁয়ের মেয়ে নই।

হতে পারে আমার পথ সম্পূর্ণ ভুল। কিছুটা কণ্টকাকীর্ণ তো বটেই। হতে পারে সে জন্য ভগবানের দরবারে আমি পাপী বলে চিহ্নিত হব, কিন্তু সে পাপের ভাগ আপনাকে কি একটুও স্পর্শ করবে না?"

একটু অস্বাভাবিক হলেও অবিবাহিতা জমিদার দুহিতা বন্দনা আজ বেলা দুটোর সময়ে নংথোমাই থেকে চাপরাসিকে দিয়ে জয়ন্তর কাছে লিখে পাঠিয়েছে।

"প্রিয় প্রফেসার বরুয়া,

বড় সুন্দর বর্ষার দিনটি, নয় কি? বাঙালী হলে হয়তো রবিঠাকুরের ভাষায় বলতে পারতাম,

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।
সেকথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন বারিধার।
দুজন মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী

আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।
সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

কিন্তু আজকাল হচ্ছে উৎকট সংরক্ষণের দিন, বাঙলা কবিতা উদ্ধৃত করছি জানলে কেউ হয়তো বা পৈতৃক প্রাণটাতেই হাত দিতে পারে।

যাই হোক, আপনি তো একজন কাব্যিক মানুষ। কথায় কথায় আপনাকে কাব্য আবৃত্তি করতে শুনি। আপনি বলুন তো, গুয়াহাটি-শিলং রোডে যে কমার্শিয়েল কোম্পানী বাস চালায়, তার মনোপলির মতো আমাদের অসমীয়া কবিরাও ব্রহ্মপুত্র নদী আর বসন্ত ঋতুর উপর মনোপলি পেয়েছে নাকি? নইলে আমাদের সাধারণ অসমীয়া মানুষের মতো অসমীয়া কবিদেরও কাব্যিক অনুভূতির পরিধিটি এত ছোট কেন? নইলে কী অসমীয়া কবিতা, কী গান সবকিছুতেই সেই লুইতের (ব্রহ্মপুত্র নদ) পার, লুইতের বালি, লুইতের ঢেউয়ের উপর টলমল করা সেই নৌকাখানি! যেন আমরা অসমীয়া সমস্ত মানুষ কেবল লুইতের উপর নৌকা ভাসিয়ে দিন কাটাই। ঠিক তেমনি কী কবিতা, কী গান, আমাদের সবকিছুতে কেবল কোকিল, কেতকী আর মলয়ের আনাগোনা। যেন আমাদের দেশে বসন্ত ছাড়া অন্য কোনো ঋতু ভুলেও একবার উঁকি মেরে যায় না। কেন? আসামের বর্ষা তো দেখছি ধীরে ধীরে জগতের একটা বড় রকমের প্রসিদ্ধ বস্তু হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর বৃষ্টির সময়ে আমাদের এখানে ফ্লাড রিলিফ নিয়ে কি রকম হুলস্থূল হয়! তবু দেখুন অসমীয়া কবিরা বর্ষার উপর একটা প্রাণস্পর্শী কবিতাও লিখতে পারলেন না। সেই মৈথিলী কবির বর্ষা বিষয়ক পংক্তি দুটি,

'এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।'

বাস্তবিক কী অপূর্ব মর্মস্পর্শী! সত্যিই এমন দিনে মনটা বড় উদাস লাগে না? আমি তাই বার বার ভাবছি, এমনি একটি মন কেমন-করা দিনে আপনার মতো কবি প্রকৃতির একজন মানুষ কলেজের কাঠখোট্টা ছেলেদের সামনে (কটন কলেজ হলেও কথা ছিল) কেমন করে শুকনো রাজনীতির বক্তৃতা দিচ্ছেন।

বাবা আজ বাড়ি নেই। হাঠাৎ জরুরী তার পেয়ে ধুবড়ী গেছেন। মা আজ আসাম ক্লাবে ফ্লাড রিলিফের থিয়েটার দেখতে যাবেন। নীলিও মার সঙ্গে যাবে বলেছে। মাথার অসহ্য ব্যথা বলে ফাঁকি দিয়ে আজ কলেজ যাই নি। একটু আগে

রেডিওটা খুলে ক্যাসানোভার স্প্যানিশ অর্কেস্ট্রার বাজনা শুনে শুনে এক কাপ গরম চা খেয়ে নিলাম। এখন চিমনিটা জ্বালিয়ে আপনার এনে দেওয়া সেইণ্ট মানডে'র 'ওয়ার, ওয়াইন এণ্ড উইমেন'-খানা নিয়ে বসেছি।

আপনি ক্লাস শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসবেন যেন। নইলে আজ সন্ধ্যায় বড় একা লাগবে। চিমনির কয়লার উপর আপনার জন্যে চায়ের জল এখনি আমি চাপিয়ে দিয়েছি। ক্লাস শেষ করেই আপনি চলে আসবেন যেন, আমার দিব্যি রইল।"

তিনখানা চিঠি একশ্বাসে পড়ে আগের মতোই টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে জয়ন্ত বিপুল উদ্দীপনায় ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেলল। আর সেই একই উচ্ছ্বাসে যেন এক মিনিট সময়েরও অপচয় না হয়, তেমনি ব্যস্ততায় রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে পুলকের, আনন্দের, আগ্রহের একটা দীর্ঘ যাত্রায় সামিল হল।

বর্ষার জল রাস্তাঘাটকে পরিচ্ছন্ন করেছে। দুপাশের গাছগাছালি গোটা দিন ধরে গা ধুয়ে ধুয়ে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে, ফুল ফল আর ঘরের সাদা টিনের চালগুলোও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অস্তরবির মধুর আভা সব কিছুর উপর একটা করুণ আস্তরণ বিছিয়েছে। হালকা মেঘ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আর দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চঞ্চল উত্তেজনা জাগিয়ে তুলছে। আর সকলের উপর বিরাজ করছে রাস্তার ভিজে মাটি থেকে উঠে আসা উগ্র মাদকতাভরা সেই আদিম গন্ধ।

প্রকৃতির এই বিচিত্র এবং উত্তেজনাপূর্ণ আস্বাদে জয়ন্তর উল্লসিত লঘু মনটি আরো বেশি লঘু হয়ে যেন উড়তে থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন জীবনের ফেলে আসা এক-একটি বছরের জড়তা ঝরে পড়ছে। ছেলেবেলার দায়িত্বহীন দিনগুলোতে ফিরে যেতে জয়ন্তর একটা দারুণ ইচ্ছা হল। আর সেই অদম্য ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের মনে হল সে যেন সত্যিই অবুঝ শৈশবে ফিরে গেছে। শিশুর মতোই সে উল্লসিত হ্রস্ব পদক্ষেপে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল।

মনের এই অভূতপূর্ব উত্তেজনায় কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পরই হঠাৎ জীবনের একটি নূতন সত্য উপলব্ধি করার উত্তেজনায় জয়ন্ত একটু যেন অস্থির হয়ে পড়ল। বারবার তার মনে হতে লাগল, বহুদিন আগে পাঠ্যপুস্তকে পড়া ফরাসী মনীষী রুশোর মানুষের দাসত্ব সম্পর্কিত গভীর তত্ত্বের যে কথাগুলো এখনও সে ভাল করে না বুঝেই ক্লাসে পড়িয়ে থাকে, আজকেই যেন তার প্রকৃত উপলব্ধি তার মনে সঞ্চারিত হয়েছে।

মানুষের অতীতের হারিয়ে যাওয়া নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কথা যতই সে চিন্তা করতে লাগল, আজকের মানুষের চারপাশে গড়ে ওঠা বাধার প্রাচীরগুলোর বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহের স্পৃহা ততই তার মনে প্রবল হয়ে উঠল। সে তার প্রতিটি

পদক্ষেপে সেই সমস্ত অহেতুক বাধার প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে চাইল, মানব সভ্যতার প্রথম প্রভাতের মানবশিশুর যুগে সে ফিরে যেতে চায়।

মনের ভিতরের সেই অবৈধ চিন্তা আর উত্তেজনার সঙ্গে তার পদক্ষেপগুলোও অদ্ভুত রকমের ক্ষিপ্র এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল। আর সেই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় তার মনের ভেতরের আবরণটি উন্মোচিত হয়ে গেল, আর ফেলে আসা অতীতের জীবন-নাটকের পৃষ্ঠাগুলো একে একে চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

প্রথমে মনে পড়ল অঞ্জলির কথা।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে কৈশোরের অবোধ্য প্রাণের আকর্ষণ যখন খেলার সঙ্গিনী খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখনই সে অঞ্জলিকে পেয়েছিল। বহু তৃপ্তির মুহূর্তের সে অংশীদার। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মেই যৌবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক উগ্র এবং অবাধ্য প্রণয়ে পরিণত হয়েছিল। সমাজের চিরাচরিত স্থবির জীর্ণ পদ্ধতির মানদণ্ডে সেই প্রণয় রীতিসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়নি। কেন না অঞ্জলি ছিল সাত্বিক রাজগুরু ফুকন বংশের ব্রাহ্মণ কন্যা, আর জয়ন্ত ছিল একজন সাধারণ কলিতার সন্তান। সমাজের সকল হিংসুটে, নির্মম আর ক্রূর শক্তিগুলি জোট বেঁধে জয়ন্ত আর অঞ্জলির মিলনের পথে সেদিন বাধা সৃষ্টি করেছিল, আর তারই অস্বাভাবিক ফল হিসাবে অঞ্জলি আজ এমন একজনের গৃহিনী, যার সঙ্গে তার প্রাণের কোনো সজীব সম্পর্ক নেই। তিনটি ছেলে মেয়ের যত্ন-আত্যিতে অবহেলা দেখিয়ে সে তাই আজও জয়ন্তের জন্য নূতন বুননের সাদা উলের সোয়েটার বুনে চলেছে।

জীবনে আজ এই সর্বপ্রথম জয়ন্তের মনে অঞ্জলির সেই প্রতারিত, নিঃসহায় মূঢ় স্বামীটির জন্য সহানুভূতির সমুদ্র উথলে উঠল। একটা নূতন যুক্তির আলোকে এই প্রথম সে অনুভব করল সেই নিরপরাধ অজ্ঞ মানুষটির প্রতি এমনি নিষ্ঠুর প্রতরণা করে অঞ্জলি সত্যিই বড় অন্যায় কাজ করেছে, আর এই অন্যায়ের সমর্থনে অঞ্জলির পক্ষে তেমন কোনো বড় যুক্তি নেই।

কেন না, জীবনের সমস্ত আকর্ষণ জলাঞ্জলি দিয়ে অঞ্জলিকে গ্রহণ করতে জয়ন্ত সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। অঞ্জলি জয়ন্তর এই একনিষ্ঠতার কথা জানত, কিন্তু নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতা বশতঃ পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের স্নেহ আর আশ্রয় বিসর্জন দিয়ে বিপদসঙ্কুল, অখ্যাত অগৌরবের একটা জীবন বরণ করে নিতে সে সাহস পায়নি। আর অঞ্জলির সেই দুর্বলতার কারণেই তাদের দুজনের জীবন দুটো বিস্ময়। দুরন্ত একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী।

যতই জয়ন্ত অঞ্জলির এই দুর্বলতার কথা ভাবতে লাগল, ততই জীবনে এই প্রথম, অঞ্জলির প্রতি একটা ক্রোধের দাহ তার মনে সঞ্চারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটিও প্রতিভাত হল যে অঞ্জলির মতো দুর্বল প্রকৃতির মেয়েদের জন্যই

পৃথিবীতে পুরুষদের জীবন এত কষ্টকর আর বিষাদময় হয়ে ওঠে। তাদের প্রণয়ে যথেষ্ট একনিষ্ঠতা থাকে সত্যি, সারা জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর করেও শেষদিন পর্যন্ত প্রথম প্রিয়জনকে তারা ভুলতে পারে না সত্য, তবুও তারা প্রকৃতিদত্ত কি একটা দুর্বোধ্য দুর্বলতার জন্য সমাজ এবং সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যৌবনের প্রথমে বিদ্রোহের একটা উদ্দাম জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হয় না। এই ধরনের দুর্বল নারীর সংখ্যা বেশি হওয়ার দরুনই পৃথিবীতে অতৃপ্ত প্রণয় ঘটিত দুর্বহ জীবনের সংখ্যাও এত বেশি।

অঞ্জলির চরিত্রটি যতই জয়ন্ত বিশ্লেষণ করতে লাগল, ততই তার প্রতি ক্রোধের উত্তাপও ধাপে ধাপে বাড়তে থাকল। সেই অপ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে মনকে সরিয়ে আনার জন্য সে আরতির কথা ভাবতে শুরু করল।

আরতি উচ্চশিক্ষাভিমানী, বি. এ. পাশ, শহরের উঁচু ধাপের হাকিমের বাড়ির মেয়ে। সে জয়ন্তর কলেজ-জীবনের চার বছরের সহপাঠিনী, বন্ধু এবং সঙ্গী। জয়ন্তর দিক দিয়ে কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না, তবুও নানা ঘটনাচক্রে এই চার বছরে জয়ন্তর জীবনের সঙ্গে আরতি বড় নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই ঘনিষ্ঠতার দাবীতে আরতি আজও দূর থেকে জয়ন্তকে আরো কাছে টানতে অহরহ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ভাবনার শুরুতেই জয়ন্ত ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়ল, আরতির প্রতিও একটা তীব্র অশ্রদ্ধায় তার মনটা ভরে গেল। সে আগেও ভেবেছে, এখনও ঘোর বিতৃষ্ণাভরে মনে হল যে আরতির প্রণয়ে অঞ্জলির মতো সরলতা এবং নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠা নেই। বরঞ্চ রয়েছে একটা হীন স্বার্থপর জঘন্য মনোবৃত্তি। জয়ন্তকে না পেলে জীবন একেবারে মরুভূমি হয়ে যাবে বলে আরতি জয়ন্তকে কামনা করেনি। আরতি জয়ন্তকে চাইছে এই কারণে যে জয়ন্তর দশ জনের চোখে পড়ার মতো সৌন্দর্য রয়েছে। সম্মানজনক উচ্চ পদবী রয়েছে এবং সাংসারিক সুখসাচ্ছন্দ্য প্রদানের আর্থিক ভবিষ্যৎ রয়েছে। আরতি সেই ধরনের তরল অভিজাত ঘরের মেয়ে যারা প্রেমের ব্যাপারেও তুচ্ছ ব্যাক্তিগত লাভালাভের কথা মনে রাখে। জীবনের জাগ্রত প্রহরেও এরা অবলীলায় এই স্বপ্ন দেখে তার ভাবী স্বামী একই সঙ্গে সৌন্দর্যে রবার্ট টেইলর, পদমর্যদায় আই. সি. এস. এবং আর্থিক সচ্ছলতায় রকফেলারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে। কথায় কথায় এরা দান্দে বিয়াত্রিরের জ্বলন্ত প্রেমের উদাহরণ দেয়। স্থানে অস্থানে বাইরন, শেলী আর ব্রাউন-এর জটিল মনস্তত্ত্বের কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। কিন্তু বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদের বুকে আত্মবিস্মৃতির নিবিড়তম তৃপ্তির মুহূর্তেও এরা অন্ততঃ একজন এ.সি.এস. আধুনিক কেতায় সাজানো একটি ড্রইংরুম আর অন্য কিছু না হলেও 'ভি-এইট' একখানার স্বপ্ন ভুলতে পারে না।

যত বেশি করে আরতির কথা ভাবতে লাগল, ততই জয়ন্তের মনের ভেতরটা

বিরক্তিতে তেতো হয়ে উঠতে লাগল। সেই বিরক্তি থেকে মনকে সরিয়ে আনতে সে এবারে বন্দনার কথা ভাবতে বসল।

বন্দনা?...

বন্দনাও অতীতের আভিজাত্যওয়ালা জমিদার বংশের মেয়ে। অতিমাত্রায় বিলাসবহুল অস্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে সে মানুষ হয়েছে। দেহে যদিও পর্যাপ্ত অভিজাত রক্ত বইছে, তবুও বন্দনা কিন্তু নিজের আবেষ্টনীর সঙ্গে কোনো প্রাণের সম্পর্ক অনুভব করে না। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। নিজ সমাজের আরো দশজন মেয়ের মতো শুধুমাত্র ক্লাব, ঘোড়দৌড়, গল্‌ফ্‌, পিকনিক, মোটরিং, মার্কেটিং করেই সে তার সময়টুকু কাটিয়ে দেয় না। কিংবা ইরেজ গভর্নেসের তত্ত্বাবধানে 'বল' বা 'এটিকেট' শিক্ষায়ই তার সমস্ত শক্তির অপব্যয় হতে সে দেয় না। বন্দনার তাই নিজস্ব একটি প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, রয়েছে প্রগাঢ় অনুভূতির একটি জীবন। ভালবাসা বলতে কি বোঝায়, বন্দনা তা প্রাণ দিয়ে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আর সেই উপলব্ধির মাধুর্য বাড়ানোর জন্য সর্বদাই তার সঙ্গে সে একটি অবাস্তব আদর্শবাদের উপাদান যোগ করে দেয়।

বিংশ শতাব্দীর উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যেও বন্দনার ভাবনা চিন্তা একটু অদ্ভুত। জয়ন্ত যেন সত্যিই সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে আসা পক্ষীরাজ ঘোড়ার সওয়ার রূপকথার এক রাজপুত্র। আর সে যেন কোন এক দৈত্যের দুর্গপ্রাকারে বন্দী হয়ে থাকা অচেতন এক রাজকন্যা। জয়ন্ত যেন সত্যিই রূপকথার রাজপুত্রের মতো সোনার কাঠির স্পর্শে তাকে জাগিয়ে তুলবে। তারপর রূপকথার মতোই তাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের সেই অদ্ভুত নূতন দেশে নিয়ে যাবে।

বন্দনার চরিত্রের এই বৈশিষ্টগুলোর জন্যও কিছু দিন হল জয়ন্ত বন্দনার প্রতি অস্বাভাবিক এক দুর্বলতা বোধ করছে। এই দুর্বলতার বন্ধনে পড়ে আজকাল সে বেশীর ভাগ সন্ধ্যাই বন্দনার ড্রইংরুমে কাটায়। তাতে অবশ্য বন্দনার মা বাবারও সম্মিলিত আগ্রহ থাকে।

কিন্তু আজ?

এই অপূর্ব সুন্দর, উদাসী, উল্লাসের সন্ধ্যা? এই প্রকৃতির আদিম ভয়ংকর উত্তেজনা? ধমনীর প্রতি রক্তবিন্দুকে উদভ্রান্ত করে দেওয়া বেশি নূতন, বেশি তীব্র, বেশি বিপুল অভিজ্ঞতার জন্য এই দুরন্ত লিপ্সা?

জয়ন্ত আজ বন্দনাকেও একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে কুণ্ঠাবোধ করল না। সেই যুক্তির নূতন আলোকে যতই সে বন্দনার কথা ভাবতে লাগল, ততই তার মনে হতে লাগল বন্দনার ড্রইংরুমের সমগ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে কি যেন একটা বিষাক্ত বিরাট কিন্তু প্রাণহীন অবাস্তবতা লুকিয়ে আছে।

সেই উচু উচু স্প্রিং দেওয়া দাম্ভিক আরামকেদারাগুলো! সেই রংবেরং-এর শেড দিয়ে ঢাকা ম্লান বিজলী বাতিগুলো! সেই পরম অভিজাত্যময় মেঝেতে পাতা কাশ্মিরী গালিচাটি। সেই সুদৃশ্য ফ্লাওয়ার-ভাসে রাখা ক্রিসেনথিমাম, এসটটি আর ডালিয়া ফুলগুলো! এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা বাঘ, ভালুক আর হরিণের বীভৎস মুণ্ডু আর ট্যান করা চামড়াগুলো! সেই মগজকে বিধ্বস্ত করে অক্লান্ত-ভাবে বেজে চলা কোলাহলমুখর ফিলিপ্‌স্‌ রেডিওটি! সেই ঘরের চার পাশে বিচরণশীল চাপরাশ আর উর্দিধারী মূর্খ আর অকর্মন্য চাকর বেয়ারাগুলো! বন্দনার পিছু পিছু হাজির বিভীষিকাময় সেই প্রকাণ্ড এলশেসিয়ান কুকুরটি!

যতই এই কৃত্রিম পরিবেশের কথা ভাবে, জয়ন্তের মনে ততই একটা প্রবল বিতৃষ্ণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এবং সেই বিতৃষ্ণা থেকে ধীরে ধীরে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে বন্দনাদের ড্রইংরুমের মতো একটা নিষ্প্রাণ, বন্ধ্যা, নীরস পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে আরামকেদারায় অর্ধসুপ্ত অর্ধজাগ্রত অবস্থায় কলরবমুখর জীবনের মাধুর্যমণ্ডিত সঙ্গীতের শুধু মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় নির্ভর আস্বাদনই সম্ভব। টেনিসনের কবিতার লোটাস ইটার্সদের মতো। সেখানে বসে আজকের মতো উদ্দীপনাময় একটি সন্ধ্যাকে, জীবনের কোনো তীব্র অনুভূতিকে প্রাণের অপরিসীম আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

প্রতিটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তর মনে সেই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়মূল হতে লাগল, আর তারই প্রতিক্রিয়ায় বন্দনার ড্রইংরুমের অভিমুখী তার ক্ষিপ্র পদক্ষেপগুলো ক্রমেই শ্লথগতি হয়ে পড়ল। আর অকস্মাৎ সেই আড়ষ্টতায় বন্দী হয়ে রাস্তার মধ্যেই দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মতো সে একেবারে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে গেল। বন্দনার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, তার আন্তরিক চায়ের নিমন্ত্রণের আকর্ষণ, মা বাবার অনুপস্থিতির সুযোগের আকর্ষণ, চিঠির সেই প্রলোভনপূর্ণ ইঙ্গিতের আকর্ষণ সমস্ত মিলেও জয়ন্তকে আর বন্দনার বাড়ির দিকে গতিশীল করে তুলতে পারল না।

ধানখেতি পার হয়ে মালকির সেই ছোট পাহাড়টি। তার উপরে নূতন করে গড়ে ওঠা ছোট্ট অসমীয়া বসতিটি। তারমধ্যে ফুলের বাগানে ঘেরা 'ই' প্যাটার্নের সুন্দর বাংলো-বাড়িটি।

সম্পূর্ণ অনিশ্চিত গতিতে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে অকস্মাৎ সামনে এই বাড়িটি দেখে আচমকা একটি অতি পরিচিত বস্তুকে আবিষ্কার করার মতোই স্বস্তির আনন্দে জয়ন্তর মন ভরপূর হয়ে গেল। অল্প আগেই তার যে পা সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে পড়েছিল, তা আবার সচল হয়ে উঠল। সে বাড়িটির দিকে নূতন উদ্দীপনায় এগিয়ে যেতে লাগল।

হেমন্ত জয়ন্তর বহুদিনের বন্ধু আর সহপাঠী। তার বোন চিত্রা। অতি জটিল চরিত্রের অদ্ভুত একটি মেয়ে।

চিত্রা হচ্ছে সে ধরনের মেয়ে যারা বুকের ভেতরে প্রবল আবেগ টগবগ করে ফুটলেও মুখের অভিব্যক্তিতে তা পারতপক্ষে ফুটিয়ে তুলতে চায় না। আবেগের এধরনের প্রকাশকে তারা একটা বড় রকমের দোষাবহ দুর্বলতা বলে মনে করে। কলেজে যাওয়ার আগে চিত্রা অন্তত দুঘণ্টা প্রসাধন টেবিলের সামনে কাটায়। সম্ভব হলে প্রতি ঘণ্টায়ই সে রং মিলিয়ে কাপড় পাল্টায়। হাঁটার সময়ে তার পা মাটিতে অতি মেপেঝুখে পড়ে। রাস্তায় কেউ তাকে লক্ষ্য করছে দেখলে আত্মপ্রসাদের মৃদু হাসিটি সে গোপন করে না। আবার সে বিষয়ে কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে তবে সে প্রবল প্রতিবাদ করে বলে যে পোশাক-আশাকের ব্যাপারে সে সত্যিই বড় অমনোযোগী। আর চিত্রার মতে এব্যাপারে বেশি মনোযোগী হওয়াও অনুচিত।

অন্যের না হলেও, জয়ন্তর সান্নিধ্য চিত্রা খুব উপভোগ করে বলেই মনে হয়। এক দুদিন না গেলে দশ দিন অভিমানে কথা বলে না। আর গেলে পরে সর্বদা এটা ওটা বুঝবে বলে নিজের পড়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টা আটকে রাখবে। কোন পোশাকে জয়ন্তকে বেশি মানায়, সে সম্পর্কে উপযাচক হয়ে সে মতামত দেবে। আর নিজের সম্পর্কেও জয়ন্তর মতামত কৌশলে সে জেনে নেবে। জয়ন্তর সঙ্গে মাঝেমধ্যে তারা সপরিবারে সিনেমা দেখতে যায়, তখন চিত্রার লক্ষ্য থাকে মা বৌদিকে এড়িয়ে কি ভাবে জয়ন্তের পাশে বসা যায়। আর ছবিতে কোনো উত্তেজক দৃশ্য থাকলে অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে একটুক্ষণের জন্য জয়ন্তর চোখে চোখ রাখবে, তার পরই লজ্জয় মাথা নামাবে। জয়ন্ত না চাইলেও তাকে নিয়ে গলফ্-লিঙ্কে জ্যোৎস্না দেখতে যাবে, আর জ্যোৎস্না মিলিয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ জয়ন্তের গায়ে গা ঠেকিয়ে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে, তার-পর মাথা ধরেছে বলে মাথাটি জয়ন্তের কোলে ফেলে রাখবে।

আবার জয়ন্ত যদি অযাচিত হয়ে কোনো উচ্ছ্বাস দেখায়, চিত্রা তখন প্রচণ্ড বাধা দিয়ে একথাটাই বলবে যে কোনো পুরুষের প্রতিই তার কোনো আসক্তি নেই, আর সে ধরনের আসক্তি থাকাটাকে সে এক অমার্জনীয় দুর্বলতা বলে ভাবে।

সাধারণতঃ জয়ন্ত এগুলো কোনো প্রতিবাদ না করেই সহ্য করে, তবে প্রতিবাদের লিপ্সাটা হঠাৎ তার দুরন্ত হয়ে উঠল। একদিন চিত্রার এধরনের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মম কুটিল একটি হাসি ফুটিয়ে সে রূঢ়ভাবে বলে ফেলে যে একজনের প্রতি অপর জনের আন্তরিক আসক্তি থাকাটা দুর্বলতা কি না, তা সে জানে না; কিন্তু কারো প্রতি যদি সে ধরনের আসক্তি থাকে, তবে তাকে সর্বদা অস্বীকার করার চেষ্টাটাকেই সে একটা বড় রকমের দুর্বলতা বলে মনে করে।

হঠাৎ জয়ন্তের এই নির্মম অথচ প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখে পড়ে চিত্রার অবস্থা হল কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো। লজ্জা, অপমান আর ক্রোধের প্রচণ্ড উত্তাপ কোনো

ক্রমে সামলে নিয়ে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল। সে জানিয়ে দিল যে সত্যিই কোনো পুরুষের প্রতি তার অন্তরের আসক্তি নেই। আজ জয়ন্ত যদি ভেবে থাকে যে সে-ই তার আসক্তির পাত্র, তবে প্রচণ্ড ভুল করেছে। কথাগুলি বলেই দুঃখে, অসহায়তায় আর রাগে চিত্রা কাঁপতে থাকে। কম্পিত সেই দেহলতাখানি দেখে জয়ন্তের প্রাণে হঠাৎ একটি দুর্দম বেদনা উথলে উঠল। অতি সৎ অভিপ্রায়ে সে চিত্রার একান্ত কাছে এগিয়ে গেল, তারপর অতি সহজ ভাবে তাকে বুকে টেনে নিল। প্রগাঢ় স্নেহের মাধুর্য মিশিয়ে চিত্রাকে বোঝায় যে জীবনকে প্রকৃত জীবন হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই। বরঞ্চ তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেই নানা দুর্বলতা এসে ঢুকে পড়ে।

কিন্তু জয়ন্তর সমস্ত শুভ প্রচেষ্টার উত্তরে চিত্রার প্রতিক্রিয়া হল সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনের প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে চিত্রা রাজী নয়। পরাজয়ের মর্মদাহে সে আরো প্রচণ্ড অধৈর্য উন্মাদনায় জয়ন্তের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে। আর সমস্ত সংযম হারিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে বলে যে জয়ন্তের আচরণ অতিশয় ঘৃণ্য। সে জয়ন্তকে ভালবাসে না, বরঞ্চ ঘৃণ্য করে।

জয়ন্ত বুঝল যে এরপর আর কোনো কথা বা কাজই সমীচীন হবে না। চিত্রার বিকৃত মুখের দিকে সে করুণার দৃষ্টি নিয়ে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। তার-পর মুখে কোনো কথা না বলে এক পা দু'পা করে ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে। চিত্রা নিজেকে নিজেই সুস্থ করে তুলুক, সে সুযোগ তাকে দেওয়া প্রয়োজন।

সেই যে চলে আসা, তারপর প্রায় দু'মাস হতে চলল, ভুলেও সে আর চিত্রাদের বাড়ির দিকে যায়নি। এ রাস্তা দিয়েই সে নিত্য বন্দনার বাড়ি গেছে, কিন্তু ইচ্ছা করেই চিত্রাদের বাড়ির দিকে তাকায় নি। এ দু'মাস সে শুধু বন্দনার ওখানেই গেছে। তাকে নিয়ে বেড়িয়েছে আর তখন হঠাৎ চিত্রার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেলে না দেখার ভান করে এড়িয়ে গেছে। জয়ন্ত ভাল করেই জানে যে চিত্রার মতো মেয়ে শুধু ঈর্ষায়ই জব্দ হতে পারে, অন্য কিছুতে নয়। আর বন্দনার প্রতি চিত্রার ঈর্ষার কথা সবাই জানে। চিত্রা জীবনের সব কিছুতেই শুধু বন্দনার সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে চায়। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখনই হেরে যাওয়ার উপক্রম হয় তখনই চিত্রা বলে যে বন্দনা মেয়েটি এরিস্টোক্রেসির একটা পার্ফেক্ট টাইপ—পুরোদস্তুর—স্নব হোপলেস ফ্লার্ট।

পুরো দু'মাস পর মনের এই অস্থির উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ চিত্রাদের বাড়িটা দেখে জয়ন্তের মনে জয়ের লালসা বড় তীব্র হয়ে উঠল। একটা বড় রকমের পরীক্ষায় নেমেছিল। এতদিন পর তার ফল জানার কৌতূহলে অনিবার্য ভাবেই তার পা দু'খানা সেই বাড়িটির দিকে চলতে শুরু করল।

সমান উৎসাহে সে মালকির পাহাড়টি ভেঙ্গে উঠল। বাইরে থেকে দেখলে

মনে হয় বাড়িতে সাড়া দেওয়ার মতো জনপ্রাণী কেউ নেই। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। তাতে টোকা দিতে দিতে জয়ন্ত বিপুল উচ্ছ্বাসে ডাকল, হেমন্ত! হেমন্ত! হেমন্ত!

জয়ন্তের কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ ধরে ঝংকৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত বাইরের বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু বাড়ির ভেতরে সে স্বর পৌঁছেচে কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। একটুও নিরুৎসাহ না হয়ে জয়ন্ত আগ্রহভরে আবার ডাকল হেমন্ত! হেমন্ত! হেমন্ত!

একটু পরে বাড়ির ভেতর থেকে একজোড়া স্যাণ্ডেলের এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন এসে সুইচ টিপে পোর্টিকোর বাতিটা জ্বালাল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিত্রা দুয়ারখানা মেলে, উঁকি মেরে দেখে, মুখে একটু অদ্ভুত আগ্রহের হাসি ফুটিয়ে বলল, "অ। আপনি।"

বিনা নিমন্ত্রণেই জয়ন্ত তার উচ্ছ্বাসে উপচে পড়া দেহটি ভাল করে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। চিত্রার দিকে চোখ রেখে প্রাণস্পর্শী একটা হাসি মিশিয়ে বলল "হ্যা, আমিই, আমাকে ভূত ভেবে আঁৎকে ওঠোনি তো।"

জয়ন্তের সেই ক্ষণিক সাহচর্যেই চিত্রার উচ্ছ্বাসের মাত্রা যেন অনেক গুণ বেড়ে গেল। জয়ন্তের চোখে অস্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঘরের টেবিলের কোণায় ভর দিয়ে মোহিনী রূপে দাঁড়িয়ে, মুখের হাসিটিকে অতি মাত্রায় আবাহনপূর্ণ করে বলল, "আঁৎকে না উঠলেও একটু আশ্চর্য হয়েছি বৈকি। এই বর্ষার দিনে কাদা জলে পথঘাট যা নোংরা, ভাবছি এমনি কদর্য দিনে দু'মাস পর আজকে কি আপনাকে এদিকে টেনে আনল।"

জয়ন্ত আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। হাতের বর্ষাতি আর টুপিটি টেবিলে রেখে, পকেটের সুগন্ধি রুমাল বের করে অল্প ঘেমে যাওয়া কপালে দু'বার বুলিয়ে, চোখ আর মুখের হাসিটিকে প্রাণবন্ত করে বলল, "আশ্চর্য হলে কিছু করার নেই। এই কদর্য আবহাওয়াই আজ আমাকে তোমার কাছে টেনে এনেছে চিত্রা। তুমি হয়তো ঘরের মধ্যে বসে তাকে কুৎসিত বলতে পার। হয়তো যারা তোমার মতই এর আস্বাদ পায়নি, তারাও তাকে কুৎসিত বলতে পারে। কিন্তু আজ আমি এই আবহাওয়ার উন্মাদনায় সমস্ত সন্ধ্যাটা কস্তরী মৃগের মতো আপন গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে কোনো কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।"

জয়ন্তের কথার সুরে চিত্রার পুলকের মাত্রা যেন আরেকটু বেড়ে গেল। আর সেই পুলকের স্রোতে গা ভাসিয়েই যেন সে ঘরের আরেকটু ভেতরে ঢুকে গেল, তারপর ভেতরের দরজায় পর্দাটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মুখের হাসিটি আরো অসহনীয় সুন্দর করে বলল, "তা হলে অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি আজ অতি অসময়ে এই উচু পাহাড়টি ডিঙ্গিয়ে অকারণ কষ্ট সহ্য করে শান্তির

জন্য এখানে এসেছেন। অশান্তির যন্ত্রণার আমি নিজে যে কোথায় যাব তার ঠিক নেই। আজ এক সপ্তাহ হল দাদা বৌদিকে রেখে আসতে তেজপুর গেছে, তিন দিন হল মা ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী। আমি আপনার গলা শুনে এইমাত্র ডালের কড়াইটা নামিয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছি।

তার প্রায় পনেরো মিনিট পরের কথা।

ইতিমধ্যে চিত্রার মায়ের খবর নেওয়া হয়েছে। কাঞ্চীকে রান্নাঘর থেকে এনে বুড়ির মাথায় উইন্টোজেন ঘষতে বসানো হয়েছে। একই উৎসাহে জয়ন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রায় পঞ্চাশটির মতো দাওয়াই বাৎলে দিয়েছে। হাসি তামাসা ঠাট্টা কৌতুকের মধ্যে চিত্রার সঙ্গে যেন একটা নূতন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। জয়ন্ত রান্না ঘরে ঢুকে নিজেই কোত্থেকে একটা মোড়া যোগাড় করে এনে বসল, তারপর খুব আগ্রহ ভরে ঘরটির চারপাশ লক্ষ্য করতে লাগল। দুটো কয়লার বড় উনুন গন্‌গন্ করে জ্বলছে। নামানো দুটো পাত্রের একটিতে সেদ্ধ হওয়া ডাল, অপরটায় ভাত। তার কাছে খোলা একটা কাঁসার থালায় কিছু ভাজা পোনামাছের গাদা আর বেসন দিয়ে ভাজা বেগুন।

তার পায়ের কাছে একটা ঝুড়িতে বাঁধাকপির একটা কাটা ফালি, খোসাওয়ালা কাঁচা মটর, গোটা কয়েক আলু আর পেঁয়াজ। একটু দূরে শিল-নোড়া, এইমাত্র বাটনা বাটা হয়েছে, মিহি করে পেষা মশলা রয়েছে তাতে। চার দিকের এই অপরিচিত পরিমণ্ডলের দিকে জয়ন্ত একটা প্রকাশ্য অধীরতা নিয়ে বার বার তাকায়। ভাজা মাছ, ভাজা বেগুন, সেদ্ধ ডাল, পেষা মশলা, পোড়া কয়লা সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত পাঁচ মিশেলি গন্ধ। তার উত্তেজিত অনুভূতিগুলো সেই গন্ধে আদিম উন্মাদনায় আরো যেন উত্তাল হয়ে উঠল।

সেই উত্তেজনায়ই বোধহয় জয়ন্ত মোড়াখানা চিত্রার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। চিত্রা মনোযোগ দিয়ে সব্জি কাটছে। জয়ন্ত দু'টো মটর তুলে মুখে দিয়ে কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট কোমল করে জিজ্ঞেস করল, "চিত্রা, সেদিনের পর তুমি আজকে আমাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছো, না?"

প্রথমে চিত্রা এমন ভাব দেখালো যে জয়ন্তের কথা তার কানে যায়নি, সে সব্জি কেটেই চলল। কিন্তু বেশীক্ষণ তা চালিয়ে যেত পারল না। হঠাৎ জয়ন্তের চোখে চোখ পড়তে নিস্তেজ হেসে বলল, "আশ্চর্য হওয়ার কারণ যেখানে রয়েছে সেখানে একটু আশ্চর্য হয়েছি বৈকি।"

উৎসাহে জয়ন্ত মোড়া নিয়ে চিত্রার দিকে আরেকটু এগিয়ে যায়। আগের চাইতে বেশি তৃপ্তি সহকারে সে আরেক মুঠো মটরশুঁটি মুখে ফেলে, তারপর প্রস্ফুটিত হাসিতে উচ্ছল হয়ে বলে, "কিন্তু তুমি যদি ভাল করে ভেবে দেখো, দেখবে

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নানা করণে মানুষ কখনও কখনও একটা বড় দরের ভুল করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, সেই ভুলের জন্য ভ্রান্ত মানুষটিকে চিরদিন দূরে সরিয়ে না রেখে তাকে ভুলটি শোধরানোর সুযোগ দেওয়া উচিত।"

কাঁসার থালায় কোটানো বাঁধাকপি রেখে চিত্রা একপাশে সরিয়ে রাখে। হাতের কাছে এবারে গোটাকয় আলু এনে রাখে। তারপর জয়ন্তের চোখে চোখ রেখে অর্থপূর্ণ সূক্ষ্ম হাসি হেসে বলে, "কিন্তু আমি একাই সেদিন ভুল করেছিলাম, সে কথা আপনি ধরে নিলেন কি করে?"

চিত্রা আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে, জয়ন্ত হাত থেকে গোটাকয় মটর নামিয়ে রাখে, তারপর জবাব দেয়, "সেদিন তুমি একাই ভুল করেছিলে, এমন কথাতো আমি কখনও ভাবিনি চিত্রা। ভাবিনি এই কারণে যে ভুল একা তোমারো না, আমারও না, আমাদের দুজনেরই। সেদিনের প্রতিকূল অবস্থায়...।"

জয়ন্তের কথার ইঙ্গিতটি চিত্রা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল না। তবুও বোঝার ভান করে আবেগভরে জয়ন্তের চোখের দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। অল্প সময় এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত থেকে কোটা সব্জিগুলো সশব্দে কড়াই-এ চাপিয়ে দিল। তারপর একটু ঘনঘনই সেগুলোকে নাড়াতে নাড়াতে বলল, "কথার এই অদ্ভুত মোচড়গুলো আপনার একান্তই নিজস্ব বস্তু। এমনি শুনে প্রথমে মনে হয় বেশ বোঝা যাচ্ছে, পরে চিন্তা করে দেখি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

জয়ন্তের খুব মজা লাগল, আত্মপ্রসাদে মুখের মিষ্টি হাসিটি প্রলম্বিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধীরে হেঁটে উনুনের কাছাকাছি চিত্রার দিকে এগিয়ে যায়। সামনের বন্ধ জানালা খুলে দিয়ে দেখে বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের আয়োজন চলছে। সেদিকে তাকিয়ে একটু তন্ময়তার সুরে বলে, "শুধু কথা-ই নয় চিত্রা। কাজের অদ্ভুত মোচড়ও আমার একটা নিজস্ব বস্তু। তুমি যদি জানতে কার ব্যাকুল নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে এভাবে বিনা নিমন্ত্রণে উপযাচক হয়ে তোমার কাছে এসেছি, তাহলে হয়তো আমার প্রতি তোমার কৌতূহলের মাত্রাটা একটু বাড়ত।"

জয়ন্তের ইঙ্গিতটি চিত্রা সম্পূর্ণ বুঝল, কিন্তু না বোঝার ভান করল। প্রশ্নবোধক একটা ললিত ভঙ্গিতে কৌতুক নিয়ে জয়ন্তের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

সে দৃষ্টির আহ্বানই যেন জয়ন্তকে চিত্রার দিকে আরেকটু এগিয়ে আসতে দিল। উনুনের তাপে চিত্রার মুখখানি রাঙা, কপালের চুলগুলি অল্প এলোমেলো। তার দিকে বড় লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কণ্ঠে বিষাদ ফুটিয়ে বলল, "চিত্রা, যার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে আজ তোমার কাছে এসেছি, সে কখনও কড়ায়ের উপর রান্না চাপিয়ে আর কিছু আলু কপি দেখতে দিয়ে এভাবে আমাকে দাঁড় করিয়ে

রাখত না। হয়তো এই মুহূর্তে সে সোফাসেটে আমার গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসে রেডিওর আবহসঙ্গীতের সঙ্গে নিজে হাতে করা এক কাপ গরম কোকো আমার হাতে তুলে দিত।"

অন্তরের উথালপাথাল আবেগ নিয়ে চিত্রা কি বলবে ঠিক করতে পারল না। শুধু বার বার অতি তীব্রভাবে কড়ায়ের সব্জিগুলো নাড়তে লাগল। তারপর একটু হঠাৎই তার উপর কিছু জল ঢেলে দিয়ে একটা ঢাকনি চাপিয়ে দিল। ধীরে ধীরে হাত ধুলো, তারপর এক পা দু'পা করে জয়ন্ত অল্প আগে যে জানালাটা খুলে দিয়েছে, তার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝড়ে সরল গাছগুলো অসহায়ের মত কাঁপছে, বড় তৃপ্তির সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে প্রাণের আনন্দকে স্পষ্ট করে বলল, "তাইতো ভাবছি, আজ ভোরে কোন্ অশুভ বস্তুটি দেখে বিছানা থেকে মাটিতে পা দিয়েছিলেন। বন্দনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তবু কোথায় সেই আরামকেদারায় সাজানো ড্রইংরুম, ম্লান রক্তিম বিজলী বাতি, রেডিওর গান, আভিজাত্য আর আনন্দের আরো কত কি উপাদান। আর কোথায় এই ভাঙ্গা ছেঁড়া বাঁশ কাঠ, চাল ডাল, শাকপাতার স্তূপে নোংরা হয়ে থাকা এই রান্নাঘর। তুলনা করে আমার নিজরই বড় দুঃখ হচ্ছে।"

চিত্রার শ্লেষের উত্তর দেওয়ার ছলে জয়ন্ত চিত্রার একেবারে কাছে ঘেঁষে জানালার কাঠে ভর দিয়ে দাঁড়াল। আর বাইরে অন্ধকারের দিকে আকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা চিত্রার চোখ দুটোকে উপলব্ধি করার আপ্রাণ চেষ্টা করে বলল, "চিত্রা তাহলে তুমি আমার প্রাণের প্রচণ্ড ব্যাকুলতাকে একটুও বুঝতে পার নি। আজ যদি আমি বন্দনার ওখানে না গিয়ে থাকি, তবে তা কেবল ঐ আভিজাত্য-পূর্ণ ড্রইংরুমটির জন্যই—"

বাইরে প্রবল ঝড়, সে আবেগ জয়ন্তর মননেও সঞ্চারিত। চিত্রার মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট করার প্রবল প্রয়াসে আরো বেশি উত্তাপ কণ্ঠে ঢেলে সে বলে চলে, "চেয়ে দেখো আনন্দের এই বিপুল উন্মাদনা—ভরা ঝড়ের কালো আকাশ, বাতাসের অসহ্য তাড়নায় নুয়ে-পড়া গাছগুলোর কি অপরূপ শোভা। তাদের পাতার মধ্যে খেলে যাওয়া বাতাসে যেন গোটা প্রকৃতিই বেদনায় গুমরে মরছে। আমার দৃঢ় ধারণা যে বন্দনাদের ড্রইংরুমের মতো একটা নিষ্প্রাণ কৃত্রিম পরিবেশ এমন একটা উদ্দাম মধুময় পুলকের সন্ধ্যাও চরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করা সম্ভব নয়।" বন্দনার ড্রইংরুমের নিন্দা, বাইরে প্রকৃতির উন্মাদনা, জয়ন্তের কথার ভঙ্গি সমস্ত মিলিয়ে চিত্রার শরীরের অধৈর্যের মাত্রা উপচে উঠল। সে বাইরে বের করে রাখা মুখটি ভেতরে নিয়ে এল, জানালার কাঠে মাথাটি বিহ্বলের মতো ফেলে দিল, তার দৃষ্টি জয়ন্তের দিকে, মুখে ক্ষুধিত হাসি। কর্মক্লান্ত মুখে, ক্ষুধিত ভঙ্গি,

রুক্ষ চুলের মধ্যে বার বার বিদ্যুতের আলো এসে ঝলকে দিচ্ছে—চিত্রাকে অসহনীয় উত্তেজক সৌন্দর্যে ভরপুর দেখাচ্ছে।

জয়ন্ত যেন সেই উত্তেজনার ছোঁয়ায় নিমেষে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সঙ্কোচ সব ভুল গেল। চিত্রার শরীরের আরো কাছাকাছি নিজেকে নিয়ে গেল, গায়ে গা ঠেকাল। তার কপালের উপর অসংযত যে কটি চুল এসে পড়েছিল, সেগুলোকে স্নেহের স্পর্শে দূরে সরিয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, 'চিত্রা, সত্যিই আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

চিত্রা জয়ন্তের কথা বা কাজে কোনো বিরক্তি দেখালো না। বরঞ্চ তার বিহ্বলতা বেড়ে গেল। মাথাটা জানালায় চেপে একটা পরম তৃপ্তির হাসির সঙ্গে ঈর্ষা মিশিয়ে বলল, "বন্দনার কাছে গেলেও বোধহয় আপনি এ কথাই বলতেন।"

উচ্ছ্বাসে জয়ন্তের ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। নিজের অস্থির দেহটিকে চিত্রার দেহের উত্তাপের মধ্যে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে জানালায় ফেলে রাখা চিত্রার লোভনীয় মুখটিকে দু'হাতে তুলে ধরে কণ্ঠে প্রাণের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে বলল, "চিত্রা, আমাকে অকারণে জব্দ করার জন্য তুমি এই মিথ্যা কথাগুলো বলছ। তুমি জানো, আমি যদি আজ বন্দনার ওখানে যেতাম, তবে তোমাকে আজ যেভাবে সম্পূর্ণ নূতন একটা আবেষ্টনীতে এই অসাধারণ ভূমিকায় পেয়েছি, তেমন করে তাকে কখনও পেতাম না। তুমি বিশ্বাস করো, আগুনের তাপে রাঙানো তোমার ক্লান্ত মুখখানা, সামান্য ঘামে ভিজে থাকা তোমার কপালের এই ছোট্ট রুক্ষ চুলগুলি, তোমার নিরাভরণ মুক্ত উদার এই দেহখানিতে আজ আমি এক অপরূপ অসংযত রূপের উন্মাদনা খুঁজে পেয়েছি।"

জয়ন্তের কথার উত্তেজনার প্রবাহে তার দুহাতের মধ্যে ধরা চিত্রার মুখখানা অস্থির হয়ে উঠল। জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষা আর পরিপূর্ণ কামনার মিশ্রণে জ্বালাময় তীক্ষ্ণ একটা হাসি দিয়ে সে বলল, "নারীর রূপ বর্ণনায় আপনি যে সিদ্ধহস্ত, তা জানি। ভাল ভাল শব্দ বেছে নিয়ে পছন্দসই ভাবে বই মুখস্থের মতো অনর্গল বলে যেতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় এ কথাগুলো আপনি এর আগেও আরো বহু জায়গায় বলে এসেছেন।"

সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে জয়ন্ত চিত্রার মুখ আর দেহখানি আরো আকুলভাবে নিজের কাছে টেনে আনলে, তারপর প্রাণের সমস্ত আবেগ নিঃশেষ করে দিয়ে বলল, "চিত্রা, যদি বলি যে জীবনে এর আগে কোনোদিনই কোনো নারীর সামনে তার রূপের প্রশংসা করি নি, তবে তা প্রচণ্ড একটা প্রবঞ্চনা হবে। এ ধরনের প্রবঞ্চনা করার মতো কপটতা বা কাপুরুষতা আমার নেই। কিন্তু তুমি বোধহয় আমার এ কথাটি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারবে যে জীবনে আমি কোনোদিনই কোনো নারীকে শুধুমাত্র তোষামোদের জন্য অপ্রাপ্য বা অসত্য প্রশংসা করি নি।"

চিত্রার আত্মনির্ভর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। নিজের মুখটি জয়ন্তের বুকে রেখে তার কামিজের আড়ালে তা লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করে কণ্ঠস্বরকে আবেগ মধুর করে বলে ওঠে, "আপনার কথাগুলোতে সত্যিই কি যেন একটা অদ্ভুত মাদকতা রয়েছে। অবিশ্বাস করব বলে আগে থেকে হাজার চেষ্টা করলেও একবার শুনলে যেন তাকে আর অবিশ্বাস করতে মন চায় না।"

এরপর নিজেক লুব্ধ মনকে জয়ন্ত আর কিছুতেই সংযত রাখতে পারল না। চিত্রার তৃষিত দেহটি নিজের বুভুক্ষু বুকের আলিঙ্গনে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

জয়ন্তের দৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে নিজের দেহটিকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে একটা মধুর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন চিত্রা আবার সেই জানালাটাকে আশ্রয় করল। বহু দূরে আকাশে অস্থির হয়ে ঘুরে ফেরা ঝড়ো মেঘগুলোর দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে দেখে জয়ন্ত চিত্রাকে আরেকবার গভীর মমতায় আদর করে জিজ্ঞেস করল, "চিত্রা, হঠাৎ এই মেঘগুলো দেখে এমন ভাবুকের মতো চিন্তা করতে শুরু করে দিলে কেন?"

চিত্রা সরে গেল না, নড়বার কোনো লক্ষণও দেখালো না। কালো মেঘের মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিছুক্ষণ তার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসি টেনে বলল, "খুব বড় কথা কিছু ভাবিনি। ভাবছিলাম, সত্যিই আপনি কি? স্বয়ং ঈশ্বর না ভয়ঙ্কর কোনো অপদেবতা।"

জয়ন্ত ক্ষণিকের জন্য চিত্রার কাছ থেকে সরে গেল। তার প্রাণখোলা হাসিতে তৃপ্তির স্বাক্ষর। খুলে রাখা কোটটি খুঁজে এনে আবার পরে ফেলল। বেরিয়ে যাওয়ার একটা ব্যস্ত আয়োজন করে আবার সে হঠাৎ করে চিত্রার কাছে চলে এল। ক্লান্তিম্লান চিত্রার মুখের উপর থেকে চুলের গুচ্ছগুলিকে স্নেহভরে সরিয়ে দিতে. দিতে উল্লসিত বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল, "চিত্রা, তুমি আমি—জগতের কোনো মানুষই ঈশ্বর বা কোনো অপদেবতার অবতার নই। আমরা প্রত্যেকেই রক্তমাংসে গড়া এক একটি নিখুঁত সাধারণ মানুষ। তাই আমার কথাবার্তা আচার আচরণ মাটির মানুষের মতোই। আমরা ভুল করে বা না বুঝে অকারণে তার চাইতে বেশি হতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করি, তাতে জীবনে দুঃখ কষ্ট সন্তাপ আর নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায় মাত্র।"

জয়ন্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রা জানালা থেকে কোনোক্রমে নিজের শরীরটা সরিয়ে আনে, স্বাভাবিক ভাবে মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারপর নীরবে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়। জয়ন্ত আর কোনো কথা বলে না, শুধু চিত্রার মুখের দিকে আন্তরিকতার স্পর্শ লাগানো একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেগে ঝড়ের মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অল্পক্ষণ পরই বৃষ্টির জল রেনকোট আর টুপির কিনারা বেয়ে ঝরণার ধারার মতো ঝরে পড়তে লাগল। মুখ ভিজে একাকার। হাঁটতে হাঁটতে বারবার কাদাজলের সঙ্গে লুটোলুটি খেয়ে তার প্যাণ্টের নীচের দিক দু'পায়ের সঙ্গে লেপটে গেল। এমন কি পুরু জুতোর অস্তরণ ভেদ করে বৃষ্টির জল মোজার তলায় গিয়ে জমা হতে লাগল।

জয়ন্ত কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করল না। এক উন্মাদনায় মেতে সে বোর্ডিং-এর দিকে এগিয়ে চলল। অভূতপূর্ব আনন্দের উদাত্ত একটা জয়গান তার শিরা উপশিরাকে মাতিয়ে দিয়েছে। যৌবনের তুমুল শঙ্খনাদ তার দেহের অণু পরমাণুতে বিদ্রোহের ঝঙ্কার তুলেছে।

এই অস্থির পুলকের উন্মাদনায় জয়ন্ত যেন তার শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণই হারিয়ে ফেলল। ঝড় আর বর্ষণের বুক ভেদ করে সে শুধু গতির আবেগেই এগিয়ে যাচ্ছে, আর যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই উন্মাদনা বাড়ছে, মনে হয় সে নিজেই বোধহয় এক ঝড়ো হাওয়া। এই ঝড় একটি মূর্ত প্রতীক। এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিদ্রোহের সেই জ্বলন্ত প্রাণবহ্নি। এই ঝড়ের মতোই সে নিজেকে যেন একদিন পৃথিবীর সকল বন্ধন, নির্যাতন, নিষ্পেষণকে ভেঙ্গেচুরে চুরমার করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তার বদলে সম্পূর্ণ নূতন মানবের নূতন একটি পৃথিবী গড়ে উঠবে, সেখানে সৃষ্টির আদিম প্রভাতে সমুদ্রবক্ষ থেকে আপনা-আপনি উদ্বেল হয়ে ওঠা ঢেউয়ের মতো মানুষ হবে চির মুক্ত, চির স্বাধীন, চির নিষ্কলঙ্ক। ❒

**সৈয়দ আব্দুল মালিক**

জন্ম 1919, নাহরণি গাঁও, গোলাঘাট। যোরহাট থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে গুয়াহাটি কটন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমীয়ায় এম. এ. পাশ করে যোরহাটের জে. বি. কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অজস্র সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন, তন্মধ্যে অসম সাহিত্য সভার সচিবের পদ অন্যতম। সক্রিয় রাজনীতিতেও জড়িত। মালিক সাহেবের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঃ—গল্প সংগ্রহ—পরশমনি, এজনী নতুন ছোয়ালী, রঙাগবা, মরহা পাপরি, মরম মরম লাগে, শিখরে শিখরে, শিল আরু শিখা, অস্থায়ী আরু অন্তরা, প্রাণাধিকা, ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর।

উপন্যাস—বনজুই, ছবিঘর, রথর চকরী ঘুরে, সুরুজমুখী সূর্য, আধার শিলা, অঘরী আত্মার কাহিনী, জীয়া জুরির ঘাট, প্রাচীর আরু প্রান্তর, মাটির চাকী, রাতির কবিতা, সিপারে প্রাণসমুদ্র, পদুমরা হারির হাট, জয়া মানিক, ওমলা ঘরের ধূলি ইত্যাদি।

ভ্রমণ কাহিনী—মাজত মাথোন হিমালয়।

কবিতা—বেদুইন, স্বাক্ষর।

নাটক—মকরা জাল, রাজদ্রোহী, আলহী ঘর।

অনুবাদ—চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), তীর্থযাত্রী (জন বয়ার) ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন (জাকির হোসেন)।

গবেষণা গ্রন্থ—অসমীয়া জিকির আরু জারি।

# কিছু আঁধার কিছু আলো

বিদায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করেও আবার অমৃতের মুখের দিকে তাকানোতে অমৃত দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, "কোনো চিন্তা নেই। আসছে সপ্তাহে তোমার ছেলেকে নিয়ে যেতে পারবে। সে পুরোপুরি ভাল হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, স্যার"—তার চোখে শ্রদ্ধার ভাবটুকু ফুটে উঠল, অমৃতকে প্রণাম জানিয়ে তাই যেন সে নিবেদন করল। তারপর মেয়েটি ধীরে ধীরে কম্পাউণ্ড পার হয়ে চলে গেল।

অমৃত এমনি কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। সে আরেকটা ধরাল। কি কারণে জানি মনটা হাল্কা লাগছে। ছেলেটির বাঁচার আশা ছিল না, কিন্তু সে ভাল হয়ে উঠেছে।

দুঃখী বিধবার একমাত্র ছেলে। তার জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা তাকে নিয়েই। অমৃত অনুভব করল যে মা ছেলে দুজনকেই সে জীবনদান করেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, পাঁচটা বেজে গেছে।

পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে অমৃত দেখল খোলামেলা পরিষ্কার আকাশ, সূর্য নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এপ্রিল মাসের এমন বিকাল মাঝেমধ্যে বড় ভাল লাগে। 'টাই'-এর বাঁধনটি এমনি দুয়েক বার ছুঁয়ে অমৃতের মনে হলো একটু চা খাওয়া দরকার—পিপাসা লেগেছে। আড়াইটার পর থেকে সে এইমাত্র একটু বিশ্রাম পেয়েছে।

সুন্দর একটা নূতন এ্যাম্বাসেডার গাড়ি এসে ঢুকল। মাথা ঘোরাতে গিয়েও অমৃত থেমে গেল। লঘু দৃষ্টিতে গাড়িখানার দিকে তাকাল।

একজন ভদ্রলোক আর একটি যুবতী নামলেন। তাঁরা কম্পাউণ্ডে ঢুকছেন। মহিলাটি সঙ্গের ভদ্রলোককে বললেন, "ঐ তো, ইনিই। আছেন, চলো।"

দুজনে এসে অমৃতের সামনে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক রাশিয়ান কর্ডের একটা ঢিলেঢালা প্যাণ্ট আর একটা হাল্কা নীল রঙের হাওয়াইন শার্ট পরেছেন, চোখে চশমা। মহিলার পরনে পাটের মেখলা আর সুতির চাদর।

দুহাত কপালে ঠেকিয়ে অমৃত নমস্কার জানাল, দুজনে প্রতি নমস্কার করলেন। মহিলাটি তীব্র সন্দেহের দৃষ্টিতে অমৃতের দিকে একবার তাকালেন।

'ভেতরে আসুন'—অমৃত বলল। অভ্যাগত দুজনকে তার ক্লিনিকের রিসেপশনে ডেকে নিল। তিনজন বসল।

ভদ্রলোক বললেন—"আপনার কাছে এলাম। আমাকে চিনতে পারেননি বোধহয়। আমার নাম রঞ্জিত চৌধুরী।"

অমৃতের মুখের রঙ একটু বদলে গেল, যদিও তা অভ্যাগত দুজনের চোখে পড়ল না বোধহয়।

"আর ইনি—আমার স্ত্রী—গায়ত্রী চৌধুরী।"

একবার গায়ত্রীর মুখের উপর চোখ বুলিয়ে অমৃত বলল—"নিন, সিগারেট খান।" সিগারেটের টিন আর দেশলাই এগিয়ে দিল। দরজার সামনে এসে ইউনিফর্ম পরিহিত দারোয়ান সেলাম দিল। কেউ এলে আজ্ঞা পালনের জন্য সামনে থাকতে তাকে বলা আছে।

অমৃত কিন্তু তার দিকে তাকাল না।

তাকাল সামনের চেয়ারে বসা ভদ্রলোকের দিকে। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। সুশ্রী চেহারা, নাকটা শুধু তেমন তীক্ষ্ণ নয়। গায়ের রঙ চোখ জুড়ানো, পুষ্ট গলা, পুরু ফ্রেমের চশমা পরেছেন।

রঞ্জিত একটা সিগারেট ধরাল।

ব্যবসায়ীর নির্লিপ্ত স্বরে একটু অন্তরঙ্গতা এনে অমৃত বলল—"এবার বলুন তো, কি ব্যাপার?"

রঞ্জিত একবার গায়ত্রীর দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি একটু কোমল করে ধীরে ধীরে বলল—"আমার—আমার মেয়েটি বড় অসুস্থ। প্রায় ছ'মাস হল। চিকিৎসার বাকী রাখিনি। কিন্তু একটুও উন্নতি নেই।"

"মেয়েটি কোথায় আছে এখন?"

"আমাদের সঙ্গেই আছে। চার বছর বয়স। আগে তার হেল্‌থ্‌ কিন্তু ভাল ছিল।"

"এখন সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নাকি?"

"সঙ্গে আনিনি। আপনার পরামর্শ মতো যা করার করব ভাবছি।"

"এখানে কোথায় আছেন? মানে আপনারা কি এখানেই থাকেন?"

"না, আমি শিলং-এ থাকি। গায়ত্রীর মেজমামা এখানে থাকেন। আপনি চেনেন বোধহয়—"

অমৃত আবার গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। গায়ত্রী নিষ্পলক দৃষ্টিতে অমৃতের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবারে মাথাটি নামিয়ে নেয়।

দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানের দিকে না তাকিয়েই অমৃত বলল,—"রঘুনাথ, আমরা চা খাব, তিন কাপ"—তারপর জিজ্ঞেস করে—"এই মেয়েটিই আপনাদের প্রথম সন্তান?"

"না, এটি তৃতীয়। আগে দুটো ছেলে হয়েছিল, দুটোই নেই। একটি মারা যায় জন্মের এক বছর পর, অন্যটি দু'বছর। মেয়েটিও যদি—"

অমৃত রঞ্জিত আর গায়ত্রী দুজনের দিকে তাকিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল।—"আপনারা কি মেয়েটির চিকিৎসার জন্যই এসেছেন?"

"হ্যাঁ। আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু শিলং-এ আমার একজন বন্ধু—আপনারও বন্ধু তিনি—আণ্ডার সেক্রেটারি আহমেদ, তিনি আপনার কাছে আসতে বললেন। দশদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি—"

চেয়ার থেকে উঠে অমৃত বলে—"চলুন, বাড়ির ভেতরে যাই। একটু চা খাওয়া যাক।"

তিনজন রিসেপশন রুম থকে বেরুলো। ক্লিনিক আর বাড়ির মধ্যেকার বড় লনটি পার হয়ে তিনজন অমৃতের বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

নূতন করে সাজানো রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের সুন্দর একখানা দুমহলা বাড়ি, ক্রীম রঙের।

অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি। কোথাও একটু ধূলাবালি নেই। দেয়ালে ক্যালেণ্ডার ফটো ইত্যাদিও নেই। অমৃতের পাশাপাশি রঞ্জিত-গায়ত্রীও উপরে উঠে যায়।

উপরের বৈঠকখানাটিও অত্যন্ত পরিপাটি, জানালা দিয়ে একটি লতা উঠেছে! চেয়ার টেবিলগুলো খুব সুবিন্যস্তভাবে রাখা। কাঠের চক্‌চকে মেহগনি রঙের

ফার্নিচারগুলো দেখলে মনে হয় এই সেদিন রঙ করানো হয়েছে। মেঝেতে নীলাভ কার্পেট পাতা। নীলের মধ্যে ছোট ছোট সাদা ফুল এক সারি।

এঘরে আর বাহুল্য কিছু নেই।

তিন জন বসল। রঞ্জিতের মুখোমুখি অমৃত, গায়ত্রী বাঁ দিকে। অমৃত আরো একটা সিগারেট ধরায়।

রঞ্জিত বলল—"আপনি বাসনাকে, মানে আমার মেয়েটিকে একবার দেখে আসবেন?"

অমৃত যেন কথাটা একটু তলিয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বলল—"ক্লিনিকটি নূতন করেছি। এখনও কাজ বহু বাকী রয়েছে। এদিকে পেশেণ্ট আসছেই। ভাল একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট খুঁজেছিলাম, পাই নি। কেবল একজন নার্স আর কম্পাউণ্ডারের উপর নির্ভর করতে সাহস পাই না।"

গায়ত্রী নীরবে কথাগুলো শুনছিল। রঞ্জিত বলল—"দেখছিই তো আপনি কত বিজি থাকেন। তাহলে আমিই মেয়েটিকে নিয়ে আসব।"

"সেটাই বেশি সুবিধাজনক হবে বোধহয়। মেয়েটি নিশ্চয়ই কিছু চলাফেরা করতে পারে?"

"খুব একটা পারে না। কিন্তু গাড়িতে নিয়ে আসা যায়। শিলং থেকে গাড়িতে নিয়ে এলাম না।"

"আমি একটা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ির অর্ডার দিয়েছি। কবে পাব কে জানে।"—অমৃত বলে।

খাবার ঘরে চা সাজিয়ে ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান সেলাম দিল। অমৃতের অনুরোধে সবাই চায়ের টেবিলে বসল। তখন অমৃত রঞ্জিতের মুখোমুখি, গায়ত্রীর দিকে তাকালোই না। অবশ্য নম্র স্বাভাবিক সুরেই দুজনকে সে চা খেতে বলল।

রঞ্জিত বলল,—"আমি আরো ছ'দিনের মতো থাকতে পারব। ছুটি নেই। গায়ত্রী অবশ্য থাকবে।"

একটু ভেবে অমৃত বলল—"আরো পাঁচ দিন পর আমার এখানে একটা সীট খালি হবে। ছ'টা মাত্র সীট। এ ক'দিন মেয়েটিকে এখানে না আনলেও চলবে। আপনাদের অসুবিধা হবে নাকি?"

রঞ্জিত গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

গায়ত্রী তিন জনেরই চা তৈরী করছিল। কিছু বলল না।

অমলেটের উপর লঙ্কার গুড়ো ছিটিয়ে দিতে দিতে অমৃত বলে—"মেয়েটিকে এখানে রাখার দরকার আছে কি না—দেখতে হবে সেটা—তাহলে তো আপনারা তাকে সঙ্গেই নিয়ে যেতে পারবেন। নইলে হয়তো কিছুদিন এখানে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে, অবশ্য যদি আপনারা ভাল দেখেন।"

"কাল একবার নিয়ে আসব নাকি? আপনি একবার দেখবেন।"

"কালকে? আনতে পারেন। ঠিক আছে, কালকেই একবার আনবেন। সকালের দিকে আনবেন, আটটা থেকে দশটার মধ্যে।"

চা শেষ করে তিন জন উঠল। দারোয়ান এসে সেলাম দিল। কেউ এসেছে। অমৃতকে খুঁজছে।

রঞ্জিত বলল—"আপনাকে আর বিরক্ত করছি না তাহলে।"

অমৃত জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে। গেটের সামনে গাড়ি একখানা এসে থেমেছে।

অমৃত বলল—"মেয়েটিকে এখানে কদিন রাখতে হলে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে নাতো?"

রঞ্জিত বলল—"চিকিৎসার জন্যই শিলং থেকে এখানে এসেছি। যতদিন দরকার ততদিনই থাকবে।"

তিন জন নীচে নামল। বিদায় নেওয়ার সময়ে রঞ্জিত অসহায় ভাবে বলল—"অনেক আশা করে আপনার কাছে এসেছি—"

অমৃত মৃদু হেসে বলে "রোগীটিকে তো আগে দেখি।"

রঞ্জিত এবং গায়ত্রী বিদায় নিয়ে চলে গেল। অমৃত গায়ত্রীকেও নমস্কার করল কিন্তু না তাকিয়েই। কোনো কথাও বলল না। রঞ্জিত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু বলল না।

বাসনার বড় খারাপ ধরনের অসুখ। চার বছরের ছোট্ট একটা মেয়ের এমন অসুখ কেন হল, অমৃত বুঝতে পারল না। কিছু দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। খুব সাবধানে, প্রতিদিন অতি মনোযোগ দিয়ে মেয়েটিকে চিকিৎসা করতে হবে। রোগ জটিল হয়ে পড়েছে।

অমৃতের ক্লিনিক-এ ধরনের রোগী এর আগে আর আসে নি। তিন দিন পর নানা ধরনের পরীক্ষার পর অমৃত রঞ্জিতদের বলল—"অসুখটা বড় কমপ্লিকেটেড হয়ে পড়েছে, চিন্তার কারণ যে নেই এমন নয়। আপনারা রাজী হলে আমি চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারি।"

রঞ্জিত আর গায়ত্রী অসহায় ভাবে অমৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে রঞ্জিত বলে—"বাসনাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা কোন পর্যায়ে গেছে, আপনার পক্ষেও হয়তো বোঝা কঠিন হবে। ছেলে দুটো আগে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। তাদের হারাব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। শুধু দায়িত্ব নয়, বাসনার জীবনটি আপনার হাতে। ও ভাল না হয়ে উঠলে আমার জীবনে যে কি হবে, ভগবান জানেন।"

রঞ্জিতের এই কথাগুলির মধ্যে যে গভীর উদ্বেগ ছিল অমৃত তা উপলব্ধি করল। কিন্তু পরিস্থিতি লঘু করার জন্য বলল—"আপনাদের নিরাশ হওয়ার কোনো

কারণ নেই। ছোট মেয়ে—হয়তো তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে। আর আমার উপর শুধু এই বিশ্বাসটুকু রাখবেন যে আপনাদের মেয়েকে আমি কখনও অবহেলা করব না।"

রঞ্জিতের চোখে আশা ঝল্‌কে ওঠে। সে বলে—"গায়ত্রী রইল। কি লাগবে না লাগবে আপনি বললেই গায়ত্রী এনে দেবে। আমার ছুটি নেই, আমাকে যেতেই হবে। আমার হয়ে আপনি বাসনাকে দেখবেন। গায়ত্রী আর আপনাকেই কিন্তু বাসনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।"

রঞ্জিতের কথায় গায়ত্রী একবার অমৃত আর একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। তার মুখখানা একটু রাঙা হয়ে পড়েছে।

অমৃত ধীরে ধীরে বলে—"আপনারা কেউ না থাকলেও আমার রোগীকে আমি ঠিকই দেখব। এগুলো নিয়ে আপনি ভাববেন না।"

অর্থাৎ গায়ত্রীকে শিলং নিয়ে যেতে পারেন। এখানে তার থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।

কথাটা বুঝে নিয়ে রঞ্জিত বলে—"না না, বাসনাই হয়তো মাকে খুঁজবে, গায়ত্রী থাকুক। আর এখানে থাকার কোনো অসুবিধা নেই। গাড়িটি রেখে যাব, ড্রাইভারও থাকবে। দরকার পড়লে সেও যাতায়াত করতে পারবে।"

বাসনাকে একটা সিঙ্গল সীটেড্ রুমে রাখা হয়েছে। রঞ্জিত সেখানে গেল। ক্ষীণ দুর্বল মিইয়ে পড়া বাসনার কাছে সে বসে পড়ে।

বাসনার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—"বাসনা, ভাল লাগছে একটু, না? ডাক্তার বলেছেন খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে। আমি শিলং থেকে আবার এসে দেখে যাব। মা থাকবে—আর ডাক্তারবাবুও খুব ভাল লোক। তোমাকে খুব আদর করবেন, যাই এখন—"

রঞ্জিত বাসনার কপালে আদর করল। দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর চোখের জল মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রঞ্জিত পরদিন চলে গেল। যাওয়ার সময় অমৃতকে বলল—"গায়ত্রী এখনও আপনার কাছে সহজ হতে পারেনি। আগের চেনা পরিচয় নেই তো। কিন্তু বাসনার সঙ্গে গায়ত্রীকেও আপনার আশ্রয়ে রেখে গেলাম। আপনি কি রকম মানুষ দুদিনেই বুঝেছি ডাক্তারবাবু। আপনি থাকলে আমার আর কোনো চিন্তা নেই—"

অমৃত নম্র ভাবে হাসল।

গায়ত্রী অমৃতের হাসিটির অর্থ বোঝার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর রঞ্জিত আর গায়ত্রী চলে গেল।

একা বসে অমৃত এমনি আবার একবার হাসল।

বিকালে চা খাওয়ার পর অমৃত ঠিক করল আজ আর সে বাইরে বেরুবে

না। দারোয়ানকে ডেকে বলল কেউ খোঁজ করলে যেন বলে দেয় যে আজ দেখা হবে না। রাতে সে আজ একবার রোগী দেখতে যাবে।

অবশ্য এমন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না বলেও মনে হয়েছিল অমৃতের। তবু একটি নিঃসঙ্গ বিজন সন্ধ্যা কাটাতে আজ তার বড় ইচ্ছা করছে।

আট বছর পর হঠাৎ এসে উপস্থিত হল গায়ত্রী, এক সময়ের কুমারী গায়ত্রী চলিহা। ইতিমধ্যে কত কি পরিবর্তন ঘটে গেছে।

আটটি বছরেই মানুষের জীবনে কত কি পরিবর্তন ঘটে।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই অমৃত এম.বি.বি.এস. পাশ করল। হাজার হাজার টাকা করল। জার্মানী থেকে নূতন ডিগ্রী নিল—শিশু রোগের বিশেষজ্ঞ হল। চাকুরী না করে নিজের ফার্মেসী খুলল, তারপর এই ক্লিনিক। আটাত্তর হাজার টাকা খরচ করে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি করতে দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু সাফল্যই সফলতার চরম কথা। আজ অমৃতকে চেনে না এমন মানুষ আসামে নেই। শিশুদের দুরারোগ্য ব্যাধি অভাবণীয় ভাবে সারিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আজ আসামে তার জুড়ি নেই।

দামী মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, নার্স, কম্পাউণ্ডার আর ঔষধপত্রের একটা বহুমূল্যের স্টক নিয়ে অমৃত আজ সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। জার্মানীতে সে একটা কথা শিখে এসেছিল যে সাফাল্য পেতে হলে পরিশ্রম করতে হয়। অসাধারণ পরিশ্রম না করলে অসাধারণ কাজও করা যায় না।

আরো কিছু কথাও অমৃতের মনে পড়ল।

তিন বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে গায়ত্রী চলিহা অমৃতের মনে একটা জায়গা করে নিয়েছিল। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চলিহার মেয়ে গায়ত্রী—দেখতে শুনতে লেখাপড়ায় কোনোদিক দিয়েই গায়ত্রীর কোন ঘাটতি নেই।

আর বিখ্যাত ব্যবসায়ী সদানন্দ ফুকনের একমাত্র পুত্র অমৃতও তুলনায় কোনো বিষয়ে গায়ত্রীর চাইতে কম ছিল না। সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক, পড়াশুনায় ভাল, ডাক্তারির প্রতি একটা বিশেষ অনুরক্তি রয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে বাবার লক্ষাধিক নগদ টাকা আর অগাধ সম্পত্তি।

তার চাইতেও মূল্যবান বস্তু অমৃতের ছিল, অটল আত্মসম্মানবোধ আর চরিত্র গুণ। কেউ কেউ অমৃতকে দেমাকি বলে ভুল করত, কিন্তু আসলে অমৃত ছিল স্বভাবনম্র।

গায়ত্রীর সঙ্গে অমৃতের নিবিড় ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছিল। গায়ত্রীর তাকে ভাল লেগেছিল। একে অন্যকে নিজের করে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। অমৃত এম-বি-বি-এস পাশ করবে, নিজে প্র্যাকটিশ করবে, গায়ত্রী আর অমৃত একটা মধুর দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ করবে। স্নেহ আর শান্তির, প্রেম আর ঐশ্বর্যের মধ্যে একটা মধুর জীবন যাপন করবে।

অমৃত স্বপ্ন রচনা করেছিল।

গায়ত্রীর জ্যাঠামশাইর মেয়ের বিয়েতে গায়ত্রী গেল শিলং। গায়ত্রী ফিরে এলো, কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অন্য এক মেয়ে। বিয়ের সময় নূতন একজন যুবক রঞ্জিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রঞ্জিতের কি একটা আকর্ষণে গায়ত্রী সম্পূর্ণ অতিত, সকল প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল। অমৃতকে জানানোরও প্রয়োজন বোধ না করে সে মাকে জানিয়ে দিল যে সে রঞ্জিতকে বিয়ে করবে। মা একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু রঞ্জিত পাত্র হিসাবে অমৃতের চাইতে খারাপ নয়, তাই বিয়ে দিয়ে দিলেন।

অমৃত আঘাত পেল। একটি চঞ্চল নারীর চটুল প্রবঞ্চনার জন্য নয়, তার ব্যক্তিত্বকে অপমান করার জন্যে।

বিয়ের আগে গায়ত্রী একদিন এসেছিল। রঞ্জিতকে বিয়ে করার পেছনে তার যুক্তিগুলো বুঝিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু অমৃত তার সুযোগ না দিয়ে বলল— "তুমি কি বলতে এসেছ, আমি জানি গায়ত্রী। কিন্তু আমাকে আর দশটা ছেলের মত দুর্বল ভাবলে ভুল করবে। তোমার মত একটি মেয়ের বিরহে আমি খাওয়া-পরা বাদ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবো না। শিক্ষিত মেয়েদের সম্পর্কে আমার একটা অন্য রকম ধারণা ছিল। সে ধারণাটা তুমি ভেঙ্গে দিলে। আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি অকারণে দুঃখ করব না। একটা ব্যাপারে আমার মজা লাগছে—এত শিক্ষাদীক্ষাও মেয়েদের একটুও বদলাতে পারে না দেখে।"

অমৃতের কথা শেষ হওয়ার পর গায়ত্রী কোনোক্রমে বলেছিল—"আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর অমৃতদা। রঞ্জিতকে আমার ভাল লেগেছে। তোমাকে আমি বরাবরই শ্রদ্ধা করে যাব।"

"আর তার বিনিময়ে আমি যদি তোমাকে সব সময় ঘৃণা করি? গায়ত্রী তুমি এখন যাও, তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে। তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলেই আমাকে অপমান করতে পারলে। তোমার উপর প্রতিশোধ নেব, এমন নীচতা আমার নেই। রঞ্জিতকে আমি চিনি না। ভয় করো না, কোথাও কোনো দিন তার সঙ্গে দেখা হলেও তোমার অতীতের কথা তাকে জানিয়ে বিরক্ত করব না। তুমি আমাকে চিনতে পারনি বলেই বলছি..."

কথাগুলো মনে পড়ায় অমৃতের হাসি পেল। ধেৎ, গায়ত্রীর মত অস্থির চিত্ত একটি মেয়েকে এত কড়া কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল? গায়ত্রী একটি অতি সাধারণ মেয়ে মাত্র।

ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা পাশ করে অমৃত কিছু দিন প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করল। পৃথিবীর অন্য সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ডাক্তারিতেই মন দিল।

তারপর এক দিন মনে হল যে শিশুরোগের চিকিৎসার মধ্যে একটা অন্য ধরনের আনন্দ রয়েছে। শিশুরা নিজের ব্যাধিটা ভাল করে বুঝিয়ে বলতেও পারে না,

তাকে সুস্থ করলে তার বেঁচে থাকার একটা নূতন প্রেরণা যোগানো হয়। আর সুস্থ হওয়ার পর কোনোদিন সে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও আসে না।

গায়ত্রীর বিয়ে হয়ে গেছে, সে তিনটা ছেলে মেয়ের মা হয়েছে। ইতিমধ্যে তার দুটো সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু গায়ত্রী আগের মতোই রয়েছে। সুন্দর আঁটসাঁট গড়নে এখনও তাকে একটি মেয়ে বলেই মনে হয়। কোথাও বয়সের কোনো আঁচও পড়েনি। মুখে একটু বেদনার ছায়া পড়েছে, কিন্তু তাতে তাকে আগের চাইতে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

অমৃত উঠে বসে,—"একেবারে অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো নিয়ে আজ আমি মাথা ঘামাচ্ছি। গায়ত্রীর সুন্দর হওয়া না হওয়ার সঙ্গে আমার লাভ ক্ষতি কিছুই জড়িত নয়। আমি গায়ত্রীর জীবনের বাইরে রয়েছি। একেবারেই বাইরে। গায়ত্রীর মেয়ে বাসনা—তাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছি। বাসনা যারই মেয়ে হোক, সে আমার চিকিৎসাধীন রোগী, আমার ক্লিনিকে রয়েছে। ভাবতে হয় বাসনার কথাই ভাবব। গায়ত্রীর কথা ভাবব না, বিশ্বাসঘাতক গায়ত্রীকে আমি আগের মতোই ঘৃণা করি। ঘৃণা ছাড়া আমার কাছে গায়ত্রীর অন্য কিছু আশা করা অনুচিত।"

বাইরে তাকিয়ে অমৃত দেখল সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আর শেষ বেলার পড়ন্ত আলো তার ঘরেও ঢুকেছে। বড় উদাসীন লাগল অমৃতের।

অমৃতের আজ কেউ নেই। বাবা মারা গেছেন, মা তো আগেই গিয়েছিলেন। আজ তার রয়েছে নূতন করে পাতা এই ক্লিনিকটি, রোগী কজন আর বেতন ভোগী কজন চাকরবাকর।

অমৃতের মনে হল যেন সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে মৃত্যু এসে তাকেও ঘিরে ধরেছে। বাড়িঘরের আনাচে কানাচে যেন মৃত্যু এসে ঢুকে পড়েছে। আর একা অমৃত সেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। দারোয়ান এসে সেলাম দিল।

"একজন মহিলা এসেছেন। গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আপনি দেখা করবেন না বলাতেও শুনলেন না। বলছেন খুব জরুরী দরকার। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে যাবেন।"

অমৃত একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর বলল, "ঠিক আছে, নিয়ে এসো।"

সুইচ টিপে বাতিটি জ্বালিয়ে দিল, তারপর সিগারেট একটা জ্বালিয়ে অতিথির অপেক্ষায় সহজ ভাবেই বসে রইল।

গায়ত্রী এসে ঢুকল।

একটু নড়াচড়া না করে বসে থেকেই অমৃত একবার গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। গায়ত্রী এসে সামনে দাঁড়াল।

আরেক বার গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বসো।"

চেয়ারে বসে গায়ত্রী তার মুখের উপর চোখ রাখল, বলল, "আমাকে ঢুকতে দিতে চায়নি, জোর করে ঢুকেছি।" অমৃত একমনে সিগারেট টানতে থাকে।

"এখানে আসার পর থেকে তুমি একবারও আমার সঙ্গে কথা বলনি। তাই আজ আমি একা এসেছি তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে।"—গায়ত্রী বলল।

কলিংবেল টিপে বয়কে ডেকে অমৃত বলল,—"দু গেলাশ সরবত আনো।"

বয়টি সেলাম করে নীচে নেমে গেল।

একটু ব্যগ্রভাবে গলা একটু উপরে তুলে গায়ত্রী বলল—"অমৃতদা, তুমি এতো গম্ভীর হয়ে আছো কেন? আমার সঙ্গে কথা বল না কেন?"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অমৃত আস্তে করে বলে—"এই সময়টাতে আমি একটু নির্জনতা পছন্দ করি, কারো সঙ্গেই কথা বলি না।"

"কিন্তু তাই বলে আমার সঙ্গেও কথা বলবে না?"

গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অমৃত বলে—"তোমাকে আলাদা বলে ধরার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি।"

গায়ত্রী অপমান বোধ করল।—"তাহলে আমি চলে যাচ্ছি, তুমি একা বসো, চুপচাপ।" গায়ত্রী উঠে দাঁড়াতে যায়। একটি ট্রেতে করে বয় এমন সময় দু গেলাশ সরবত, প্লেটের উপর কিছু কিসমিস, আখরোট আর টফি এনে টেবিলের উপর রাখে।

প্লেটটি গায়ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অমৃত বলল—"খাও, আর কিছু দেবে?"

একটা কিসমিস মুখে তুলে গায়ত্রী বলে, "আমি তোমার কি করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর অপমান করছ। তুমি ভেবেছো, তুমি যে একবারও আমার সঙ্গে কথা বলনি, তা সে লক্ষ্য করেনি। সেও খারাপ ভেবেছে তুমি কথা না বলাতে।"

একটা টফির উপরের কাগজটি খুলতে খুলতে অমৃত বলল—"অমুকের তমুকের ভাল লাগা খারাপ লাগা নিয়ে আমার ভাবনার কোনো কারণ নেই। তোমরা তো অমৃত ফুকনের বিয়েতে আসনি যে সাদর অভ্যর্থনা না জানালে খারাপ লাগতে হবে। তোমরা এসেছিলে অমৃত ডাক্তারের কাছে, তোমাদের বাসনার চিকিৎসা করাতে। বাসনার চিকিৎসার দায়িত্ব আমি নিয়েছি, আমার কাছ থেকে তোমরা আর কি আশা কর।"

গায়ত্রী সরবতে একটু চুমুক দিল। তারপর কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা এনে বলল—"তাহলে আমার আর কিছুই আশা করার নেই। একজন ভদ্রলোক পরিচিত একজন ভদ্রমহিলার প্রতি যেটুকু সৌজন্য দেখায় সেটুকুও তোমার থেকে আমার প্রাপ্য নয়?"

কিসমিসের বোঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে গায়ত্রীর দিকে না তাকিয়েই অমৃত বলল—"কিসের দাবীতে?"

"অমৃতদা"—গায়ত্রী চিৎকার করে ওঠে।

"জোরে চেঁচাবে না, রোগীরা বিরক্ত হবে।" এত নির্লিপ্ত ভাবে অমৃত কথাগুলো বলল যে গায়ত্রী হতভম্ব হয়ে গেল।

"আমি তোমার সামনে বসে রয়েছি আর তবুও তুমি রোগীর কথাই ভাবছ?"

"ডাক্তারদের সুস্থ মানুষের কথা না ভাবলেও চলে। বাসনার কথা যদি আমি না ভাবি, তুমি কি খুশী হবে?"

গায়ত্রী অমৃতের চোখের দিকে আবার তীব্রভাবে তাকায়, অমৃতকে কড়া কথা বলার জন্য হঠাৎ যেন গায়ত্রী লজ্জা পায়। অমৃত ফুকন একজন বিখ্যাত ডাক্তার, এই ক্লিনিকের কর্তা, লক্ষ টাকার মালিক, শিশু-রোগ বিশেষজ্ঞ—তার বাড়িতে এসে এমনি কড়া কথা শোনানোটা অশোভন হয়েছে। ভাগ্য ভাল যে অমৃত তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে নি। গায়ত্রী লজ্জা পেল, নিজেকে অপরাধী ভাবল। মাথা নীচু করে বলল,—"মনে কিছু কোর না অমৃতদা, আমি যে তোমার বাড়িতেই বসে আছি সে কথাটা মনে ছিল না।"

কোনো কথা না বলে সরবত শেষ করে অমৃত একটা সিগারেট ধরায়।

গায়ত্রী অনুভব করল পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির জন্য অমৃতের কাছে সে আসে নি, সে এসেছিল বাসনার চিকিৎসা করাতে। আজ অমৃত—শুধুমাত্র অমৃতই বাসনাকে বাঁচাতে পারে। সেই অমৃতের সঙ্গে বাদবিসম্বাদ করা নিরর্থক।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল। পৃথিবীর বুকে তখন রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে অমৃত বলল—"রাত হল।" এর মধ্যে গায়ত্রীকে বিদায় দেওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে কি না, তা বোঝার চেষ্টা না করে অমৃতের দিকে তাকিয়ে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল—"বাসনাকে কেমন দেখলে? সে ভাল হয়ে যাবে, না অমৃতদা?"

একটু হাসার চেষ্টা করে অমৃত বলল—"এই কথাটা জানার জন্য এতখানি ভূমিকা না করলেও হত, কি বল?"

হঠাৎ গায়ত্রী উঠে দাঁড়াল, আর অতি উষ্ণ স্বরে বলল,—"হয়েছে, হয়েছে, অনেক অপমান করেছ। বাসনাকে তোমার হাতে দিয়েছি, পারো যদি বাঁচিয়ো, নইলে মেরে ফেলো। আমি জানি আমার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে তুমি শান্তি পাবে না।"

গায়ত্রীর কথায় একটুও কান না দিয়ে অমৃত বলল, "তুমি এখানে আর কদিন থাকবে?"

"যে কদিনই থাকি, এমনি এসে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। তুমি খুব বড় ডাক্তার হতে পার, কিন্তু আমাকে এত অপমান না করলেও পারতে।"

গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে কঠিন সুরে অমৃত বলল—"তুমি আমার জীবনটাকে আর আমার ভালবাসাকে যতখানি অপমান করেছো, ততখানি নিশ্চয়ই করিনি।"

হঠৎ গায়ত্রী বসে পড়ে। মুহূর্তে সে যেন একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। "তোমার ভালবাসাকে আমি অপমান করেছি অমৃতদা?"—গায়ত্রী যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করে।

অমৃত হাসল—"যাকগে, যেতে দাও ওসমস্ত কথা। গায়ত্রী ওগুলো পুরানো কথা, তুমি যেমন সেগুলো নিয়ে আর কখনো ভাবোনি, আমিও ভাবিনি। তোমাদের দেখতে পেয়েই আমার আবার পুরানো কথাগুলো মনে হচ্ছিল।"

"আমার কথা তুমি কখনও ভাবো না?"

"তোমার কথা মনে পড়লেই আমার তোমার উপর ঘৃণা হয়। তাই না ভেবেই থাকি। তোমাকে ঘৃণা করেই বা আমার কি লাভ?"

গায়ত্রী বুঝল অমৃত তাকে অপমানের শেষ আঘাত হেনেছে। আজ ঘৃণায়ও সে তাকে স্মরণ করে না।

কি ভেবে যে গায়ত্রী বসে রয়েছে, সে নিজেই বুঝতে পেল না। "গভীর ঘৃণা কি গভীর ভালবাসারই প্রতিক্রিয়া নয়? অমৃত কি তাহলে আজও আমাকেই ভালবাসে? অসম্ভব। আমাকে ভাল বাসলে এমন অপমান কখনও করতে পারত না। অমৃত আমাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। কিন্তু আমার উপরের রাগ যদি সে বাসনার উপর মেটায়?"

গায়ত্রী অমৃতের মুখের দিকে তাকায়। এত গম্ভীর আর শান্ত এই অমৃত মানুষটি। যেন কাউকে ভালবাসতেও জানে না, ঘৃণা করতেও জানে না। গায়ত্রীর বড় ভয় হল অমৃতকে নিয়ে। "সে আমাকে হত্যা করবে নাকি? বাসনাকে মেরে ফেলবে নাকি?"

ধীরে ধীরে গায়ত্রী বলে—"তুমি আমাকে ক্ষমা করো নি জানি। আর তোমার কাছে ক্ষমা চাইতেও আমি আসিনি। কিন্তু অমৃতদা, যেমন করে হোক বাসনাকে ভাল করে দিতে হবে। তুমি বড় ডাক্তার, তুমি পারবে। আগের ছেলে দুটো বাঁচল না, এখন বাসনাও যদি না থাকে, আমার যে কি হবে ভাবতেই পারি না। বাসনাকে ভাল করে দাও অমৃতদা, তোমার যা চাই আমি তাই দেব—"

গায়ত্রীর কথার মধ্যে অমৃত একজন দুর্বল, অসহায়, সাধারণ নারীর কাতর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তার করুণা হল।

কণ্ঠস্বর একটুও না কাঁপিয়ে অমৃত বলল,—"আমাকে দেওয়ার মতো আজ তোমার কি রয়েছে গায়ত্রী?

গায়ত্রী অমৃতের মুখের পানে তাকায়—কি চায় অমৃত গায়ত্রীর কাছে?

হঠাৎ গায়ত্রী বলে ওঠে—"তুমি যা চাও আমি সবই দেবো অমৃতদা। কিন্তু বাসনাকে তুমি বাঁচিয়ে দাও—বলো, দেবে?"

অমৃত আস্তে বলে—"বাসনার ভাল না হওয়ার কোনো কারণ নেই বলেই

মনে হচ্ছে। আমি দেখব ভাল করে। রোগীকে আরোগ্য করাই আমার কাজ, গায়ত্রী।”

একটু থেমে অমৃত আবার বলল—“এই হাসপাতাল, ফার্মেসী আর এই ক্লিনিকটি করতে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। তোমাদের অনেক টাকা রয়েছে, বাসনাকে ভাল করে দিতে যদি পারি তো তাড়াতাড়ি বিলটা পে করে দিও। তোমার কাছে অন্য কিছুই আমি চাই না।”

অমৃতের কথায় গায়ত্রী একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। গায়ত্রীর কাছে অমৃত বিলের টাকা ছাড়া আর কিছুই চায় না। অমৃত একটা কসাই। মানুষ নয়, ডাক্তার নয়, একটা দোকানদার।

কিন্তু গায়ত্রীও এ অপমান বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল না। বলল—“নেবে, যতই লাগুক। টাকা তো নেবেই। টাকার জন্যই তো ক্লিনিক খুলেছো।”

একটু হেসে অমৃত বলল—“ডাক্তার মানুষ, ক্লিনিক না খুলে স্বয়ংবর সভা পাতলে কি ভাল দেখাবে?”

“তার মানে তুমি বলতে চাও যে টাকার জন্যই আমি রঞ্জিতকে বিয়ে করেছি?”

“সেটা তুমিই জানো। তুমি রঞ্জিতকে কেন বিয়ে করলে সে বিষয়ে ভাবার প্রয়োজন কোনোদিন বোধ করিনি।”

এরপর অমৃতের সামনে বসে থাকা গায়ত্রীর অসম্ভব হল। দরজা জানালা খোলা মুক্ত ঘরটির মধ্যেও যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অমৃত গায়ত্রীর অবস্থাটা বুঝল। সে চেয়ার ছেড়ে উঠল আর জানালা একটার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলল; নারীকে খেলার বস্তু হিসাবে ধরে নেওয়াটা পুরুষের পক্ষে যেমন অন্যায়, নারী যদি পুরুষকে খেলার বস্তু হিসাবে চায়, তবে সেটাও সমান অন্যায়, গায়ত্রী। কোনো নারী সে ধরনের অন্যায় করতে যাচ্ছে দেখলে তাতে বাধা দেওয়াটা আমি কর্তব্য বলে মনে করি। বাসনার স্বার্থে, রঞ্জিতের ভালবাসাকে অপমান করে আমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিলেও হয়তো তোমার কোনো অনুতাপ হত না। কিন্তু আমি কারো দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাই না। স্বামীর প্রতি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার, কিন্তু আমি পারি না। রঞ্জিত আমার শত্রু হলেও পারি না।”

“তুমি এসমস্ত কি বলছ, অমৃতদা?” ভীতকণ্ঠে গায়ত্রী বলে।

“তুমিই তো বললে যে আমি যা চাইবো তুমি তাই দিতে আজ প্রস্তুত।”

গায়ত্রীর গাল মুখ রাঙা হয়ে উঠল। মাথাটা ঘুরছে, বিজলী বাতিটা যেন চোখের সামনে নাচছে।

জানালার সামনে অমৃত দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। একটা

উঁচু প্রস্তরমূর্তির মতো দেখাচ্ছে। গায়ত্রীর মনে হল অমৃত নামক এই যুবকটি একটি নিষ্প্রাণ প্রস্থর মূর্তিই।

গায়ত্রী উঠে পড়ে।

"অমৃতদা"—গায়ত্রীর কণ্ঠে একটু কাঠিন্য ফুটল—"আমার দিকে তাকাও।"

"বল কি বলবে"—না ঘুরে, না তাকিয়েই অমৃত বলল।

"তুমি যদি আমাকে এতই ভালবাসতে, চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হতে দিলে কেন? তুমি আমাকে বাধা দিলে না কেন?"

অমৃত আবার না তাকিয়ে বলে—"তোমার মতো একটি মেয়েকে ততখানি মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি।"

"তোমার ভালবাসার তেমন কোনো শক্তি ছিল না তাহলে?"

অমৃত ঘুরে গায়ত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল।

"তোমার মুখে আমার প্রেমের সমালোচনা শোনার আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই গায়ত্রী।" একটু থেমে অমৃত আবার বলে—"বাসনাকে আমি ভাল করে তুলব। তুমি চিন্তা করো না, তার বিনিময়ে তোমাকে কিছু ত্যাগ করতে হবে না, তা আমি চাই না। আমি ডাক্তারই, আমাকে মানুষ বলে না ধরলেও তোমার চলবে।"

গায়ত্রী অনুভব করল অমৃতের কথার মধ্যে কি একটা অকথিত দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু সে বেদনায় সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা আজ নেহাৎই অপচেষ্টা হবে।

"আরেকটু বসো, ভাত খেয়ে যাবে।"

"কিন্তু তুমি তো মানুষ নও, ডাক্তার মাত্র।"

"ভাত যদি নাও খাও তবে এমনি বসো। বহুদিন আমি কারো সঙ্গে গল্প করিনি।"

আমার সঙ্গে এখন তুমি গল্প করছো না, আমাকে গালি পাড়ছো।"

"যে সত্য কথাগুলো শুনতে ভাল লাগে না, সেগুলোকে আমারও গালিগালাজ বলে মনে হয়। যাই হোক, এসো তোমাকে আমার বাড়িটা দেখাই। আজ পর্যন্ত বাইরের কেউ আমার বাড়িতে ঢোকে নি।"

কোনো কথা না বলে অমৃতের পিছু পিছু গায়ত্রী এঘর থেকে ওঘরে গেল।

"তুমি মাত্র একটা মানুষ। এত বড় বাড়ি আর এতগুলো ঘর কেন তৈরি করিয়েছো অমৃতদা?"

"মানুষের একটি মাত্র মনের মধ্যে অনেকগুলো কুঠির থাকে। একটা বাড়ির মধ্যে অনেকগুলো ঘর থাকলে তাতে কোনো দোষ নেই।"

দুজনে একতালার মেঝেতে নামল।

"বাড়িটার নাম 'Retreat' দিলে কেন?"

"শেষ পর্যন্ত এখানেই তো ফিরে এলাম।"

"কিন্তু এখানেই কি চিরদিন থাকবে?" তারা বাইরে প্রাঙ্গণের সামনে এসে দাঁড়ায়।

"এই যে—এই ঘরের সামনে কি সাইনবোর্ড এটা?"

"পড়ে দেখো।"

গায়ত্রী পড়ল। 'No admission for angels and women'। "কি যে ছেলেমানুষি করো। দেবদূতকে আসতে দেবে না, মেয়েদের আসতে দেবে না, তবে কে আসবে?" অমৃত হাসে—"angel আর woman-এর জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ কেন করেছি জান? দুয়েরই পাখনা রয়েছে। উড়ে যাওয়া জীবের জন্য ঘর সাজানোর কোন অর্থ হয় না। অ, অনেক রাত হল। ভাত যদি না খাবে, তবে এখন যাওয়া উচিত গায়ত্রী।"

গায়ত্রী বলল—"এবার যাবো। এই সাইনবোর্ডটি খুলে ফেলবে।"

"কেন?"

"woman তো ঢুকেই গেল। কোনো দিন হয়তো দেবদূতও ঢুকে পড়বে।"

"অন্য angel আসবে না, যমদূত এলেও আসতে পারে। কিন্তু নারীর চাইতে যমদূত কখনও বেশি মারাত্মক নয়।"

গায়ত্রী চলে যাওয়ার পর অমৃত ভাবল শেষ পর্যন্ত গায়ত্রীই জয়ী হল নাকি? গায়ত্রী ভেবেছে নাকি যে এখনও আমি তাকেই ভালবাসি?

"যদি তা ভেবে থাকো, তবে ভুল ভেবেছ গায়ত্রী। অমৃত কখনও নিজের ব্যক্তিত্বের বিনিময়ে একটি অস্থিরচিত্ত মেয়েকে ভালবেসে দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।

মেয়েরা পুরুষের ভালবাসাকে দুর্বলতা ভেবে আনন্দ পায়। যেন তদের ভালবাসা না পেলে পুরুষের জীবনই উচ্ছন্নে যায়। খারাপ ভেবো না গায়ত্রী, অমৃত এত দুর্বল নয়। এক দিন ভালবেসেছিল বলেই অমৃত আজ রঞ্জিতের অঙ্কশায়িনী তিনটি ছেলেমেয়ের মা প্রগল্‌ভা গায়ত্রীর জন্য অন্তরে কোনো দুর্বলতা অনুভব করে না।

গায়ত্রী আজ আমার কাছে এল, আমার শক্তি আর প্রতিভার কাছে আত্মসমর্পণ করল, কিন্তু সবই নিজের মেয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য, অতীত প্রেমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নয়। বাসনা না বাঁচলে রঞ্জিত আর তার দুজনের জীবনই দুঃসহ হয়ে উঠবে—তাই আজ অমৃতকে তাদের প্রয়োজন।

অন্য সব কথা অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর মাত্র।

কিন্তু বাসনাকে নিয়ে রঞ্জিত আর গায়ত্রী সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করবে, তাতে আমার কি লাভ হবে? গায়ত্রীর সুখ নিঃসঙ্গ অমৃতের প্রাণে কি নূতন আলোর বার্তা বয়ে আনবে?

যে স্বার্থে গায়ত্রী একদিন আমার ভালবাসাকে দলে পিষে রঞ্জিতকে বরণ করেছিল, সেই একই স্বার্থে গায়ত্রী আজ তার সন্তানের জীবন কামনায় আমার কাছে এসেছে। একটা অতি সাধারণ প্রাণীর মতো স্বার্থপর এই গায়ত্রী।"

না ভাবার চেষ্টা করেও অমৃত গায়ত্রীর কথাই ভাবতে থাকে। যতই ভাবছে, ততই গায়ত্রীর উপর তার রাগ হতে লাগল। গায়ত্রী স্বার্থপর, গায়ত্রী প্রবঞ্চক, গায়ত্রী বিশ্বাসঘাতক। একটা সুযোগ পেয়ে যদি অমৃত গায়ত্রীর উপর প্রতিশোধ নেয় কোনো অন্যায় হয় না। আমার সঙ্গে যে নীচ ব্যবহার করে, আমার উচিত নীচ ব্যবহার করে তার প্রতিশোধ নেওয়া।

অমৃতের ঘুম এল অনেক রাত করে।

কদিন পার হয়ে গেল। গায়ত্রী প্রত্যেক দিনই বিকালে আসে, আর বাসনার খবর নিয়ে ফিরে যায়। কখনও কখনও অমৃতের সঙ্গে কথাও হয়, কিন্তু দুজনে দুজনকেই মূলতঃ এড়িয়ে চলতে চায়। আর কথাবার্তা হলেও দুজনই সংযত থাকে, যাতে তর্কের সৃষ্টি না হয়।

এই কদিন অমৃত অবশ্য গায়ত্রীকে আঘাত করার সুযোগ খোঁজেনি যে এমন নয়, কিন্তু গায়ত্রী তা বুঝতে পেরেই বোধহয় সে সুযোগ দেয় নি।

বাসনার ব্যাধিটি দুরারোগ্য। একটি চার বছরের মেয়ের এমন অসুখ কি করে হল, অমৃত ভাল বুঝতে পারে নি। কিন্তু ব্যাধিটি দুরারোগ্য বলেই অমৃতের উৎসাহ বেশি। অন্য ডাক্তাররা যেখানে পরাজিত, অমৃত সেখানেই নিজের দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। গায়ত্রী তখন বুঝবে, বিশল্যকরণীর অধিকারী কে, সে না রঞ্জিত।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল।

বাসনার অবস্থার চোখে দেখার মতো কোনো পরিবর্তন হয় নি। অমৃত একটু দ্বিধায় পড়ল। রোগ চিনতে ভুল হয়নি তো। নিশ্চয়ই হয় নি—সময় লাগবে—হয়তো দুমাস, তিনমাস বা তার চাইতেও বেশি। কিন্তু বাসনাকে অমৃত সুস্থ করে তুলবেই। নইলে গায়ত্রীকে সে যেভাবে পরাজিত করতে চাইছে, সেটা হবে না। বাসনাকে বাঁচিয়ে তুলে গায়ত্রীকে সে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ করে রাখবে—সেটাই হবে তার চরম জয়।

অমৃত আশা করেনি—গায়ত্রী হঠাৎ ঢুকে পড়ল তার ঘরে।—"অমৃতদা আছো।"

—"বসো গায়ত্রী।"

গায়ত্রী বসল। অমৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—"বাসনাকে কেমন দেখছো? একটু ভাল বলে মনে হচ্ছে যেন।"

অমৃত আস্তে করে বলে—"বাসনা খুব ধীরে ধীরে ভাল হবে। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।"

গায়ত্রী চুপ করে রইল।

অমৃত আবার বলল—"রঞ্জিতের চিঠি পেয়েছ?"

"পেয়েছি। তাঁর শরীর বেশি ভাল নয়। আমাকে যেতে বলেছে।"

"তাহলে তোমার যাওয়াই উচিত গায়ত্রী। এখানে বাসনাকে চোখে দেখা ছাড়া তো তোমার করার কিছু নেই। তুমি না থাকলে রঞ্জিতের নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে, নয় কি?"

গায়ত্রী কোনো কথা বলল না।

অমৃত একটা সিগারেট জ্বালিয়ে গায়ত্রীর দিকে তাকাল। গায়ত্রীর চোখ মুখ আগের মতোই সুন্দর রয়েছে।

অমৃত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

"অমৃতদা, যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি।" অমৃত গায়ত্রীর দিকে তাকায়।

"এতদিন শুধু বাসনাকে দেখতেই আসি নি, তোমাকে দেখার ইচ্ছা হত বলেও এসেছি। আমি বুঝেছি যে তোমার এই নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে তুমি সুখী নও একটুও, হয়তো তার জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু এখন তোমাকে সুখী করার কোনো উপায় আমার হাতে নেই। শুধু সিগারেট ফুঁকে আর রোগীর সঙ্গে থেকে মানুষ সুখী হতে পারে না।"

অমৃত বলল—"আমি যে জীবনে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি, তোমাকে সে কথা কে বলল?"

"আগে আমাকে শেষ করতে দাও। আমি তোমাকে জানি। সুখ চায় না এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় নি। আমার উপর রাগ করে তুমি নিঃসঙ্গ অসুখী হয়ে গোটা জীবন কাটিয়ে দেবে, এর কি কোনো অর্থ হয়?"

"আর কিছু বলবে?"

"আজ তোমার সব কিছু রয়েছে—ধন ঐশ্বর্য খ্যাতি যশ ঘরবাড়ি আর অটুট স্বাস্থ্য। তোমার এই বিরাট বাড়িতে একটি মেয়ের জায়গা হওয়ার ব্যাপারে তোমার অসম্মতির কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি।"

অমৃত হাসল না। গায়ত্রীর মুখে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল—"আমি কি কখনও বলেছি যে আমি বিয়ে করব না? বিয়ে করার জন্যই তো ঘর বাড়ি বানিয়েছি। আর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অন্যের পরামর্শ ছাড়াও আমি পারব।"

গায়ত্রীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, অমৃত গায়ত্রীকে একটা কানাকড়ির মূল্যও দেয় না। গায়ত্রীর কথা মনে করেই যে অমৃত বিয়ে করেনি তা না। অমৃতের জীবনে গায়ত্রীর স্থান কোথাও নেই। অমৃত তাকে একেবারেই ভুলে গেছে।

গায়ত্রী দেখল ডাক্তার অমৃত ফুকন তার একেবারেই অপরিচিত একজন মানুষ। ডাক্তারের বাড়ির ভেতরে সে একেবারেই অবাঞ্ছিত অতিথি।

সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে গায়ত্রীর ইচ্ছা হল। কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে গায়ত্রী ধীরে ধীরে বলল—"তোমার কথা শুনে ভাল লাগল। আমি তোমার সম্পর্কে অন্যরকম ভেবেছিলাম।"

অমৃত বলল—"এখন বোধহয় বাসনাকে দেখতে না এলেও চলবে, রঞ্জিত যেতে বলেছে, পারলে সেখানেই চলে যাও।"

"যাব, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কিন্তু তুমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইছ সে কে, কোথাকার?"

একটু হাসার চেষ্টা করে অমৃত বলল—"অরুণা নামে আমার হাসপাতালে একটি নার্স আছে—মেয়েটি বোধহয় খারাপ নয়।"

গায়ত্রীর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

ডাক্তার অমৃত ফুকন একজন সামান্য নার্সকে বিয়ে করবে? পাগল নাকি? কোনোক্রমে আত্মসম্বরণ করে বলল—"কবে বিয়ে হবে?"

"সে কথাটা অরুণা এখনও বলতে পারছে না। কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। যদি ইতিমধ্যে অরুণা আর কারো সঙ্গে পালিয়ে না যায়, তবে আগামী বছর নাগাদ বিয়েটা হয়ে যাবে।"

এবারে গায়ত্রীর আর কিছু বলার ছিল না। তার প্রতি প্রতিশোধ নিতেই এই সমস্ত ব্যবস্থা হচ্ছে গায়ত্রী ভাবল।

করুণ হাসি হেসে গায়ত্রী বলল—"যেখানে আমার জায়গা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে একজন নার্সকে জায়গা দিতে তুমি পারবে, অমৃতদা?"

"তুমি যা পারলে সেটা আমি পারব না বলে ভাবলে কি করে? অরুণার কি যেন একটা দুর্নাম হয়েছিল; বাড়ি আর সমাজ থেকে তাড়া খেয়ে নার্স হয়েছে, নার্সরা ভাল না খারাপ মানুষ, সে বিচার অন্যেরা করবে। কিন্তু আমার বাড়ির একটা ঘরে যদি সে জায়গা করে নিতে চায়, আমি দরজা বন্ধ করে দেওয়ার কোনো কারণ দেখি না।"

"তা হলে Angel আর Woman-এর জায়গা হবে না বলে সাইনবোর্ডটা কেন টাঙালে?"

"A nurse is neither an angel nor a woman"—হেসে অমৃত বলল।

অমৃত গায়ত্রীকে গেটের সামনে পর্যন্ত এগিয়ে দিল। অরুণা নামে কোনো নার্সকে অমৃত চেনে না। কিন্তু গায়ত্রীকে আঘাত দেওয়ার জন্য একটা মিথ্যা কথা সাজিয়ে বলায় কোনো দোষ হওয়ার কথা নয়—অমৃত ভাবল।

গায়ত্রী হয়তো আশা করেছিল যে তার কথা স্মরণ করে অমৃত চিরদিন অবিবাহিত থেকে যাবে, বিরহী হয়ে দুঃখ বেদনায় জীবন কাটাবে, আর একদিনের জন্য হলেও গায়ত্রীকে সাদর আহ্বান জানাবে—"আজ রাতটি তুমি এখানেই থেকে

যাও গায়ত্রী। কিছু কথা তোমায় বলার আছে।" কিন্তু অমৃত নিজে গায়ত্রীকে এনে গেট পার করে দিয়ে গেল।

বিদায় নেওয়ার সময়ে শুধু বলল—"বাসনার জন্য চিন্তা করবে না। তুমি শিলং যেতে পার। বাসনা কেমন রয়েছে রঞ্জিতকে চিঠি দিয়ে আমি জানিয়ে দেব।"

চরম অপমানিত হয়ে গায়ত্রী বেরিয়ে এল।

অমৃত আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—গায়ত্রীর মতো একটি মেয়ের এমনি ব্যবহারই পাওয়া উচিত। কথাটা ভেবে অমৃতের আরাম হল।

অমৃত অনেকক্ষণ বাড়ির সামনের লনে পায়চারি করল। আকাশে কিছু নিষ্প্রভ তারা। নির্জন রাতের একটি মোহনীয় আবেগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু অমৃতের মনটি শান্ত হল না। হয়তো কাল কিংবা পরশু গায়ত্রী শিলং চলে যাবে—রঞ্জিতের কাছে। আজ যে অপমান আর আঘাত গায়ত্রী নিয়ে গেল, রঞ্জিতদের দাম্পত্য সুখে তার কোনো স্পর্শ লাগবে না। শিলং গিয়েই গায়ত্রী সব ভুলে যাবে আর রঞ্জিতের বুকে মুখ লুকিয়ে বলবে,—"বাসনা যদি ভাল না হয়, মন খারাপ করো না। বাসনার অভাব পুরণের জন্য আজ রাতেই আমরা নূতন অতিথিকে আহ্বান করি, এসো।"

অমৃতের অকারণে আবার মাথাটা চড়ে গেল। গায়ত্রীর কাছে বাসনার চাইতেও রঞ্জিত বেশি আপন। বাসনা যদি নাও বাঁচে, তবুও গায়ত্রী রঞ্জিতকে একই ভাবে ভালবেসে যাবে। গায়ত্রীর জগতে অমৃত ডাক্তারের কোনো জায়গা নেই। গায়ত্রীর মতো স্বার্থপর একটি মেয়ে অমৃতের সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত হৃদয়ানুভূতিকে অপমান করে চলে গেল, আর বড় দরের বদান্য ভদ্রলোকের মতো সে নিজের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি পারদর্শিতা খাটিয়ে সেই গায়ত্রীর মেয়ের জীবন ফিরিয়ে আনার সাধনা করছে?

"গায়ত্রী কি ভাববে আমাকে। যে অমৃতকে আমি প্রকাশ্যে অপমান করলাম, সেই অমৃত আজ টাকার জন্য আমার মেয়েকে চিকিৎসা করতে রাজী হয়ে গেল। গায়ত্রী ভাববে আমি অমানুষ, আমি অপমান গায়ে মাখি না। আমার আত্মসম্মান বোধ নেই, আমি মানুষই নই। আমি একটা ট্যাক্সির মতো, যে ভাড়া দেবে তাকেই তুলে নিয়ে যেখানে যেতে চায় সেখানেই নিয়ে যাব। আমার নিজস্ব কোনো মতামত নেই।

না, বাসনার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে আমি খুব বড় ভুল করেছি। গায়ত্রী আর রঞ্জিতকে ফেরৎ পাঠানো উচিত ছিল, তাহলে গায়ত্রী বুঝতে যে অমৃত ডাক্তার ট্যাক্সি গাড়ি নয়, তার ব্যক্তিত্ব রয়েছে। বড় ভুল হয়ে গেল। আমার বিদ্যাবুদ্ধি গায়ত্রীর স্বার্থে খাটানো মানেই হচ্ছে নিজের ব্যক্তিত্বের অবমাননা করা।"

যত ভাবতে লাগল ততই অমৃতের ধিক্কার জন্মাল। নিজের উপর অকারণ

রাগ হতে লাগল। অসহিষ্ণুভাবে সে পায়চারি শুরু করল। কিন্তু কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না।

অমৃত সিগারেটের পর সিগারেট পোড়াল, একটু শিস্ দেওয়ার চেষ্টা করল, মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়াল, কয়েক বার জোরে জোরে পায়চারি করল। কিন্তু অশান্ত মনটি ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল।

অমৃত ভেতরে এসেছে দেখে খানসামা শুধালো, "ভাত দিয়ে দেব?"

ভাত খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না অমৃতের, তবু এমনি দু'এক গ্রাস মুখে তুলল। খেয়ে উঠে আবার সিগারেটের পর সিগারেট ওড়াতে লাগল। উপরে পাখা চলছে, তবুও অমৃতের গরম বোধ হল।

অমৃত আবার বাইরে এল।

চারদিক নীরব। অমৃতের চারধারের সব মানুষ শুয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বাড়িতেই বাতি নিভে গেছে, দূরে দূরে দুটো একটা এখনও জ্বলছে। আর জ্বলছে রোগীদের কামরার কম আলোর বাতিগুলো। অমৃত ধীরে ধীরে রোগীদের কামরার মধ্যে ঢুকল। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

দারোয়ান সেলাম দিয়ে অমৃতকে রাস্তা ছেড়ে দিল। নার্স একজন ডিউটিতে ছিল, সে এত রাতে ডাক্তারকে আসতে দেখে বিস্মিত হল। প্রায় সব রোগীই নিঃশব্দে শুয়ে আছে, দু'-চার জন হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছে। রোগীরা সবাই ছোট ছেলেমেয়ে। খুব সন্তর্পণে পা ফেলছিল অমৃত, রোগীদের শান্তির যাতে ব্যাঘাত না হয়। ঘুমটা রোগীদের সব চাইতে বড় ঔষধ। অমৃত এক এক করে রোগীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। নার্সটি একটু বিব্রত বোধ করল, কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। অমৃতের পিছু পিছু সেও চলল।

অমৃত বাসনার ঘরটিতে ঢুকল। নার্সও সঙ্গে রয়েছে—কারো মুখে কোনো কথা নেই। পায়ের কোনো শব্দও নেই। শুধু মাত্র রোগীদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ রাতের নীরবতাকে একটু কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। অমৃত এসে বাসনার সামনে দাঁড়াল। ধপ্‌ধপে সাদা বিছানা, তার উপর চার বছরের অসুস্থ বিবর্ণ একটি মেয়ে শুয়ে আছে। তার ঘুম আসে নি, ছটফট করছে। নার্স কাছে এসে মশারিটি তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অমৃত কয়েক মিনিট খুব মনোযোগ দিয়ে বাসনার মুখখানা দেখল। বাসনার মুখে শুধু গায়ত্রী নয় রঞ্জিতের চেহারারও স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। এটি একটি ছোট গায়ত্রী। সে সুস্থ হয়ে উঠবে। বড় হয়ে একজন নূতন গায়ত্রী হবে, আর অন্য কোনো অমৃতকে বঞ্চনা করে অন্য কোনো রঞ্জিতকে নিজের করে নেবে। আরো কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অমৃত ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে এল। নার্স মশারিটা আবার ভাল করে গুঁজে দিল।

বাসনা আগের চাইতে ভাল আছে। ঘুম যদিও আসেনি, তবুও বাসনা নীরব রয়েছে। আগের মতো চিৎকার করছে না। বাসনা ভাল হয়ে যাবে।

অমৃত বারন্দায় এল। সঙ্গে নার্সটিও এল।

"নার্স—"

"স্যার?"

"বাসনা—মানে এই মেয়েটি কিছু খেয়েছে?"

"একটু বার্লি খেয়েছে স্যার। খেতে চায় না।"

"ঠিক আছে, তুমি অন্য রোগীর কাছে যাও। ওকে আমি একটু অবজার্ভ করব।"

"এখনই, স্যার?"

"হ্যাঁ, তুমি রেষ্ট নিতে পারো। আমি কিছুক্ষণ থাকব।"

"আমার ডিউটি আজ রাতে স্যার।"

"ঠিক আছে, আমার সঙ্গে থাকতে হবে না। তুমি ওয়ার্ডে যাও।"

'গুড-নাইট' বলে নার্সটি আস্তে আস্তে চলে গেল।

একটু পরে কি ভেবে অমৃত বারন্দায় এসে দাঁড়াল। তারপর ক্লিনিকের লেবরোটারিতে ঢুকল। লেবরোটারির একটা কোণায় দামী ওষুধের আলমারিগুলো সাজানো রয়েছে। এটা স্টক রুম।

অমৃত কামরাটির দরজা সন্তর্পণে বন্ধ করে দিল। তারপর আলমারিতে রাখা ওষুধের বোতল ও প্যাকেটগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল। একটা আলমারির উপর নেবেল দেওয়া, poison—বিষ। আলমারিটির সামনে অমৃত একটুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর চাবির গুচ্ছ থেকে একটা চাবি খুঁজে বের করল।

বোতলটি হাতে নিয়ে অমৃত চারপাশে তাকাল—কেউ কোথাও নেই। দুপুর রাত, নিস্তব্ধ পৃথিবী, মাথার উপর আলো জ্বলছে, তার আলোতে মেঝের উপর অমৃত নিজের ছায়াটি দেখল—ছায়াটি বড় ছোট দেখাচ্ছে।

টেবিলের কাছের টুলটার উপর সে বসল, আর poison লেখা বোতলটা রাখল টেবিলের উপর।

"এমনি একটা রাতে বাসনার মা গায়ত্রী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রঞ্জিতের বুকে আশ্রয় নিয়েছিল, আর তারই জীবন্ত সাক্ষী বাসনা। আমিও বিশ্বাস-ঘাতকতা করব। রঞ্জিত গায়ত্রীর মিলনের জীবন্ত সাক্ষী বাসনার প্রাণ আমার হাতের মুঠোয়। গায়ত্রী তুমি শান্তিতে নিদ্রা যাও। রঞ্জিত তুমি শান্তিতে নিদ্রা যাও। আমি বাসনার চির শান্তির ব্যবস্থা করছি। গায়ত্রী একবার বুঝুক যে আমি ভাড়াটে ট্যাক্সি নই, আমি মানুষ—অপমানের প্রতিশোধ আমি নিতে জানি।

পাপ হবে নাকি।

কিন্তু বেঁচে থাকলে বাসনা যে আমার মতো কারোকে প্রতারণা করবে না তার

কি নিশ্চয়তা আছে? আর পাপ হলে হবে—গায়ত্রীর দর্পচূর্ণ করার জন্য এ কাজ আমাকে করতেই হবে।

গায়ত্রী কাল বাসনার প্রাণহীন দেহ কোলে নিয়ে উছাল-পাথাল হয়ে কাঁদবে। রঞ্জিত চলে আসবে—আর আমি প্রাণ ভরে মজা দেখব।"

অমৃত উঠে দাঁড়ায়, আর তার হাতে বিষের বোতল।

"মাত্র ছোট দুটো ফোঁটা। তাই যথেষ্ট হবে বাসনার জন্য। খাওয়ার ওষুধের সঙ্গে দুটো ফোঁটা মিশিয়ে দেবো। আর তা মুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাসনার জিহ্বা জড়িয়ে যাবে।

পোস্টমর্টেম হয়তো হবে। কিন্তু কারো ধরার শক্তি নেই। অমৃত ডাক্তারের প্রেসকৃপশনে ভুল ধরার মানুষ এখনও জন্মায় নি।"

দরজা জানালা বন্ধ কোঠায় অমৃতের বড় গরম বোধ হল। নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার যোগাড়। দরজা খুলে অমৃত দ্রুত বেরিয়ে আসে। বাইরের পৃথিবী এখন আগের চাইতেও বেশি নির্জীব। তারাগুলোও বেশি নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে।

অমৃত বাইরে তাকাল। আকাশ যেন অনেকখানি দূরে সরে গেছে। হালকা হাওয়া বইছে। কোথা থেকে যেন অন্ধকারগুলো ঘনবদ্ধ হয়ে দূরের বাতির আলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বিষের বোতলটি অমৃত জোরে চেপে ধরে বাসনার কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। বোতলটি হাতে নিয়েই এগিয়ে গেল বাসনার বিছানার কাছে। ছোট টেবিলটির উপর বাসনার ওষুধের বোতল, পেয়ালা, চামচ, একটা থার্মোমিটার নীরবে পড়ে রয়েছে।

অমৃত চারদিকে তাকাল, জানালা খোলা রয়েছে, কিন্তু হালকা পর্দার ওপাশে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

"উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। আমি কেন বেঁচে আছি? কার জন্য বেঁচে আছি? পৃথিবীর চেনা অচেনা রোগীদের সুস্থ করার জন্য? টাকার জন্য? শুধু টাকা রোজগারের জন্যই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে কি? কি সহজ আর সাধারণ এই 'টাকা করা' কথাটা।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের এত আগ্রহ কেন? আমার তো আজ বেঁচে থাকাই বিস্বাদ লাগছে। কি অর্থ রয়েছে আমার মতো লক্ষ্যহীন একজন মানুষের বেঁচে থাকার? কি অর্থ আছে বাসনার মতো একটি মেয়ের বেঁচে থাকার?"

অমৃত আশ্চর্য বোধ করল যে আজ তার মরতে ইচ্ছা করছে। "বেঁচে থাকুক গায়ত্রী—বেঁচে থাকুক রঞ্জিত। কিন্তু বাসনা?"

টেবিলের উপর থেকে একটা ওষুধের বোতল অমৃত তুলে নিল আর নিজের অজান্তেই তার মুখটা খুলে ফেলল। "এ ওষুধের সঙ্গে দু'ফোঁটা বিষ মিশিয়ে দেবো।

ব্যস্‌, শেষ হয়ে যাবে বাসনার দুদিনের জীবনটা। গায়ত্রী আমার সমগ্র সত্ত্বাকে অপমান করার এই হল প্রতিফল।”

হঠাৎ অমৃত থেমে গেল।

“অমৃত ডাক্তার। অমৃত মানুষ নয়, সে ডাক্তার। আমি ডাক্তার। রোগীকে জীবন দেওয়া আমার কাজ। মরণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা আমার ধর্ম। আমি ডাক্তার। বাসনা গায়ত্রীর মেয়ে নয়, বাসনা রোগী। ডাক্তার অমৃত মানবশিশু বাসনাকে জীবন দান করবে। এই দান কী মহৎ!

ডাক্তার অমৃতকে গায়ত্রী অপমান করেনি, করা সম্ভব নয়। ডাক্তার অমৃত কোনো গায়ত্রীকে চেনে না—সে শুধু চেনে বাসনাকে। ডাক্তার মানুষ নয়, ডাক্তারের শত্রুমিত্র, আপনার কিছু নেই।”

নীরবে দরজাটা খুলে নার্স এসে ঢুকল। বাসনার বিছানার কাছে দুটো বোতল হাতে নিয়ে ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে দেখে নার্স একটু অবাক হল।

অবোধ্য অবাক দৃষ্টিতে অমৃত নার্সের দিকে তাকাল। যেন সে তাকে চিনতে পারছে না।

অল্প ভয়ে ভয়ে নার্স ডাকল—“স্যার।”

“হু”—চেতনা যেন এইমাত্র ফিরে এল অমৃতের।

“বাসনাকে ওষুধ খাওয়ানোর সময় হল। চারবার খাওয়ানোর কথা।”

নার্স বাসনার বিছানার মশারিটা তোলে। বাসনা ঘুমায় নি। চোখ দুটো তুলে সে তাকাল। পাতিহাঁসের চোখের মতো সরু, নিস্তেজ চক্ষু।

অমৃতের ইচ্ছা হল বাসনাকে একবার কাছ থেকে দেখে। সামান্য নীচু হয়ে সে বাসনার মুখের কাছে নিজের মুখটা নামাল।

বাসনা অমৃতকে চিনতে পারল।

ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে বলল—“মামা—মামা।”

অমৃতের গায়ের লোম পর্যন্ত শিউরে উঠল।

ওষুধের পেয়ালা আর চামচ হাতে নিয়ে নার্স বলল—“ওষুধের বোতলটা দিন স্যার, এক দাগ খাইয়ে দিই।”

নার্সের কথায় অমৃত চমকে ওঠে। ওষুধ কোথায়? সব বিষ হয়ে গেছে।

তীব্র অবোধ্য একটা চাহনিতে নার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে অমৃত বলল—“এ ওষুধটা আর খাওয়াতে হবে না, নার্স। কাল সকাল বেলা আমি বাসনার জন্য নূতন ঔষধ দেবো।”

পেয়ালা চামচ রেখে নার্স আবার অমৃতের দিকে তাকাল, তারপর মশারিটা ফেলে দিতে গেল।

“মশারিটা ফেলতে হবে না নার্স। তুমি যাও, আমি রয়েছি—”

কিছু না বলে নার্স কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসনার কপালে একটা হাত রেখে অমৃত ডাকল—"বাসনা।"

"মামা।"

মায়ের শেখানো সম্বোধন।

কিন্তু এতো স্নেহগভীর।

অমৃত অনেকক্ষণ ধরে বাসনার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর বোতল দুটো টেবিলে রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলল—'বাসনার সম্পূর্ণ ভাল হতে তিন চার মাস লাগবে। এই সময়টুকুর মধ্যে হয়তো বেঁচে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে।'

বাসনার মশারিটা ফেলে দিয়ে অমৃত বিছানার কাছ থেকে জানালার কাছে সরে আসে।

দূরে একটি তারা জ্বলজ্বল করছে, তার দিকে তাকিয়ে অমৃত নিজেকেই বলল—"অনেক রাত হয়েছে বোধহয়, এত নিঃঝুম লাগছে।"

বিষের বোতল দুটো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে অমৃত ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

হাসপাতালের রোগীদের অসহায় নিঃশ্বাসগুলি গভীর হয়ে মধ্যরাতের বুকে ভেঙে পড়ছে। সেই বাতাসে অমৃত অনুভব করল যে, জীবন একটা অক্ষয় প্রতিশ্রুতি। অমৃতের মনটা বড় হালকা বোধ হল। ❑

**বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য**

জন্ম 1924, যোরহাট। মৃত্যু 1997, গুয়াহাটি। যোরহাট সরকারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ; গুয়াহাটি কটন কলেজ থেকে বি.এস.সি. পাশ করে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পাশ করেন। শ্রীভট্টাচার্য কিছুদিন 'বাঁহী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন, অতঃপর আসামের বিখ্যাত পত্র 'রামধনু'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর সুদক্ষ সম্পাদনায় 'রামধনু' অসমীয়া সাহিত্যের যুগান্তকারী পত্রিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর চার বছর তিনি 'নবযুগ' নামক সংবাদ সাময়িকীর সম্পাদনা করার পর প্রথম অসমীয়া ফ্রিলেন্স সাংবাদিক রূপে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে গল্প সংকলন 'কলং আজিও বয়' ও 'সাতশরী' উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস 'রাজ পথে বিঙিয়ায়', 'আই', 'ইয়ারুইঙ্গম' (সাহিত্য আকাদমি দ্বারা পুরস্কৃত), নষ্টচন্দ্র, মৃত্যুঞ্জয়। শরৎচন্দ্র, হেমিংওয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা অনুবাদ করেছেন। সাহিত্য আকাদমির সভাপতি ছিলেন, সেই সূত্রে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

# কলং এখনও বয়

সোনার কলং রূপার কলং—স্রোতের তালে তালে নাচে। রূপের তরঙ্গভঙ্গে জ্যোৎস্নায় সে উচ্ছল, আঁধারে কৌতুকময়ী। পারের বালি-ঘাস আলোর স্পর্শে কখনও বা উত্তাল, হিমের স্পর্শে কখনও বা শীতল। এক পারে দূরের গ্রাম, তার আমন্ত্রণমুখর ঘরবাড়ি। তার পাশের গাছগাছালিতে সবুজের সমারোহ, হাজার বছর ধরেই তারা হাসছে। আরেক পারে কর্ম্মমুখর রাজপথ, নগরের অভিমুখে তার যাত্রা।

মধ্যিখানে কলং-এর জলধারা এঁকে-বেঁকে দ্রুত বয়ে যায়। সকাল সন্ধ্যা নদীর ঘাটে বিরামহীন কলরব। সকালে গাঁয়ের মানুষ কলং-এ গা ধোয়—সন্ধ্যায় আবার কলসী ভরার পালা। ভরদুপুরে অতীত যেন উতলা সুরে গেয়ে ওঠে—

মোর পারে পারে রাজসিংহাসন, হাজার বাহুর বল,
কলং-এর পারে কত দেবালয়, মানুষের গড়া ধন,
কলং-এর কালিয়া বর,
তাতেই রয়েছে গদাধর আর হাজার মানুষের ঘর
কলং এখনও বয়, অতীত পেছনে রয়।

বৃদ্ধ ঠগীরামের মনে বার বার ভাবের ঢেউ ওঠে, কলং এখনও বয়। ছোটবেলা থেকে আজ তিনকুড়ি আট বছর বয়স হল, এর মধ্যে কলং-এর নানা রূপ সে দেখেছে। এমন একটি দিন, এমন একটি মাস, এমন একটি বছর নেই, যেদিন

কলং-এর কথা একবার না একবার মনে পড়ে না। দুদিনের জন্য বাইরে গেলে ঘুরে ফিরেই মনে পড়বে ঘাটের কাছের বড় আদরের সেই পান সুপারির বাগানটির কথা। বাপঠাকুর্দা, নাতিপুতি, শ'খানেক আশেপাশের গ্রামের মানুষের নিত্যদিনের নিত্যকর্মের সঙ্গী কলং-এর সকাল সন্ধ্যার সেই জলরাশি। তার ফুরফুরে বাতাসের গা জুড়িয়ে যাওয়া স্নেহের পরশ। ভোরবেলা হাল নিয়ে যাওয়ার সময় গাঁয়ের পথে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কলং-এর হঠাৎ দেখা দেওয়া, তার মুচকি হাসিটি দিয়ে আবার জঙ্গলের আড়ালে চলে যাওয়া।

লাঙ্গল দিয়ে চষলে পরে মাটিতে রস নামে। তাতে যত্ন করে বীজ বোনা হয় আর কাতি বিহু (আশ্বিন সংক্রান্তি) এলে পর নূতন ধানের মঞ্জুরী বের হয়। কলং-পারের মাটিতে তখন অপরূপ সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। অঘ্রাণের বাতাসের ছন্দে লক্ষ্মী নাচেন। গাঁয়ের মানুষ লক্ষ্মীকে নিয়ে ভাঁড়ারে ভাঁড়ারে ঢোকায়। ঘরে ঘরে আনন্দ, নামঘরে নামঘরে আগুন পোহানো হয়, ভোজ হয়, মানুষের জীবন রঙে রসে ভরপুর হয়ে ওঠে। হাসি, নাচ, গানে ~~যুবক~~ ঠগীরামের দিন কেটেছে।

শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার গোটা জীবনটাই মিষ্টি স্মৃতিতে ভরপুর। কলং-এর পারের আম জাম কাঁঠালের আস্বাদে তার বরাবরই জিভে জল আসত। পান্তাভাত এক মুঠো খেয়ে গরু চরাতে যাওয়ার সময় সে দেখে নিত কার বাড়িতে আম পেকেছে, কার বাড়িতে জাম। মোষের পিঠে চেপে কখনও বা মোষ চরাত। কখনও বা বাবার সঙ্গে রেলগাড়িতে নগাঁও শহরে যেত। কখনও বা—

শৈশব তেমনি পার হয়ে গেল। তারপরে কলং-এর বন্যার মতো শরীরে যৌবনের বান এলো, দেহমন নূতন উৎসাহে সঞ্জীবিত। দা নিয়ে বাঁশবনে বাঁশ কাটতে গিয়েও শ্রান্ত হয়ে আপন মনে গান ধরত—

শপথ নিয়ে শুধি বলতো প্রাণেশ্বরী
তোমার নাগর হল কে?

শুধু বাঁশ কাটতেই বা কেন, গরু চরাতে যেতে, ভোরের আলো ফুটত না ফুটতেই ঘাটে গিয়ে ডুব দিতেই এমনিতেই কত গান যে মন থেকে উঠে এসে কণ্ঠে জায়গা করে নিত, আবার কত গান মনের মধ্যেই আকুলি বিকুলি খেয়ে থেমে যেতো। জোয়ান চেহারা সুঠাম শরীর সুস্থ সবল মুখের হাসি নিয়ে ঠগীরাম যেদিকে যেতো,. গাঁয়ের যুবতীদের মন কেড়ে নিত। জলের গাটে যুবতীদের মেলা বসত, সেখানে সোনপাহী পদুমীরা দিনের মধ্যে একবার তার দেখা পাবেই। কলং-কে সাক্ষী রেখে তারা সেখানে কাপড় বোনে, কোন্ ফুল তুলবে তা বাছে। বুনতে গিয়ে তাদের সুতো জট পাকিয়ে যায়।

কিন্তু ঠগীরাম জটপাকানো নীতিহীন যুবা নয়। দেখতে যেমন সুন্দর, মনটি তার তেমনি নির্মল। গাঁয়ের যে মেয়েটিকে সব চাইতে চোখে পড়ে, সেই মেয়েটিকে

জালে আটকাতে তার মন চাইছে। তার নাম সোনপাহী। স্নানে, জল ভরতে আসতে যেতে সোনপাহীকে নির্জনে একা পেলেই ঠগীরাম হঠাৎ করে সামনে এসে হাজির হবে। কোনোদিন বা কলং-এর ঘাটে, কোনো দিন বা রাস্তার মোড়ে কখনও বা নাটঘরে। সোনপাহীকে সে নানাভাবে জ্বালাতন করে, ঠারেঠোরে নানাভাবে শুধাবে— "আচ্ছা সোনপাহী, এতো তাড়াহুড়ো করে কার কাছে যাচ্ছিস্। আমার সঙ্গে একটু কথা বলে যা তো।"

সোনপাহী রাগে মুখঝামটা দিয়ে বলে—"নির্লজ্জ কোথাকার, ভূতের মতো যেখানে পাবে, সেখানেই ধরবে।"

ঠগীরাম খিলখিলিয়ে হাসে—"শোন্ সোনপাহী, তোকে না দেখলে আমার দিনটাই খারাপ কাটে, বুঝলি না।"

"ইস্, কোথাকার ভূত একটা। ইয়ার্কির আর জায়গা পায় নি।" বলে রাগ লজ্জা অভিমান আর বোধহয় অবোধ্য একটা সতেজ আনন্দের মুচকি হাসি দিয়ে রঙ-বেরঙের আবেগের আবির ছড়িয়ে সোনপাহী ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে সরে যায়। ঠগীরাম অন্য রাস্তা ধরে, যাওয়ার সময়ে গান ধরে ঃ

"আধ শুক্না ধান কুটবি কখন, জালার সামনে উড়বে তুষ,
তোমায় খুঁজতে যেতাম যে প্রিয়ে, আমি দুঃখীর পুত।"

দিন যায়। সোনপাহী একদিন নদীর ঘাটে সত্যিই জিজ্ঞেস করে ফেলল ঃ "আচ্ছা রে ঠগী, তুই রাস্তাঘাটে সদা সর্বদা আমায় জ্বালাতন করিস, তুই কি সত্যিই আমায় বিয়ে করবি?"

ঠগী দুষ্টামি করে অভিমানের সুরে বলল—"ই, এসব কথা হচ্ছে। আরো কত বাহাদুর ছোকরার উপর তোর চোখ রয়েছে।"

"ধেৎ, গেসাঁইর শপথ, বল তো?"

"সত্যি বলছিস?" আশায় আশায় ঠগী শুধায়।

"কলং সাক্ষী।"

"করব"—সে ঝপ করে বলে বসে। আর বলেই নধর বাছুরের মতো আনন্দে লাফাতে লাফাতে সোনপাহীর চোখের আড়ালে কোথায় যেন পালিয়ে গেল।

দুমাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরও সে সোনপাহীকে রেহাই দেয় নি। নানা ছলে অন্দর মহলে ঢুকে সে সোনপাহীকে ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে গাইবে—

"চাউল ছিটা দিয়া পাখী বন্দী করি
শালে বন্দী করি হাতি
অন্দর ঘরেতে প্রিয়া বন্দী করি
দেহে বয় উজান ভাটি।"

রঙে রসে রাগে অনুরাগে মুখের আকাশে একই সঙ্গে মেঘরৌদ্রের খেলা চলে। ঠগীরাম মুক্ত আনন্দে হাততালি দিয়ে হাসে। তাদের সামনে যৌবন ছিল একটা খোলামেলা ব্যাপার, আনন্দ আর সম্ভোগের একটা বয়ে যাওয়া প্রবাহ। এক জন আরেক জনকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারত না।

এমনি আনন্দের জীবনের এক কুড়ি দশটা অগ্রহায়ণ ঠগীরাম পার হয়ে এল। জীবনের অর্ধেক চলে গেল। কলং-এর পারে হাজার ফুল তার স্নেহে, তার হাসিতে, তার চাউনিতে নাচে। তার রাগ হলে তারা অস্থির অধীর হয়ে ঝরে পড়ে। কলং-এর জলে ডুব দিয়ে সে নিত্যই আনন্দের স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কলং-এর রূপ বদলে গেল। তার বাড়ির উপর দিয়ে মরণের একটা ঝড় বয়ে গেল। তার বাবা, মা, বড়দা, আরো কজন মড়কে মরে গেল। কেবল এক বাড়িতে নয়, গাঁয়ের ঘরে ঘরে, পাশের গ্রামগুলিতে কলেরার মহামারীর কথা তারা শুনতে পেল। কলং-এর শীতল জল পরিণত হল বিষে, রাস্তাঘাট জনমানবহীন, ঘরে ঘরে শুধু দীর্ঘ বিলাপের ধ্বনি। ঠগীরাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে যতখানি পারে সাহায্য সহায়তা করে। শব নিয়ে শ্মশানে যাওয়া থেকে শহর থেকে ডাক্তার এনে ইঞ্জেকশন দেওয়ানো, সব ব্যবস্থা করতেই তাকে দেখা যায় সকলের আগেভাগে।

একদিন দূরের একটি গ্রাম থেকে শহরের ডাক্তার মণি বরাকে সঙ্গে নিয়ে কলং-এর পার বেয়ে ফিরতে ফিরতে ঠগীর বেশ দেরী হয়ে গেল। বাইরের ঘরে একখানা পাটিতে ডাক্তারকে বসতে দিয়ে ঠগী বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

"সোনপাহী।"

কারো জবাব পেল না।

"মালী, অ মালী।" বলে ছেলেকে ডাকল।

এবারো কোনো জবাব নেই।

কি হল? পিছনের উঠানে গিয়ে জোরে হাঁক দিল, "এই, কোথায় গেলে নাকি?"

বার দুয়েক চেঁচানোর পর কোন একদিক থেকে যেন সাড়া আসছে মনে হল। একটু পরে সে বুঝতে পারল সোনপাহীরই গলা। সোনপাহী যে মারা যায়নি, জীবিতই আছে, এতেই সে শান্তি পেল। ভেতরে চায়ের উনুনে আগুন ধরিয়ে সে মাটির প্রদীপ একটা নিয়ে এসে ডাক্তারের পরিচর্যায় বসল। ডাক্তারের খুব শ্রান্ত লাগছিল, তাই তিনি পাটির উপর বসেই ঢুলছিলেন। ঠগী ভাবল ডাক্তার-বাবু অনেক খেটেখুটে এসেছেন, একটু ঘুমাতে দেওয়া যাক। ভেবে নিয়ে সে সোনপাহীর খবরে দেউড়ির দিকে এগুলো। কিছুক্ষণ পরই সোনপাহী বেরিয়ে এলো।

সোনপাহীকে দেখে মনে হল যে ভয়ে ভাবনায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসই পড়ছে

না। ঠগীরাম স্নেহভরে জিজ্ঞেস করে—"কি হল তোর? এতটা বয়স হল, এখনও ভয় গেল না।" সন্ধ্যার অন্ধকারে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে গৌরবের হাসি হাসল।

কিন্তু সোনপাহী তাকে দেখে, "ওগো, কোথায় মরতে গিয়েছিলে", বলে জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। তাকে এ অবস্থায় দেখে ঠগী জিজ্ঞেস কলল—"কি হল?"

"কি আর হবে? মৌজাদারের পেয়াদা এসে আমাদের মণিপুরী হালের গরুজোড়া নিয়ে গেল।" সোনপাহী কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে থাকে।

"কখন এসেছিল পেয়াদা?"

"দুপুর বেলা।" সোনপাহী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ঠগীর তিড়িক করে রাগ উঠে গেল। কিন্তু কার উপর রাগ করবে সে স্থির করতে পারল না। গত দু'বছরের খাজনা দিতে পারেনি বলে মৌজাদার আগেই নোটিশ দিয়েছিল। আসলে পেয়াদা ক্রোক করতে আসতে পারে এমন আশংকা তার বরাবরই ছিল। শহরে গিয়ে কোনো মহাজনের বা উকীলের কাছ থেকে টাকা কিছু ধার করে আনবে, একথা সে ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু সেই সময়েই মহামারী লাগল।

এমন মহামারীর সময় যে মৌজাদারের পেয়াদা ক্রোক নিয়ে আসতে পারে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। মৌজাদার এতো নির্দয় হতে পারে না, সেও তো মানুষ। মানুষের জন্য তার প্রাণে কি এতটুকু মায়াদয়া নেই? কিন্তু তার আশা বিফল হল। তার ক্ষেতকৃষির আসল সম্বল হালের গরুজোড়াও মৌজাদারের মানুষ এসে নিয়ে গেল।

রাগে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দু'বছরের খাজনা ধরলে এক কুড়ি দশ টাকা হয়। তার জন্য হালের গরু নিয়ে যাবে মৌজাদার? কেন? সে বুঝতে পারে না যে কি যুক্তির বলে এমন ধারা আইন হয়। গরুজোড়াই নিয়ে গেল, ফলে তার ক্ষেত করার আসল সম্বলই চলে গেল। আরেক জোড়া গরু কেনার সাধ্য তার কি করে হবে?

সে চারদিকে অন্ধকার দেখল। মন বেদনায় পরিপূর্ণ। কলং-এর বাতাসে যেন দুঃখের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রদীপের শিখায় রান্নাঘরের মেঝে তেমন আলোকিত হয়নি। ডাক্তারবাবু শহরের মানুষ, কড়া আলোতে অভ্যস্ত, তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। তাতে কলেরা মহামারীতে গাঁয়ের সব মানুষই যেন মৃত্যু-লক্ষণাক্রান্ত। সন্ধ্যের পর ধীরে ধীরে যখন রাত্রি নামছিল, একটা বিষাদের সুর যেন তার সঙ্গে মাত্রা রেখে বিস্তৃত হচ্ছিল। গাঁয়ের পাখির কিচিমিচি, দূর থেকে ভেসে আসা কাদের যেন আর্তনাদ, শেয়ালের চিৎকার—সবকিছু মিলেমিশে যেন একটা অনন্তক্রন্দনে পরিণত হচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর তাই মনে হল।

ভাতের গ্রাস মুখে নিয়ে ঠগীরাম বলল—"বুঝলেন ডাক্তারবাবু, আজ বড় রকমের একটা অঘটন ঘটে গেল।"

ডাক্তার ভাবলেন বোধহয় কোনো কলেরা রোগীর কথা বলছে, তাই স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হল?"

ঠগীরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার মণিপুরী গরুজোড়া নিয়ে যাওয়ার সকরুণ কাহিনীটি বলল। ক্ষেতের উপার্জন দিয়ে গত বছর সে গরুজোড়া কিনেছিল। সতেজ নধর গরু, বয়স কম, তাই সে গাঁয়ের একজনের কাছে ধার নিয়ে তিনকুড়ি টাকা দিয়ে হালজোড়া কিনেছিল। কিন্তু কি যে হল, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে পারল না। বরঞ্চ গত বছরের ধানবেচা টাকা সুদ দিতেই চলে গেল। ফলে রাজার খাজনা দু'বছর বাকী পড়ে গেল। মৌজাদার বার বার পেয়াদা পাঠাল, শেষ পর্যন্ত মাস-খানেক আগে ক্রোকের নোটিশ পাঠিয়েছিল। তারপরই এই দুর্ঘটনা। সঙ্গে মৌজা-দারের নির্দয়তার বিষয়ে দুচার কথা বলে সে তার কাহিনী শেষ করল।

ডাক্তার ঠগীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "এখন টাকা পেলে গরুজোড়া ছাড়িয়ে আনতে পারবে না?"

ঠগী আশ্চর্য হল। তবু বলল, "পারব। না পারলে নিলামে কিনে নেব।"

"তাহলে আমি টাকা দেব", বলে ডাক্তার খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে গেলেন। ঠগীরাম আরো আশ্চর্য হল।...গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার দিন ডাক্তার ঠগীরামকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে গেলেন আর একশ টাকার নোট একটা দিয়ে ফেরৎ পাঠালেন।

ফিরে আসার সময়ে কলং-এর পারে সোনপাহীকে সে পেয়ে গেল, কলসে জল ভরছে সোনপাহী। নিমেষে তার অন্তর আনন্দে ভরে গেল।

* * *

কিন্তু আগের জীবন আর ঘুরে এল না। এক বছর মনের আনন্দে ক্ষেত করার পর হঠাৎ এল বন্যা। কলং-এর রূপ দেখে গ্রামের মানুষ ভয় পেল। বানের জল ঘর দুয়ার ডুবিয়ে দিল, ভাঁড়ারের ধান নষ্ট করল, গরু মোষ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মানুষের অন্তরে আবার নিরাশা।

ঠগীরামের ঘর জলে ডুবিয়ে দিল কিন্তু সে নিরাশ হল না। সোনপাহীদের নিয়ে উঁচু ডাঙায় গিয়ে উঠল। যাওয়ায় সময়ে গরুজোড়া কোনোক্রমে সঙ্গে নিয়ে গেল। শুকনা ডাঙা খুঁজে পেয়েই কাছের গাঁয়ে সে সাহায্য খুঁজল, আর বাঁশ বেত এনে একটা চালা তুলে দিল। বানপানিতে ভেসে আসা অন্যরাও তাকে দেখে উৎসাহ পেল, তারাও তেমনি চালা তুলে তাতে মাথা গুঁজল।

দিনে দিনে মানুষ বাড়তে লাগল, খাওয়া থাকা নিয়েই সমস্যা দেখা দিল। কলং-এর বন্যা তখনও কমেনি। আশে পাশের গ্রামের মানুষ যেটুকু পারল ধানচাল দিয়ে সাহায্য করল, কিন্তু এভাবে বেশিদিন যে চলবে না, তা বোঝা গেল।

পনেরো দিনের মাথায় দেখা গেল বন্যার জলের মধ্যে একখানা নৌকো আসছে। দেখামাত্রই জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে আগ্রহ ভরে নৌকাটিকে ডেকে আনল। ধীরে ধীরে নৌকা এসে কাছে ভিড়ল।

নৌকা থেকে নামলেন ডাক্তার মনি বরা আর কয়েকটি শহরের ছেলে। ডাক্তার ঠগীরামকে দেখেই বললেন—"আবার এলাম।"

ঠগীরাম তাড়াতাড়ি প্রণাম করে বলল—"চাল-ডাল কিছু এনেছেন নাকি?"

ডাক্তার উত্তর দিলেন, "এনেছি।"

মানুষের বুকে বল এল। ডাক্তার ঠগীরামকে জিজ্ঞেস করলেন—"কারু অসুখ বিসুখ হয়নি তো?"

"না, হয়নি।"

ডাক্তার একটু নিশ্চিন্ত হলেন। ছেলেকটিকে চাল বিলি করতে বলে, কে কতখানি পাবে সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার হঠাৎ বললেন—"একটু এসো তো ঠগীরাম, কথা আছে।"

বানে ভেসে আসা কিছু নলখাগড়া সরিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন—"এবার কলং বড় রোষ করেছে।"

ঠগীরাম মাথা নাড়াল। কংল-এর পারে তার দু'কুড়ি দশ বছর ধরে বসবাস। শুধু বাসই বা কেন, এই নদীর পারেই তার জীবনের সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। নদী পার হয়ে সে মাঝে মধ্যে শহরে যায়। কিন্তু শহরের কথা সে বোঝে না। সেখানকার চালচলন অন্যরকম। সেখানকার কথাবার্তায় প্যাঁচ থাকে, কলম থেকে বিষ বেরোয়। কলং-এর পারে ঘুরে না আসা পর্যন্ত সে প্রাণে শান্তি পায় না।

চিন্তার রেশটুকু ভেঙ্গে দিয়ে ডাক্তার বলতে থাকেন—"তোমাদের এই সুন্দর গ্রামটিতে প্রথমবার এসেই আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার আসব আসব করেও চৌদ্দ দিন দেরি হয়ে গেল। দেখছি, কলং এবার তোমাদের বড্ড ভোগাচ্ছে। আমার আসতেও বড় দেরি হল, কি করব বল।"

"কেন দেরি হল?" ঠগীরাম সরল ভাবে জিজ্ঞেস করে।

"সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে চাল-ডাল কাপড়পাতি কিছু যোগাড় করতে পারলাম না তাড়াতাড়ি। কি করব? এখানে কেউ মারা যায়নি তো?"

"না। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা দিল না কেন? আমাদের দুঃখের কথা তারা বোঝে না নাকি?"

"না, বোঝে না। তারা বিদেশী মানুষ, আমাদের দুঃখের কথা কি বুঝবে?"

ঠগী স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজাই যদি প্রজার কথা না বোঝে, তো কে বুঝবে? তার সন্দেহ গেল না—"এ সমস্ত চালডাল তাহলে আপনারা কোত্থেকে আনলেন?"

"বাড়িকে বাড়িতে, দোকানে দোকানে ঘুরে যোগাড় করেছি।"

"লোককে কি বলেছেন আমাদের কথা?" এই সরল প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার হাসলেন। তারপর বললেন—"তোমরা অনেক কথাই জান না। গাঁয়ের মানুষ শহরের কথা জানে না, আবার শহরের মানুষ জানে না গ্রামের কথা। কিন্তু একটা কথা জানবে, মানুষের দুঃখে মানুষ অন্তরে না কেঁদে পারে না।"

মানবতার এই বারতা পেয়ে ঠগীরামের বড় ভাল লাগল। দেশের মানুষ অন্ততঃ তাদের ত্যাগ করেনি।

ডাক্তার ইতিমধ্যে নদীর জলে ভেসে আসা একগোছা ভিজে খড় তুলে ধরে বললেন—"কার ঘর থেকে খসে এসেছে কে জানে?"

"না, এ খড় ঘর বাঁধার জন্য রাখা খড়। দেখলেই বোঝা যায়।" এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠগীর মনে পড়ল ঘর তোলার কষ্টের কথা। ক্ষেত থেকে খড় কেটে আনা থেকে আরম্ভ করে নূতন ঘর তোলা পর্যন্ত কত পরিশ্রম যায়, বলতে শুরু করলে তার শেষ নেই। নূতন করে ঘর তুলতে মানুষের আবার কত কষ্ট করতে হবে। বছর খানেক গ্রামের মানুষের তো অন্য কোনো কাজকর্মও থাকবে না। এমন কি ক্ষেত কৃষিও হবে না।

"ফসল"—বলে ঠগীরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ডাক্তার চমকে উঠলেন।

* * *

মহামারী হোক, বন্যা হোক, ফসল ফলুক না ফলুক, রাজার খাজনা দিতেই হবে। বন্যায় ভেসে ওঠা ভাঙ্গা ঘরের দরজার সামনে পেয়াদা গিয়ে হাজির হল। ক্রোকে কারো কানের ফুল, কারো ঘটিবাটি, কারো বা গরু ছাগল গেল, গ্রামগুলো ভিখারি হল। ঠগীরামের ছাড়িয়ে আনা মণিপুরী গরু আবার নিয়ে গেল। ঠগীরাম রাগে জ্বলে উঠল—"আমার বিপদের সময় একটা কুকুরও আসে না, খাজনা নেওয়ার সময় সাহেব থেকে পেয়াদা পর্যন্ত সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে।" এই বলে সে নিষ্ফল ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করে। মানুষ তার কথায় হয়তো সায় দিল, কিন্তু উপায় কি?

মনের দুঃখে ঠগীরাম একদিন ডাক্তারের ঘরে গেল। ডাক্তার মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শোওয়ার যোগাড় করছিলেন, বললেন—"কি হল ঠগীদাদা?"

ঠগীরাম সংক্ষেপে তাদের দুঃখের কথা বলল। ডাক্তার মন দিয়ে শুনলেন। তারপর হেসে বললেন—"বিদেশী রাজা যে, আমাদের দুঃখ বোঝে না।"

ঠগীরাম মনের দুঃখে বলে ফেলল—"এমন রাজার অধীনে থাকার চাইতে মরাই ভাল। গরু নেই মোষ নেই ক্ষেত করব কি দিয়ে? এমন কি বিহুর দিন মেয়েদের কানে পরার মতো ছোট্ট একটা কিছুও দেওয়ার উপায় নেই। একটু

অপেক্ষা করে সে বলল—"আমরা একেবারে মরে যাব ডাক্তারবাবু, আপনি কিছু একটা উপায় করুন।"

ডাক্তার কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"তোমরা একটা সভা কর। তাতে বুদরাম উকীলকে ডাকবে। আর তাতে তোমাদের অভাব অভিযোগের বিবরণ দিয়ে একটা প্রস্তাব নিয়ে সরকারের কাছে পাঠাও। এমনি কিছু একটা কর তো, কি হয় দেখা যাক।"

সেটা অসহযোগের সময়। চারদিকে সভা সমিতি হচ্ছে, কাগজেপত্রে নানা ধরনের অভাব অভিযোগের বিবরণ বেরুচ্ছে। ডাক্তারের মনে হল এ ধরনের কিছু একটা করলে হয় তো ফল হতে পারে। ঠগীরামকে তাই তিনি মনের কথা খুলে বললেন।

ঠগীরাম হাতে স্বর্গ পেল। "আপনাকেও যেতে হবে ডাক্তারবাবু, জানেনই তো আমি সহজ সরল মানুষ। না গেলে মানুষের শাপ লাগবে। সভার খবর আপনাকে আমি দিয়ে যাব।"

ডাক্তারের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

সভা হয়ে গেল। সরকারের কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হল। কিন্তু কিছুই হল না। মাত্র এইটুকু হল যে মৌজাদার ঠগীরামকে ডেকে এনে বলল, "তোর নাম সরকারের খাতায় উঠেছে। দিনকাল বড় খারাপ। শুনিসনি, দলে দলে মানুষকে ধরে নিয়ে জেলে ঢুকিয়ে রাখছে। খুব সাবধানে থাকবি।"

ঠগীরাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে—"আমাকে আবার জেলে নেবে কেন?"

"মিটিং করার জন্যে। স্বরাজের দাবীতে মিটিং করা নিষিদ্ধ।" মৌজাদার বলে।

"কেন কর্তা? আমরা তো খাজনার মিটিং করেছিলাম।"

মৌজাদার চোখ ঘুরিয়ে বলল—"খাজনার মিটিং আর স্বরাজের মিটিং একই, কোনো পার্থক্য নেই।"

ঠগীরাম ফিরে এল, কিন্তু আগের স্বাভাবিক ভাবটা তার চলে গেল। ক্ষেতকৃষি করতে না পারার দরুন গাঁয়ের মানুষের মনের মধ্যে ক্রুদ্ধ একটা বেদনার ঢেউ উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। রাজার বিরুদ্ধে শাপ-শাপান্ত করতে কারো আর বাধছে না। এ অবস্থায় ঠগীরাম তার কর্তব্য নিরুপণ করতে পারল না। যে দিকে তাকায় সেদিকেই অন্ধকার। কলং-এর দৌরাত্ম্যও কমে গেল। নদীতে আগের মতো স্রোত নেই। দুর্বল বাছুরের মতো সে যেন কোনোক্রমে চলছে।

ঘরে ঢুকে সে দেখল ডাক্তারবাবু ঘরে বসে একান্ত মনে কি একখানা কাগজ পড়ছেন, আর সোনপাহী বসে সুপারি কাটছে।

"আপনি? আপনি কখন এলেন।"

ডাক্তার ঠগীরামের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপর বললেন—"ঠগীদাদা,

খুব একটা বড় কাজ নিয়ে এসেছি। মুখ হাত ধুয়ে দুটো খেয়ে এসে বসো, তখন কথা বলব।"

শেষ রাত পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলল। স্বরাজের কথাবার্তা। উজান আসাম আর নিম্ন আসামের বিভিন্ন গ্রামে যে সমস্ত সভা শোভাযাত্রা হচ্ছে, ডাক্তার রূপকথার গল্পের মতো সেগুলো বর্ণনা দিলেন। পকেট থেকে ভারতের একটা ছোট্ট ম্যাপ বের করে খুঁজে খুঁজে নগাঁও বের করলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে গুয়াহাটি, কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, বোম্বাই আর মাদ্রাজের গাঁয়ে গাঁয়ে যে আন্দোলন চলছে, তার বিবরণ দিলেন। বর্ণনার শেষে গুয়াহাটি, যোরহাটের আন্দোলনেরও একটা সংক্ষিপ্ত আভাস দিলেন। তারপর ডাক্তার হেসে বললেন—

"এবারে আমাদের পালা। কলং পারের মানুষের।" এই বলে কলং-এর পারে পারে আঁকা কিছু রেখা দেখিয়ে বললেন—"কালিয়াবর থেকে নগাঁও, নগাঁও থেকে গুয়াহাটি।"

ঠগীরাম আশ্চর্য হল। সোনপাহী সামনে বসে কথাবার্তা শুনছিল। ছেলে মালীও কাছে বসে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখছিল। তারাও ডাক্তারের কথায় বিস্মিত হল।

"কি করতে হবে ডাক্তারবাবু?"

"শোভাযাত্রা। কালিয়াবরের যুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা সবাই ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে যাবে প্রথমে নগাঁও, তারপর নগাঁও থেকে গুয়াহাটি।" ডাক্তার বলে চলে—"নগাঁও-এ গোটা আসামের সব প্রজারা জমায়েত হবে।"

—"তাতে কি হবে?"

"কি হবে? সাদা বঙ্গাল (বিদেশী) রাজার টনক নড়বে। চাষীদের ঐক্য দেখে তারা ভয় পাবে। স্বরাজের পথ মুক্ত হবে।"

"আমাদের খাজনা মাফ হবে তো?"

ডাক্তার তার দু'কাঁধের জোড়ায় হাত রাখলেন।

চাপড় দিয়ে বললেন—"সব কিছুই নির্ভর করে আমাদের কাঁধ শক্ত কিনা তার উপর। আগে কাজ কর, ফল পরে পাওয়া যাবে।"

* * *

কালিয়াবরের চাষীদের মিছিলের সমবেত ধ্বনিতে কলং-এর পারের রাজপথ কেঁপে উঠল। "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার", "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক" আর "মহাত্মা গান্ধী কী জয়" ইত্যাদি ধ্বনির কম্পনে কলং-এর বায়ুমণ্ডল নেচে উঠল। বহুদিন পর কলং-এর পার আবার রণ-ধ্বনিতে মুখরিত হল। সেদিন কোনো উনুনে আগুন জ্বলল না, যুবতীর কাঁখের কলসী কাঁখেই রইল, রাখাল গরু বেঁধে রেখে চলে এল। রাস্তার পাশে পাশে মানুষের জমায়েত। সমবেত ধ্বনি। নূতন ভারতের জাগ্রত মানুষের মনপ্রাণ উদ্বেলিত। ঘরের মানুষ গাঁয়ে এসে মিলল, গাঁয়ের

মানুষ এসে মিলল নগরে, আর নগরের মানুষ জেলা-প্রদেশের সঙ্গে মিলে এক অপূর্ব জনস্রোতের সৃষ্টি করল। গুয়াহাটি শহরের দিকে কলং-এর প্রাণ পাখী হয়ে উড়ে যেতে লাগল, কলং-এর ভাষা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, কলং-এর আশা উথলে উঠল। গ্রামে গ্রামে মানুষের জাগরণ ঘটল। সেই জাগরণ জন্ম দিল হাজার হাজার স্বরাজী সেনার। গুয়াহাটি থেকে আন্দোলনের নেতারা উদ্দীপনাময় আহ্বান জানালেন, কালিয়াবর সেই আহ্বানে জাগল, ধীর পদক্ষেপে যাত্রা শুরু করল, সেই পথে বিপুল বেগ সঞ্চয় করল, জনতার জীবনে নূতন রক্তস্রোতের স্পন্দন বইল।...কলং গিয়ে লুইতের (ব্রহ্মপুত্রের) সঙ্গে মিলল। লুইতের পারে জন্ম হল নূতন মানুষের। সোনার লুইত রূপার লুইত স্রোতের তালে তালে নাচে। ঠগীরামের বুকে নূতন কাঁপন লাগে। গুয়াহাটির সমবেত বিরাট জনতার আশা আকাঙক্ষা সে অন্তরে অনুভব করে।

পথে ডাক্তার তাকে বলে গেলেন স্বরাজের কথা। ভারতের বুকে যে হাজার হাজার মিছিল পথ হাঁটছে তাদের লক্ষ্যের কাহিনী। সব মানুষ যেন আজ এক সূত্রে বাঁধা। আজ কলং আর লুইতের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। স্বরাজের সঙ্গমে দুই-ই আজ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

ঠগীরাম বুঝতে পারে যে গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষের দুঃখের শেষ নেই। খাজনার কড়ি জুগিয়ে সে একাই শুধু সর্বস্বান্ত হয়নি, কলং-এর কাছে দূরে, এ মাথায় ও মাথায় সবাই আজ দুঃখী সর্বস্বান্ত। তাই তারা স্বরাজ চাইছে।

ঠগীরাম এবার জন-লুইতের প্রবাহের মধ্যে নূতন জীবন-স্রোত খুঁজে পেল।

* * *

লুইত বয়ে চলে। আরো দশটি অগ্রহায়ণ যায়। কিন্তু প্রতি অগ্রহায়ণই গ্রামের মানুষকে আরো নিঃস্ব করে দিয়ে যায়। গরু-মোষ কেনার টাকা থাকে না। প্রত্যেকেই প্রায় মহাজনের খাতক হয়ে পড়ল। এদিকে রাজার খাজনা কমল না। ঠগীরামের ঘরে মানুষ বাড়ল। মালী বৌ নিয়ে এল, আর তার নিজেরও একটি মেয়ে হল। মালীর বৌ নিয়ে আসার কাহিনী ঠগীরামের মতো সুন্দর নয়। হবেই বা কি করে? আগের মতো ধন আছে না ধান আছে? সে রকম গয়না আছে না সে রকম মেয়েই আছে? সব বস্তুরই গৌরব আর গুণ কমে এসেছে। সকাল সন্ধ্যা জলপান না পেয়ে মালী কখনও বা বৌকে মারধোর করে, কখনও বা গালাগালির তোড় ছুটিয়ে মা-বাপের সাতপুরুষ উদ্ধার করে। আগের দিন, আগের স্নেহ ভালবাসা সবই অদৃশ্য হল। ঠগীরাম আর সোনপাহী দুঃখ পায়।...আগের মতোই চলল ক্রোক, জমি নিলাম, কাবুলি আর মহাজনের অত্যাচার।...

ঠগীরাম এখনও ডাক্তারের কাছে যায়। বুদরাম উকিল আর আগের মতো নন, গাঁয়ের সভায় সকলে আসেন না। একমাত্র ডাক্তারই তার সঙ্গে সব সময়

হাসিমুখে কথা বলেন, ঔষধ-পাতি দিয়ে সাহায্য করেন, সভা সমিতি করতে বলেন, আর স্বরাজের বিষয়ে নূতন খবর থাকলে আলাপ করেন।

যৌবন গেল দুঃখ নেই, কিন্তু জীবনে যে সুখ নেই। ছেলেপুলের জন্য সম্পত্তি কিছুই আর রইল না। সোনপাহীর কানের ফুলও ক্রোকের শোধ দিতে চলে গেল। তবু তার মনের আশা নষ্ট হয় না। আবার একদিন সুদিন ফিরে আসবে, ক্ষেতকৃষি আগের মতো হবে, গরুর দাম কমবে, খাজনা মাফ হবে, কলং-এর পারের মাটি আবার ফলেফুলে ভরে উঠবে। বড় সুন্দর আশা, কিন্তু কবে ফলবে? রাজার মতি কবে পাল্টাবে? মনের আনন্দে ক্ষেতকৃষি করার স্বাধীনতা তারা কবে পাবে? কবে?

এক অগ্রহায়ণে ধান তোলা হচ্ছে, এমন সময় শহর থেকে ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। মানুষ জন ডেকে এনে খাজনার কথা আলাপ শুরু করলেন। গাঁয়ের মানুষ স্পষ্ট জানালো যে তারা আর পারছে না। খাজনা মাফের আবেদন জানানোর আজ দশ বছর হয়ে গেল। রাজসরকারের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। না, এভাবে আশায় আশায় থাকার কোনো অর্থ হয় না, এবার সরাসরি খাজনা বন্ধের আলোচনা চালাতে হবে।

ডাক্তার তাদের কথায় সায় দিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় পকেট থেকে ম্যাপখানা বের করে তিনি আবার নগাঁও, গুয়াহাটি, কলকাতা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, সবজায়গায় আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন যে সর্বত্রই চাষীরা আন্দোলন করছে। ঠগীরামের মনে পড়ল আগের মিছিলের কথা, তার মন আবার আশায় ভরে উঠল।

ঠিক কথা, খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ডাক্তার সন্তোষের হাসি হাসলেন।

কলং-পারের মানুষ আবার জেগে উঠল। আরেকবার কলং-এর তীরে স্বরাজ সেনার জন্ম হল। রণশিঙা বেজে উঠল।

* * *

কলং-পার শূন্য হয়ে গেল। ঘরে রইল শুধু সোনপাহী আর সোনপাহীর মতো বৌঝিরা। ভাঁড়ারে ধান তো আজকাল আর ওঠেই না, যা হয় রাজা নিয়ে নেয়। এবারে আরো নিল কলং-পারের তেজী কৃষকদের। ঠগীরাম, মালীর মতো কয়েক জোড়া বাপছেলে সরকারের জেলখানায় গেল। রাজার পেয়াদারা পুলিশ মিলিটারি এনে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করল। ঠগীরামের বাড়িতে এবার বৌদের যৌতুকের গয়নাও পেয়াদাদের হাতে তুলে দিতে হল।

কলং-এ আগের মতো আনন্দের সুর আর শোনা যায় না। বিহু-সংক্রান্তিতে মানুষ আর আগের মতো রঙ্গরসে মাতে না। চার দিকেই শুধু দুঃখ, শুধু বেদনা।

* * *

জেল থেকে বেরিয়ে ঠগীরাম গাঁয়ের নিরানন্দ রূপ দেখে নিরাশ হয়ে পড়ল। বৌয়ের শূন্য কান দেখে মালী কান্না শুরু করল। বাপ-ছেলেকে মনমরা দেখে

সোনপাহী অস্থির হয়ে পড়ল, ভাবল এই পৃথিবীতে আর ধর্ম নেই, অধর্মের রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে। এখানে দুঃখ করলে পেট ভরে না। কিংবা ঈশ্বরকে শাপশাপান্ত করলেও কিছু হয় না। কেবল তাদের আদরের ছোট মেয়ে কাঞ্চনমতী তখনও সুখ-দুঃখ কিছুই ভাল করে বোঝা শুরু করেনি।

তবু ঠগীরাম নিরাশ হল না। কলং-এর পার যত শূন্য হতে লাগল, ততই তার চিন্তা হতে লাগল মালীর জন্য, বৌয়ের জন্য, মেয়ের জন্য আর তাদের বয়সী গাঁয়ের জোয়ান ছেলেমেয়েদের জন্য। কি হবে তাদের? ক্ষেত করার মতো গরু মোষ নেই, টাকা পয়সা নেই, অনেকেরই বছরের খোরাকি হয় না। মায়ারাম ওঝার মতো মানুষের আরো চিন্তা হল। মায়ারাম রাজ-মিস্ত্রীর কাজ করে, গ্রামের ধনী মানুষের জন্য পাকা বাড়ি তৈরী করে সে দুচার পয়সা রোজগার করত। তাতেই তার পেট চলত। চাষবাসে তার মনও নেই, আর জমিও নেই। কিন্তু গ্রামের মানুষের ভাঁড়ার থেকে ধান উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকা ঘর দুয়ার তৈরী করানোর মানুষও অদৃশ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে মহামারী দুর্ভিক্ষ লাগল। উপায় না পেয়ে সে একতারা একটা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে ফিরতে লাগল।— মায়ারামকে দেখলে ঠগীরামের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এমন গুণী ছেলেটার একি দশা হল।

তবুও যে করেই হোক ক্ষেত করতেই হয়। লোকের গরু ধার করে এনে বাপ-ছেলে ক্ষেত করে। ধার করা গরুর জন্য মালিকের ক্ষেতেও চাষ দিতে হয়। ফলে নিজের জমিটার পুরোটাতে বীজ বুনতে পারে না. তাই ফসলও কম পায়। যেটুকু পায় সেটুকুর অর্ধেক আবার ক্ষেত করতেই চলে যায়। ঠগী আর মালী মাঝেমধ্যে বসে বসে ডাক্তারের কথা ভাবে। তিনি আবার কবে গাঁয়ে আসবেন? শুনেছিল বটে সরকার তাঁকে জেলে পুরেছে। দেখো দেখি, তাঁর কি কষ্ট সহ্য করতে হল তাদের জন্য।

আরো কয়টা অগ্রহায়ণ গেল। ধন ধান আরো কমল। ইতিমধ্যে মালীর একটা ছেলে হল। নাতি পেয়ে ঠগীরাম-সোনপাহীর দুশ্চিন্তাই বাড়ল। ছেলের জন্যই দিন খারাপ চলছে, নাতির জন্য আরো কত খারাপ দিন আসবে কে জানে? দিন দিনই কাপড়-চোপড়, নুন তেলের দাম বাড়ছে, কোনো কোনো সময়ে নুন তেলের জন্যই উপবাস দিতে হয়।

একদিন সোনপাহী উনুনের কাছে বসে সুখ দুঃখের কথা বলছে। বাইরে কার যেন গলা শোনা গেল, "ঠগীদাদা।" গলা শুনে ঠগী বুঝল ডাক্তারবাবু। ঠগীরামের বাড়িতে সেদিন নুন তেলের অভাবে উপবাস চলছিল।

ডাক্তার ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো।"

ঠগীরাম মুখে কোনো কথা না বলে কপালে হাত দিয়ে বসল। সোনপাহী

ডাক্তারকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার বসে বললেন, "ঠগীরাম, এটা কপালে হাত দিয়ে বসে থাকার সময় নয়। মিলিটারিতে দেশ ছেয়ে গেছে। জিনিসের দাম আগুনের মতো। সরকারকে এই বেলা ধ্বংস না করলেই না হয়। আমি বেরিয়েছি তুমিও বেরোও, সবাইকে বের করে আনো।"

ডাক্তারের কথার সুর শুনে ঠগীরাম আশ্চর্য হল। কোন ফাঁকে মালী আর তার বৌও এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। ঠগীর ছোট মেয়ে কাঞ্চনমতী-ই শুধু রান্নাঘরে চায়ের জল গরম করছিল।

ডাক্তার আবার বললেন, "বোম্বাইতে স্বরাজের সভা বসেছিল। তাতে ঠিক হয়েছে এবার আমরা যেমন করেই হোক বিদেশী ফিরিঙ্গিদের দেশ থেকে তাড়াব। মেরেতেরে যেভাবে পারি।"

ঠগীরাম কিছু বলল না। মালী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল—"তাদের কি করে তাড়াবেন?" ডাক্তার মালীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ। নিজেকে জিজ্ঞেস করো। তোমাদের মাটি, তোমাদের দেশ। তোমরা যদি কাউকে থানা বসাতে, কাছাড়ি বসাতে না দাও, তবে তারা টিকতে পারবে না।"

"কিন্তু তারা আমাদের কথা শুনবে কেন?" মালী আবার জিজ্ঞেস করে।

"শুনবে না? কেন শুনবে না? দেশে পুলিশ মিলিটারি কটা আছে? তাদের এক জন পিছু তোমরা আছ হাজার জন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো, থানা দখল করো। স্বরাজ তবেই আসবে। তখন মনের খুশিতে ক্ষেত করতে পারবে।"—ডাক্তার উত্তেজিত সুরে বললেন।

মালী এবার ঠগীরামের দিকে তাকিয়ে বলে—"বাবা, তুমি কি করবে?"

ঠগীর স্বর ভয়ঙ্কর শোনাল—"কি করব? আজ যদি বিদেশী না তাড়াস, কাল খাবি কি?"—বলে ডাক্তারের দিকে তাকাল—"ডাক্তারবাবু, এই রাজার সঙ্গে এমনি ভাবে লড়া ছাড়া উপায় নেই। দুর্ভিক্ষে মরতে পারব না। কি করতে হবে আমাকে বলুন। একা আমি নই, আমার ছেলে মেয়ে বৌ, সবাই লড়বে।"

ডাক্তারের মুখে নূতন সংকল্পের রেখা। ঠগীর বাড়ির উনুনের চারদিকে নূতন আলোর দীপ্তি। সবাইর মুখ গম্ভীর, এক মহান কর্তব্যের বাণী তাতে ফুটে উঠেছে।

* * *

পাঁচটা মৃতদেহ। অন্ধকার রাত। প্রথমটির সামনে ডাক্তার দাঁড়িয়ে। লিখলেন—"মালীরাম, পিতা ঠগীরাম, বাড়ি কালিয়াবর। নগাঁও থানায় পতাকা তুলতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত। মৃত্যু-বাহিনী দ্বারা মৃতদেহ অপসারণ, বয়স ২৬। ৫০০০ মানুষের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিল।"

দুজন মৃত্যু-বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক এসে মৃতদেহটি তুলে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয়টির সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কিছুক্ষণ মুখখানা ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"মালীরামের স্ত্রী, বয়স কুড়ি। ফিরিঙ্গি মিলিটারি পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করায় ছুরির আঘাতে একজন সৈন্যকে নিহত করে। তাতে উত্তেজিত হয়ে ক্যাপ্টেন বিস্টলের গুলি বর্ষণ।"

মৃত্যু-বাহিনী শবটি সরিয়ে নেয়।

তৃতীয় মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার দেখলেন, একটা ছোট ছেলে। বয়স ১৪ বছরের মতো হবে। খুব কাছে গিয়ে টর্চ দিয়ে মুখখানা দেখে ডাক্তারের লোম খাড়া হয়ে গেল— "এ যে সূর্য।" অস্ফুট স্বরে ডাক্তার বললেন।

অন্ধকারে আরেকটি স্বর ভেসে এল—"কি হল ডাক্তার?"

"এ যে দেখছি আমার ছেলে।"—ডাক্তার বলেন।

মৃত্যু-বাহিনীর একজন বলল—"সে আমাদের সদস্য ছিল। গত রাত্রে সাইকেলে টাউন থেকে কামপুরের পুল পার হতে গিয়ে মিলিটারির গুলিতে মারা গেছে।"

ডাক্তারের চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। তবুও তিনি লিখে গেলেন—"ডাক্তার মণি বরার ছেলে। বয়স চোদ্দ, দশম মান শ্রেণীর ছাত্র, মিলিটারির গুলিতে প্রাণনাশ।"

চতুর্থ ও পঞ্চম লাশ দুটো কালিয়াবরের দুজন চাষীর। ডাক্তার কোনোক্রমে তাদের নামধান লিখলেন।

রাত শেষ হতে তখনও অনেক বাকি। মৃত্যু-বাহিনীর ছেলেরা বলল—"দাহ করব, না কবর দেব?"

পোড়াতে গেলে মিলিটারির চোখে পড়তে পারে। তাহলে ভয়ানক ব্যাপার হবে—"না, কবর দেওয়াই ভাল।" ডাক্তারের চোখ থেকে তখনও জল বেয়ে পড়ছে।—"কিন্তু ঠগীরামের একটা মতামত—" বলে ডাক্তার হঠাৎ থেমে গেলেন। তখন ডাক্তারের কাঁধে হাত দিয়ে কে যেন বলল—"ডাক্তারবাবু, আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক, আগুন জ্বাললে শত্রু আমাদের হদিশ পাবে। কবর দেওয়াই ভাল।" ডাক্তার বুঝতে পারেন—এ ঠগীরামের গলা। ঠগীরামের স্থিরকণ্ঠের কথা শুনে সমব্যথী ডাক্তার একটু সান্ত্বনা পেলেন।

শেষ রাতে কলং-এর পারে সবগুলো শবদেহ কবর দেওয়া হল। শহীদের মৃত্যুভূমিতে ধীরে ধীরে নূতন দিনের রক্তরাঙা প্রভাতের উদয় হল।

ঠগীরাম আর ডাক্তার দুজনই শহীদের শয়ন-ভূমিতে নতজানু হয়ে দু'অঞ্জলি ফুল দিল, তারপর পাঁচটা করে ধূপ জ্বেলে দিল।

ঠগীরাম চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "আমাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আমাদের জন্য তাজা রক্ত দান করেছে। আমাদের যাদের শরীরে এখনও

রক্ত মাংস রয়েছে, আমরাও এবার মরতে পারব। আসুন, সবাই মিলে আজ সঙ্কল্প নিই যে, করব কিংবা মরব।"

লাল সূর্যের প্রথম আলো এসে শহীদস্থানের উপরের ফুলগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলল। শহীদদের উদ্দেশে মৃত্যু-বাহিনী একটা স্যালুট দিল, তারপর তারা সেখান থেকে চলে গেল।

......আরো পাঁচটি অগ্রহায়ণ গেল। ঠগীরামের সংসারে এখন কাঞ্চনমতী, সোনপাহী আর নাতি একটি, বাকী দুজন তো স্বরাজের শহীদই হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে নামঘরে কাঁসর বেজে উঠল। শব্দ শুনে ঠগীরাম বলল—"কি হল?"

সোনপাহী বলল—"কেন, কাল শহরের সেই ভদ্রলোক বলে গেলেন না যে স্বরাজ হবে?"

ঠগীরাম বিছানা থেকে উঠল। তার বয়স এখন তিনকুড়ি আটেরও বেশি। তাছাড়া স্বরাজ আন্দোলনে মার খেয়ে তার কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, তবু স্বরাজের নাম শুনে সে উঠে দাঁড়াল। কাঞ্চনমতী আর ছোট্ট নাতিটিকেও তুলল। বাইরে খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে বুড়ি সোনপাহী, মেয়ে আর নাতিকে নিয়ে স্বরাজের গল্প শুরু করল। কালিয়াবরের সেই বিরাট মিছিলের দিন থেকে শুরু করে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের কথা আর মালীরামের লড়াই-এর কথা বলতে বলতে ঠগীরামের চোখ থেকে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।

কাঞ্চনমতী জিজ্ঞেস করে—"আজ থেকে আমাদের খুব সুখ হবে, না বাবা?"

ঠগীরাম বলল—"হবে, হবে। এখন থেকে আমাদের খাজনা মাফ হবে, গরু-মোষের দাম সস্তা হবে। কাপড়-চোপড় তেল নুনের দাম কমবে আর আমরা মনের সুখে ক্ষেত করতে পারব।" তারপর বুড়ো বলল—"আমাকে এখন একা ক্ষেত করতে হবে। করব, ধান পেলে কে ক্ষেত করবে না?"

মালীরামের কথা মনে করে সোনপাহীর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছিল।

* * *

আরো তিনটি অগ্রহায়ণ পার হয়ে গেল। কোথাও খাজনা কমল না, গরু-মোষ জিনিস-পত্রের দাম কমল না। ঠগীরামদের মন দমে গেল। এত বড় লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত কিছু হল না। হায় হায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা মিছিমিছি প্রাণ দিল।......ঘরে ঘরে দুঃখকষ্ট বাড়ল। অধিকাংশ বাড়িতেই গরু-মোষ নেই, ধানের ভাঁড়ার শূন্য। তাতে আবার খাওয়ার মুখ বাড়ছে। ঠগীরামের এখন নিজেরই ভিক্ষে করে খাওয়ার যোগাড় হল। কিন্তু ভিক্ষেই বা কে দেয়, সবারই সেই একই অবস্থা।

মায়ারাম ওঝা একদিন ঠগীরামের উঠানে বসে বলল—"বন্ধু কি করব, বল।

আমাদের গাঁয়েই তিন কুড়ি জোয়ান ছেলে ক্ষেত করতে না পেরে বসে আছে। জমিও নেই, গরু-মোষও নেই। কি করবে, বল? আমার তিন ছেলে, তারা বুঝলে, সাতপুরুষ যে পথ মাড়ায়নি, সে পথ ধরেছে।" বলে সুর নামিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—"চুরি করতে শুরু করেছে, বুঝলে? তোমাকে আর কি লুকাব, বল।"

ঠগীরাম মায়ারামের ছেলেদের ডেকে এনে বলল—"বাবারা, ও পথ ছাড়। আমরা চাষীর ছেলে চাষ করব।" ছেলেরা ঠগীরামকে নমস্কার করে বলল—"দাদু, আমারও সে কথা বুঝি। কিন্তু কি করব, জমিজমা কিছু নেই, গরু-মোষ নেই। কোনো উপায় নেই, তাই আমরা শহরের ধনী মহাজনদের বাড়িতে ঢুকে চুরি-চামারি করি।"

ছেলেরা সরল ভাবেই বলল—"এদের লুটে না খেলে আমাদের উপায় নেই। এদের......

ঠগীরামের মন দুঃখে ভরে গেল। কি করবে কি না করবে ঠিক করতে প্রায় দিনই সে গাঁয়ের মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে আলাপ করে। সবাই বলে—"স্বরাজের লড়াই করে আমাদের কি হল? না খাজনা কমল, না জিনিসপত্রের দাম।" কেউ বলল—"জমি দাও, চুরিচামারি এক দিনে বন্ধ হবে যাবে।" ঠগীরাম নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসে।......

হঠাৎ একদিন ডাক্তার এলেন। ঠগীরাম হাতে স্বর্গ খুঁজে পেল। বসিয়ে সমস্ত কথা বলে শেষে ধীরে ধীরে বলল—"বলুন তো ডাক্তারবাবু, এর নাম স্বরাজ? এর জন্য আমাদের ছেলেমেয়ে মরল?"

ডাক্তার হঠাৎ বললেন—"না ঠগীদা, এটা স্বরাজ নয়। স্বরাজ হওয়ার এখনও বাকি আছে।"

ঠগীরামের মুখ ম্লান হয়ে গেল। "কখন তাহলে স্বরাজ হবে ডাক্তারবাবু? গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ, জোয়ানমদ্দ ছেলেরা চোর হয়ে যাচ্ছে। কি যে করব জানি না। নিজেও কিছু করতে পারলাম না, অন্যেরও কোনো উপকারে এলাম না।"

ডাক্তার উত্তর দিলেন—"তবু আমাদের ছেলেদের অসমাপ্ত কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আর কেউ করুক না করুক, যতদিন না মরছি, আমি তো স্বরাজের জন্য লড়ে যাব।"

ঠগীরাম ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটু আসার আলো দেখতে পায়। হঠাৎ ডাক্তার বলে ওঠেন—"আমরা আবার স্বরাজের লড়াই শুরু করব।"

ঠগীরাম বলে—"কোথায়?"

ডাক্তার উত্তর দিলেন—"এখানে, এই কলং-এর পারে, শহীদভূমির কাছে। আমাদের লড়তেই হবে, নইলে," ডাক্তারের চোখ মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে—

"তিন বছর আমাদের দেশে ধনীর রাজত্ব চলছে। গরীবের কথা কেউ বলে না।"— তারপর একটু থেমে বলেন—"তুমি ভয় করবে না ঠগীদা, এবার আমরা নিশ্চয়ই জিতব। এক শত্রু গেল, অন্য শত্রুও যাবে।"

ঠগীরামের বুকে আবার আশার স্বপ্ন জাগে।

* * *

নূতন স্বরাজের সভায় আসামের বহু জায়গার বহু মানুষ এসে কলং-এর পারে জমায়েত হল। সভা হল, নূতন সংকল্প নেওয়া হল, স্বরাজের নূতন আন্দোলনের সূচনা হল।

সভা শেষে শহীদভূমিতে নতজানু হয়ে সংগ্রামীরা শপথ নিল—"চাষী যতদিন পর্যন্ত স্বরাজ না পায়, তার খাজনা যতদিন পর্যন্ত মকুব না হয়, যতদিন পর্যন্ত গ্রামের মেয়েরা জমি না পায়, ততদিন আমাদের স্বরাজের আন্দোলন শেষ হবে না। যতদিন পর্যন্ত দুবেলা দুমুঠি মুখের ভাত মুখে তোলার সুযোগ সকলের জন্য অবারিত না হয়, ততদিন আমাদের সংগ্রাম চলবে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের পিতামাতা ভাইবোনদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।"

ঠগীরাম নূতন পথ দেখতে পেল। বয়সে ভাঁটা পড়েছে, তবু তার শরীরে স্বরাজের তেজ কমে নি। সে ভাবলে, মরলে পর নাতি নাতনিদের কি হবে? গাঁয়ের অবস্থা যদি এমনই থাকে, তবে তারা বেঁচে থাকবে কি করে?—"পারি না পারি, মরণ পর্যন্ত লড়ে যাব, স্বরাজের জন্য লড়ব। আমাদের গাঁয়ের উন্নতি আমরা ছাড়া কে করবে।"

* * *

ডাক্তারের কাছে বিদায় নিয়ে ঠগীরাম আস্তে আস্তে চলল। জ্যোৎস্না রাত, হাতের লাঠিটি নিয়ে সে কলং-এর নদী-ঘাটে নামল।

হঠাৎ শুনল—

আমার নৌকার মরণ হল কলং-এ চলে না
মানুষের চলে না পা,
সন্ধ্যার আঁধারে বাতিও জ্বলে না
শূন্য বুক জ্বলে যায়।

ঠগীরাম অধৈর্য হয়ে ডাকে—"মায়ারাম, বন্ধু, এদিকে শুনে যাও।" মায়ারাম কাছের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে কাছে আসে—"বন্ধু, এসব গান গাইবে না।"

"কেন?"—মায়ারাম জিজ্ঞেস করল।

"মামুষের পাও চলবে, কলং-এ নৌকাও চলবে। আমি বলছি, শোনো—নইলে আমাদের গাঁয়ের উন্নতি নেই।" ঠগীরাম লাঠিটি কলং-এর জলে জোরে ঝাপটায়।

মায়ারাম কোনো উত্তর দেয় না। ঠগীরাম আবার বলে—"বন্ধু, আজ দেড়কুড়ি বছর পর বুঝেছি আমাদের স্বরাজ আমাদের নিজেদেরই ছিনিয়ে আনতে হবে।"

মায়ারাম বলে—"কি করে?"

ঠগীরাম জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে মায়ারামকে ডেকে নিয়ে যায় শহীদের শয়ন-ভূমিতে।—"আমাদের ছেলেরা এখানে ঘুমিয়ে আছে। এদের কথা গাও না কেন বন্ধু?"

মায়ারামের শরীর রোমাঞ্চিত হয়।—"বন্ধু, এগুলো মালীদের সমাধি, নয়?"

"হ্যাঁ, বন্ধু। তাদের শপথ দিয়ে বলছি বন্ধু, দুঃখের গান আর গাইবে না। তাদের আত্মা তাহলে শান্তি পাবে না।" ঠগীরাম বলল।

মায়ারাম শহীদের শয়নভূমি থেকে এক মুষ্ঠি ধূলি নিয়ে মাথায় মাখে। ঠগীরামের চোখে জল টলমল করে।

* * *

কলং-এর পারে জ্যেৎস্নায় পথ দেখে ঠগীরাম ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমগ্র জীবনের কাহিনী মনের মধ্যে তোলপাড় খায়। কলং-এর পারে তার জীবনের তিন কুড়ি আট বছর কেটেছে। মানুষের সুখ দুঃখের সাক্ষী এই কলং। কত দিন ধরে কলং বয়ে যাচ্ছে। কত যুগ ধরে হবে। গাঁয়ের বুকে হাজার ঠগীরাম যাবে, হাজার ঠগীরাম আসবে, কিন্তু কলং-এর পারে কৃষক জন্মাবেই। বাপ গেলে ছেলে আসবে, ছেলে গেলে নাতি হাতে লাঙ্গল তুলে নেবে। তার জীবনের ত্রিশটি অগ্রহায়ণে হয়তো লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়নি। কিন্তু ছেলে নাতির জীবনে আরো কত ত্রিশ অগ্রহায়ণ আসবে, সেই সমস্ত অগ্রহায়ণে যাতে লক্ষ্মীর আগমন ঘটে, তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রাণ থাকে মানে, জ্ঞান থাকে মানে। জীবন তো একটা নয়, একশটা কলং-এর মতো বৃহৎ জলরাশির দীর্ঘ একটা স্রোত—এই হচ্ছে কলং পারের জীবন।

ঠগীরামের মনে নূতন আনন্দের একটা স্বপ্ন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

* * *

সোনার কলং, রূপার কলং, স্রোতের তালে তালে নাচে। কলং আজও বয়ে যায়, অতীতকে পেছনে রেখে যায়। ❐

**যোগেশ দাস**

জন্ম 1927 সাল, হানচরা বাগান, ডুমডুমা। স্কুলের শিক্ষা ডুমডুমা এবং ডিব্রুগড়ে। কটন কলেজ থেকে বি.এ. এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমীয়ায় এম. এ. পাশ করেন। কিছুদিন সাংবাদিকতা করার পর গুয়াহাটি বি. বড়ুয়া কলেজে অসমীয়া বিভাগের মুখ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'সাহিত্য সভা পত্রিকা' এবং 'প্রহরী'র সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাস 'সহাঁরি পাই', 'ডাবর আরু নাই', 'নিরুপায়', 'উৎকণ্ঠ', 'উপকণ্ঠ', 'জোনাকীর জুই', 'হেজার ফুল' উল্লেখযোগ্য। গল্প সংকলন 'পপীয়া তারা', 'অন্ধকারের আঁরে আঁরে', 'মাদারের বেদনা'' 'হাজার লোকর ভির'। সম্পাদনা—'গল্পর কুটকি'।

# কলু পটুয়ার মৃত্যু

কৃষ্ণ কৃষ্ণ! থুঃ থুঃ। গেটেই ধনীরাম দাঁড়িয়ে গেল। দিনদুপুরেই এই প্রকাণ্ড বাড়িটা এমন গম্ভীর নিঃঝুম হয়ে আছে কেন? পুরানো দু'মহলা কাঠের বাড়ি, পেছনে পাকা বুকসমান উঁচু ভিটেতেও শেওলা পড়েছে। উপরে যাওয়ার সিঁড়িগুলোও পড়ো পড়ো ভাব ধরেছে। দরজা জানালা সব খোলা। কিন্তু মানুষের নামগন্ধ নেই। ফুলগাছগুলো বেশ সবুজই, ফুল ধরেছে প্রচুর, কিন্তু কেমন জানি থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এক ঝলক বাতাসও বয় না নাকি? প্রকাণ্ড গেটের কাঠগুলো খুলে যাচ্ছে, মনে হয় যেন দাঁত খিঁচাচ্ছে। অমঙ্গলের চিহ্ন ভেবে তার ভয় লাগে। বুক কেঁপে যায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ! থুঃ থুঃ।

তবুও সে এগিয়ে যায়। যেতেই হবে। ইতঃস্তত করলে চলবে না। মৌজাদার কর্তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কর্তাকে না পেলে বড়বাবু বা তার বড় ছেলেকে। মৌজাদার মানুষটি বড় স্নেহপ্রবণ। এদিকে অবশ্য হিসাবি খুব, অকারণে ফুটা পয়সাও একটা খরচ করবেন না। এখন বুড়ো কর্তার বয়স হয়েছে, বড় ছেলেই সব কিছু দেখাশোনা করে। বড়বাবু বড্ড বদরাগী মানুষ। এ বাড়ি থেকে সে-ই তো তাকে তাড়িয়ে দিল। একদিন বিড়ি খেয়ে নিজের মশারিটা পুড়িয়ে দিয়েছিল, বড়বাবুর কি রাগ। আরেক দিন বাগানে গরু ঢুকল, সে মার খায় আর কি। ভোরবেলা জাগিয়ে না দেওয়াতে একদিন তিনি গাড়ি ফেল করেন। ফিরে আসার পর ধনীরাম পেল এক চড়, এক মাসের বেতন আর জবাব।

বড়বাবুর আসল রাগ অবশ্য অন্য কারণে। সে জানে কিন্তু কাউকে বলে নি। রূপ, অর্থাৎ রূপেচরী অর্থাৎ রূপেশ্বরীকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। বড়ছেলের ছেলেমেয়ে হবে, ধনীরাম তাই তাদের গাঁ থেকে রূপকে এনে দিয়েছিল। দিনে দিনে রূপেচরী অপ্সরার মতো হয়ে উঠল। ধনীরামের চোখে ধন্দ লেগে যায়।

হাত-পাগুলো কোমল চিক্কন হয়েছে, বুক যেন আকুপাকু করছে, চোখ দুটো টানা টানা, মুখের হাসিতে প্রাণ আইঢাই করে। রূপ যুবতী হয়েছে। যুবতী। ধনীরাম তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হল। কিন্তু বড়বাবু একদিন তাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বললেন, "খবরদার, আর যদি কোনো দিন রূপের দিকে নজর দিস্, তবে তোর প্রাণ থাকবে না।"

ধনীরাম প্রাণটি রেখে রূপেশ্বরীকে ছেড়ে এল।...দাওয়ায় না উঠে সামনের উঠানের দিকে ভয়ে ভয়ে এগোয়। বড়বাবু কি দয়া করবেন? ছোটবাবু থাকলেও একটা কথা ছিল। লুকিয়ে টাকা পয়সা দিত তাকে। পরে সে বিলাত চলে গেল। না, বোধহয় আমেরিকা। তবুও তাকে যেতেই হবে। খাজনা মাফ না পেলে সে মরবে। বোনটি বিধবা হয়ে অসুখে পড়ে তার কাছে আছে, ছেলে-মেয়েও দুটো। মা তো একেবারেই বুড়ি, হাঁটু মাথা এক হয়ে গেছে, লাঠি নিয়ে কোনোক্রমে চলে। বোনটি দুদিন যদি রেঁধে খাওয়ায় তবে চারদিন বিছানায় থাকে। তাকে সাহায্য সহায়তা কিছুই করতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়। নিজের বোনকে কোথায় ফেলবে? দুঃখী স্বামীর ঘরে কোনোক্রমে ছিল, সেও মরল। বিয়ে হওয়ার আগে বেচারি তার কাছ থেকে কতক কি আশা করেছিল। দাদা শহরে চাকুরি করে, মৌজাদারের ঘরে, কত ভাল ভাল জিনিস পায়, এনে দেবে। সে তো কিছুই দিতে পারেনি। চড়, একমাসের বেতন আর জবাব নিয়ে হঠাৎ যেদিন তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হল, তখন বোনটি স্বামীর বাড়িতে। তখন থেকে সে তাকে কিছুই দিতে পারেনি। ছি ছি, কি লজ্জার কথা।

তার উপর বন্যায় এবার শালিধান মার খেয়ে গেল। আউশ ধান রয়েছে। ঈশ্বর যদি করেন তবে হবে। কিন্তু ধান বেচে খাজনা দেওয়ার আর উপায় নেই। এদিকে বোনের জন্য ডাক্তার আনতে গিয়ে মহাজনের কাছ থেকে ধার করে আনা টাকাও খরচ হয়ে গেল। আবার খাজনা না দিলেও চলবে না। বন্যায় যে ধান নিয়ে যাবে তা কে জানত? খাজনা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মাফ না পেলে মরণ। বড়বাবু ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারে। মনি আর টুনি, বোনের ছেলে-মেয়ে দুটোকে স্কুলে ঢুকিয়েছে, না খেয়ে যাবে নাকি? আরে দেখো! মনিকে হালে লাগিয়ে দেবে নাকি? আর দুটো টাকা খরচ করলেই ওদের মা ভাল হয়ে উঠবে। রূপকে তো সে বড়বাবুর কাছেই গচ্ছিত রেখে গেছে। তাকে পাওয়ার আশা সে করে না। বড়বাবুর রূপকে চাই। বড়বাবুর সঙ্গে রূপকে সে কতদিন নির্জনে দেখেছে। মৌজাদার কর্তার খবরের কাগজ আনতে গিয়ে দেখেছে, বড়বাবুর কাছে বাজার খরচ চাইতে গিয়ে দেখেছে, মুচির মেরামতের জন্য মা ঠাকরুনের স্যাণ্ডেল আনতে গিয়ে দেখেছে। রূপ তার রং-বেরং-এর-আঁচলখানি অকারণেই বুকের উপর টেনে দেয়, বড়বাবু আড়চোখে দেখে দেখে হাসে, ধনীরামের বুকের কোন এক অজ্ঞাত জায়গায় যেন এমনিতেই বেদনা বোধ হত।

ভিতরের উঠানে কেউ নেই। আশ্চর্য! আট বছর যে বাড়িতে চাকুরি করেছে, তার চেহারাটাও আগের মতোই রয়েছে। কিন্তু তবু তার যেন অপরিচিত লাগছে। বাইরের দিকের মতো এদিকেও লম্বা লম্বা কাঠের খুঁটি এবং পড়ো পড়ো সিঁড়িগুলো আগের মতোই রয়েছে। ধোঁয়া আর ঝুলে ভরা রান্নাঘরটা আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। বড়ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে কাপড়-মেলা তারগুলোও রয়েছে। তবু কি যেন নেই নেই মনে হচ্ছে।

সে বারান্দায় ওঠে। ভয়ে ভয়ে রেলিং-এ চাপড় মেরে শব্দ করে। কারো সাড়া নেই। সে বড় অস্বস্তিতে পড়ে। সিঁড়ি দিয়ে তাকালে ওপর মহলের বারান্দা আর বড়বাবুর ঘরের দরজা দেখা যায়, কিন্তু ধনীরাম শুধু তার ঘরের ভারী পর্দাই দেখতে পেল। সে পর্দা আবার বাতাসে নড়ে না। আর কেউ কোথাও নেই।

রেলিঙ ধরে সে উঠানের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। কাউকে না কাউকে পেতেই হবে। শালিধান। আউশ-ধানের ক্ষেত। অসুস্থ বোন। মণি। টুনি। খাজনা।

আরে, এ কে? রান্নাঘরের পেছন দিয়ে একটা মেয়ে আসছিল, তাকে দেখে সে থতমত খেয়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি পেছন দিকে আবার ফিরে গেল। রূপ নয় কি? পেছন দিকে বাসন ধোয়ার একটা পাকা জায়গা রয়েছে, পাশে খারের স্তূপ আর জল রাখার পিপে একটা, কাছে খড়ের ঘরটি, তার গায়ে লাগোয়া ছোট শব্জির বাগান, এদিকে কয়েকটা লেবু গাছ, মাদার গাছ, সুপারি গাছ, নীচে বাঁশ বন, বিশল্য-করণী, লেতেকা ফলের গাছ, আর পাশের সেই মাটি কাঁঠালের গাছগুলো। মেয়েটি রূপই। আরো ফর্সা হয়েছে। হবেই, সুখে আছে। বুকের উচ্চতা বেড়েছে, ব্লাউজের চাপের মধ্যেও বোঝা যায়।

তাকে দেখে দৌড়ে চলে গেল। পালাবেই। বড়বাবু রাগ করবেন। সে অবশ্য আগে ধনীরামের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা রঙ্গরস সবই করত। মাদার গাছের তলায় পান নিতে গিয়ে সে তার হাত ধরেছিল একদিন, রূপ তখন মুখখানা অল্প রাঙা করে বলেছিল, "আ, যা মরণ!" সে আরেকদিন বলেছিল, "তোকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে একেবারে ঘরে নিয়ে যাব।" রূপ তখন তাকে একটা চেলাকাঠ ছুঁড়ে মেরেছিল। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মা ঠাকরুন দেখে ফেলে মুচকি হাসছিলেন। রূপের লজ্জা হল, সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

বিয়ে করার কথা অবশ্য আর বলা হয়নি। তার আগেই বড়বাবু প্রাণহানির হুমকি দিলেন, মাইনে দিয়ে জবাব দিয়ে দিলেন। যাক্, কি দরকার মেয়ে একটি নিয়ে বড়লোকের সঙ্গে ঝামেলা পাকানোর। জোয়ান মেয়ে কত আছে। রূপের মতো, রূপের চাইতে ভাল, রূপের চাইতে খারাপ। আর চাকুরি ছেড়ে গ্রামে গিয়ে সে দেখেছে মেয়েদের নিয়ে ভাবনার সময় তার নেই। বাড়িটি ভেঙ্গে গেছে, বুড়ো বাপ নেই। বুড়ি মা লাঠি নিয়েছে। ক্ষেত করতে হবে। কারো বাড়িতে

চাকরের কাজ আর করব না। যে জমিটুকু বর্গা দিয়েছিল, তা ফিরিয়ে আনতে হবে। দেবে না দেবে না করছে। জোয়ান মেয়ের কথা আর কি ভাববে? যেতে দাও ওসব কথা। বিধবা বোনটিও ঘাড়ে চাপল অসুখ, ক্ষুধা মণি আর টুনিকে নিয়ে।

তবুও সে রূপের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। নারী বড় আশ্চর্য বস্তু। যত বিপদ আপদই ঘটুক, তাকাবার সময়ও পাওয়া যাবে, তাকাতে মনও যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে ধপধপ শব্দ করে কে যেন খালি পায়ে নেমে আসছে। সে চমকে ঘুরে দাঁড়াল। মা ঠাকুরুণ। চোখে চোখ পড়ে। ঘোমটার কাপড়টা হাতে নিয়ে কেন জানি না তাকে দেখেই সিঁড়ির রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে পড়েন। উপরে ফিরে যাবেন বলে মনে হল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত গেলেন না। 'মা ঠাকুরুণ' বলে ডাকতে গিয়েও সে ডাকতে পারল না, গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। একবার তার দিকে আর একবার সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি ধীরে ধীরে নেমে এলেন। পুষ্ঠ মুখখানি একটু বিবর্ণ হয়ে গেছে নাকি? খুবই আশ্চর্য লাগছে কিন্তু। তাকে ডেকে কথা বললেন না, হাসলেনও না। এ বাড়ির চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার পর সে আরো কয়েক বার এসেছে, মা ঠাকরুন তখন বেশ হাসি মুখে কথা বলেছিলেন, চা-খাবার দিয়েছিলেন, আর নিজ হাতে সুপারি কেটে পানও দিয়েছিলেন। এমন কি বিয়ে-থা করে সংসারী হয়নি কেন তাও জিজ্ঞেস করেছিলেন। আজ তার সঙ্গে কথাই বললেন না!

আজ বড় দরের গোলমাল কিছু একটা হয়েছে। আচ্ছা, মা ঠাকুরুণের চোখ দুটো কি রকম ঢুলুঢুলু লাগছে না? চোখের দীর্ঘায়ত পাতাগুলো আর্দ্র। চোখের কোণ দুটো লাল হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কাঁদছিলেন। ঐ দেখো, আজ খারাপ লাগছে বলেই বুঝতে পারছে যে মাঠাকুরুণকে সে কতখানি ভালবাসে।

তিনি নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করে,—"মা ঠাকরুণ?"

তিনি হাসার চেষ্টা করেন—"কি হে ধনী?"

এই হাসিটা কিন্তু তার স্বাভাবিক হাসি নয়। কি হল আজ? মুস্কিল, জিজ্ঞেসও করা যাবে না।

মা ঠাকরুণ বলেন, "বসো, অনেকক্ষণ এসেছো নাকি?"

বেঞ্চে আস্তে করে বসে সে বলে—"না মা ঠাকরুণ, এই মাত্র এসেছি। কর্তাবাবু নেই নাকি?"

মা ঠাকরুণ রেলিঙ ধরে তার মতোই উঠানের দিকে তাকিয়েছিলেন, কোনো কথা বললেন না। সে ডাকল, "মা ঠাকরুণ।"

"হু। ও। আছেন, আছেন ধনী। বাবা আছেন, কোনো দরকার আছে নাকি?"

সে বড় আশ্চর্য হয়। উনি যেন কি রকম করছেন। কি হল জানি! জিজ্ঞেসও

করা যাবে না। সে বলল,—"অল্প দরকার ছিল।" হঠাৎ তার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কথা মনে হল। আশ্চর্য, এত সময় সে ভুলেছিল। সে জিজ্ঞেস করে—"বাচ্চারা কোথায় মা ঠাকরুণ? দেখছি না যে?"

মা ঠাকরুণ বললেন—"কাল বৌদি এসেছিলেন, তার সঙ্গে গেছে। তুমি পান খাও, ঐ বাটাতে রয়েছে। কেটে নাও। আমি বাবাকে বলছি।" বেঞ্চের উপর রাখা পানের বাটার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি ধীরে ধীরে উপরে চলে গেলেন। সুপারি কাটতে কাটতে সে ভাবে বাচ্চারা অন্য বাড়িতে কাল থেকে রয়েছে। থাকতে পারছে? পারতেও পারে, এখন তো একটু বড় হয়েছে। আর মামীদের বাড়িও খুব একটা দূরে নয়, কাছেই।

মুখের পান শেষ হতে চলল, কিন্তু উপর থেকে কেউ নামল না। অন্যদিন মৌজাদার কর্তা তাকে উপরে ডেকে নিয়ে যান অথবা বড়বাবু নীচে নেমে এসে কথাবার্তা বলেন। আজ মা ঠাকরুণও ফিরে এলেন না। রূপও দেখি কোথায় অন্তর্ধান করল। এত সময় ধরে তো কেউ বাসন মাজে না। জ্বালানি কাঠের ঘরেও করার কিছু নেই। বাগানে তো তার করার কিছু নেই-ই। না, কাঁঠাল খুঁজতে লেগে পড়েছে।

উপরে কাঠের মেজেতে খড়মের গম্ভীর শব্দ শুনে ধনীরাম হকচকিয়ে উঠে পড়ে। মৌজাদার কর্তা। দশাসই দেহ, বেশ সুন্দর মানুষটি। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। গায়ে দু'পকেটওয়ালা সেই লং-ক্লথের ফতুয়াটি, হাতে বাঁকা বেতের লাঠি। সিঁড়ির চার ধাপ নেমে তিনি দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। নীচে দূর থেকে ধনীরাম নত হয়ে প্রণাম করল। আজই সে প্রথম এরকম করল, আগের বাড়ির পুরাণো চাকর হিসাবে প্রণাম না করলেও তার চলত। কিন্তু আজ বাড়িটা কি রকম থমথম করছে। মা ঠাকরুণ কি রকম যেন করছেন। বড়বাবুর ভয়ে রূপ বেরুতেই পারল না। তদুপরি সে খাজনা মাফ করতে এসেছে।

কর্তা বললেন—"উপরে এসো।" তিনি আবার উঠে গেলেন। খড়মের গভীর শব্দগুলো সে শুনল। তিনি তাঁর নিজের বসার ঘরে গেলেন। দরকারী কথাবার্তা সেখানেই সারেন। সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায়। মৌজাদার কর্তা এমনিতে গম্ভীর মানুষ, কিন্তু আজকের মতো এত কম কথা বলতে ও দেখেনি। সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে সে একবার ফিরে তাকাল। সে ঘামছিল। না, কেউ দেখেনি, রূপও না।

সিঁড়িগুলো ভেঙ্গে সে উপরে গেল। বড়বাবুর ঘরটি বন্ধ। মা ঠাকরুণ কোথায় লুকালেন কে জানে? বড়বাবু বাড়িতে রয়েছেন নাকি? বাচ্চারা বাড়িতে না থাকলে কি রকম যেন লাগে। ওরা থাকলে তার স্নেহপ্রবণ মনটা অনেকটাই হালকা হয়ে যেতো।

কর্তার বসার ঘরের দরজায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেতের চেয়ার একটায় বসে তিনি·একদৃষ্টে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। বেতের লাঠিটি তাঁর কোলে

পড়ে আছে। ধনীরাম সেখান থেকেই ডাকল, "কর্তা।" তিনি তার দিকে ঘুরে আবার জানালার দিকে চোখ ফেরালেন। অসীম ধৈর্য নিয়ে ধনীরাম দাঁড়িয়ে থাকে।

"তুই আসবি বলেই ভাবছিলাম। কেন এসেছিস, বল তো?"

প্রথমে তার একটু ভয় ভয় লাগে। কিন্তু ধীরে ধীরে সব কথাই বলে ফেলে। অতি হিসাবি কর্তা এবারে কি বলবেন কে জানে? তার ভয় হয়। তার বলা শেষ হলে দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে তিনি তার দিকে না তাকিয়েই বলেন, "বোনের এতদিন ধরে অসুখ, ডাক্তার দেখিয়েছিস?"

হাত জোড় করে যে বলল, "যে ক'টা টাকা ছিল, তা খরচ করে ডাক্তার দেখিয়েছি। একটু উপকারও হয়েছে। পরে আরো ওষুধ খেতে বলেছিল। শালিধান জলে নিয়ে যাবে ভাবি নি। নইলে খাজনার জন্য টাকাগুলি রেখে দিতাম।"

তিনি বললেন, "কাগজ কলম আন্ তো।"

সে দ্রুত উঠে কর্তার সামনে দিয়ে কোণের টেবিলের কাছে যায়। কাগজ পেন্সিল আর উপরে রেখে লেখার জন্য শক্ত মলাটের বড় বই একখানা নিয়ে আসে। আট বছর কাজ করার সময়ে বহুবার সে এমনি কাগজ-পেন্সিল এনে দিয়েছে। তিনি লিখতে থাকেন। কিন্তু কর্তা চিঠি লিখছেন কেন? অন্য দিন তো কিছু বলার থাকলে বড়বাবুকে মুখেই বলেন। হঠাৎ তার মনে পড়ল যে কর্তা সে আসবে বলে আগেই ভেবেছিলেন, তবু তাকে জিজ্ঞেস করেছেন সে কেন এল। বড়দের ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বোঝা যায় না।

লেখা কাগজটি ভাঁজ করে বললেন, "এই চিঠিটা বড়খোকাকে দিবি।"

সে চিঠিখানা নিল। কাগজ পেন্সিল আগের জায়গায় রাখল। মৌজাদার বললেন, "আবার দেখা করে যাবি, ধনী।"

"আচ্ছা কর্তা।"

কিন্তু বড়বাবুকে পাওয়া যায় কোথায়? দরজায় খিল দিয়ে বসে আছেন। আরে, দরজা দেখি খোলা। আশ্চর্য! কর্তার চিঠি নেওয়ার জন্যই খুলে গেল। নাকি? কলাপাতা রঙের ভারি পর্দাখানা নড়ছে। নিশ্চয়ই এই মাত্র দরজা খুলেছে। পর্দা সরিয়ে সে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

রাম রাম! রাম রাম! প্রকাণ্ড পালঙ্কটির একপাশে বড়বাবু মাথা নীচু করে বসে আছেন। সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে তাকালেন। চুল উস্কোখুস্কো। দাঁড়িগোঁফ চারদিন মতো কামনো হয়নি। চোখ দুটোর চারপাশে কালি পড়েছে। পাতলা বেগুনি রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবির বোতাম লাগানো নেই। পরণের কাপড়ও ময়লা। বদরাগী প্রতাপী বড়বাবুর এ কি দশা? রাম রাম! রাম রাম! সব সময় যাকে সে ভয় করত, সেই বড়বাবুকে আজ তার মায়া হল। দেখো দেখি।

বড়বাবু বলেন, "আয় ধনী।"

দেখো, বড়বাবুর গলাটা কত মোলায়েম। হবে না কেন? মা ঠাকরুণ সাক্ষাৎ দেবী। লক্ষ্মী। চিঠিখানা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, "বড়বাবুর কি শরীর খারাপ?"

"না, তেমন কিছু হয়নি। তুই বস্।"

বসবে? বড়বাবু নিজের ঘরে তাকে বসতে বলছেন? আশ্চর্য। বড়বাবু ট্রাঙ্কের কাছের টুলখানা দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু সে নড়ল না। কখনও বসে নি। বড়বাবু চিঠিখানা পড়ছেন। ঘরটা কেমন যেন অন্ধকার। জানালার পর্দাগুলো সব নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটা পর্দাই তোলা আছে। বড়বাবুর মুখখানা কালো হয়ে গেছে।

বড়বাবু পড়তে পড়তে মুখ তুলে তাকান। কালি-পড়া চোখের ভেতর লাল হয়ে আছে। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। সে চোখ নামিয়ে ফেলে। তিনি বলেন, "বস্ না ধনী।"

টুলখানা একটু সরিয়ে নিয়ে অগত্যা সে বসে। বড়বাবু আবার তার দিকে তাকান। চিঠিখানা আবার পড়েন। কর্তা খাজনা মাফের কথা কিছু লিখেন নি নাকি? কি লিখলেন তাহলে? সে তার কথাগুলো আবার বড়বাবুকে বলে। শালিধান। বন্যা। আউশধান। বোন। মনি। টুনি।

অবশেষে বড়বাবু বললেন, "ধনী, বোনের চিকিৎসাটা করানো দরকার, নইলে খারাপ হবে। অসুখটা ভাল মনে হচ্ছে না। ডাক্তার দেখিয়ে যা। আজকাল তো অসুখের আর শেষ নেই। ঠাট্টার ব্যাপার নয়, খাজনার ব্যাপারটাও বুঝতে হবে।"

হাতে স্বর্গ পাওয়া মানুষের মতো ধনীরাম দমবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মৌজাদার কর্তা এ কথাগুলো লিখে দিলেন নাকি? না, এত সমস্ত কথা তিনি নিশ্চয়ই লেখেন নি। তাহলে আবার একই কথা আবার বড়বাবু বললেন কি করে? কিছুই বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে, বাইরে সূর্য হেলে পড়েছে অনেকখানি, সন্ধ্যা হল বলে। বড়বাবু জানালার কাছে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই বললেন, "ধনী, বাবা তোকে রূপের কথা কিছু বলেন নি?"

রূপের কথা? কই, বলেননি তো? হরি হরি। রূপের কথা? সে ভাবে, খাজনা মাফের কথার মধ্যে আবার রূপ আসে কোত্থেকে? সে তো দেখলাম বড়বাবুর ভয়ে তার সামনে থেকে পালাল। বড়বাবু বললেন, "শোন্ ধনী, তুই আমাকে উদ্ধার কর। তুই না করলে উপায় নেই। খাজনার জন্য তুই চিন্তা করবি না। কোনো ভয় নেই তোর। বোনের চিকিৎসার জন্য দুশো টাকা নিয়ে যা। তোর কিছু ভাবতে হবে না।"

একেবার নূতন কথা। বড়বাবুর মুখে এ ধরনের কথা সে এই প্রথম শুনল। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। বড় মানুষের মন। বড়বাবু বললেন, "তুই রূপকে নিয়ে যা। তার এখন চার মাস।"

সে টুল থেকে উঠে পড়ে। রূপের চার মাস চলছে। তাই তাকে একটু মোটা-সোটা দেখাচ্ছিল। তাই সে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই বাড়িটা দিনদুপুরেও নির্জন। তাই বাচ্চারা মাসীর বাড়িতে। তাই মৌজাদার কর্তা আর বড়বাবুর কথার মধ্যে এত মিল। তাই কর্তা সে আসবে বলে ভেবেছিলেন।

তার দিকে না তাকিয়ে বড়বাবু বললেন, "তুই যদি মেনে না নিস্, তাহলে আমি মরব ধনী, শুধু তুই-ই-উদ্ধার করতে পারিস্। আমাকে। রূপকেও।"

বড়বাবু কাছে এসে পকেট থেকে এক তাড়া দশটাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দেন। দুশো টাকাই বোধহয়। তার হাতের তালুতে দুশো টাকায় নোটের তাড়ার স্পর্শ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনটা ভাল হয়ে যায়। দুশো টাকায় অনেক কাজ হবে। বোনের অসুখের জন্য দুকুড়ি টাকার মতো খরচ হবে। বাকী টাকা থেকে যাবে। মনি টুনিকে কাপড় কিনে দিতে পারে। কিন্তু রূপ? সে চার মাসের অন্তঃসত্বা। তাকে কি করে রাখবে?

বড়বাবু বললেন, "ধনী।"

সে বলে, "আমি কর্তার সঙ্গে কথা বলব, বড়বাবু।"

সে বেরিয়ে আসে। দরজার মাথা থেকে বড়বাবুর মুখখানা ভাল দেখা যায় না। কিন্তু এত দুঃখী দুঃখী ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে তার মন খারাপ লাগে।

বাইরে মা ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনিও সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিলেন। উৎকণ্ঠ চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেন, "চলে যেয়ো না, তোমার জন্য চা বানিয়েছি। নীচে এসে একটু বসো।"

দেখো দেখি, মা ঠাকরুণ কত ভাল। না, নিয়েই যাবে রূপকে। যা হয় হবে। সে বলে, "ঠিক আছে, মা ঠাকরুণ।"

নীচেই কাছে দাঁড়িয়ে মৌজাদার কর্তা বলেন, "ধনী, রূপকে তুই নিয়ে গেলে শুধু আমাদেরই যে ভাল হবে, তা নয়, ওর নিজেরও ভাল হবে। সে ভাল থাকবে, পরবে, অবশ্য ওকে একটু সামলে চলতে হবে। আর তোর দিক দিয়েও কম লাভের কথা নয়, ঘর সংসার যখন করছিস তখন ঘরে বৌ একজন না থাকলে চালাবি কি করে? তাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে তুই পার পাবি।"

সে চুপ করে থাকে। রূপকে নিয়ে গেলে মৌজাদার কর্তা, বড়বাবু, বিলাত—না—বিলাত নয়, আমেরিকায় থাকা ছোটবাবু, মা ঠাকরুণ আর রূপ সবাই উদ্ধার পাবে। ঠিকই, কাজটি করলে সবাইর ভাল হবে। সেও বৌ পাবে একটা।

নীচের ঘরের বেঞ্চে বসে সে যখন মা ঠাকরুণের হাত থেকে চা মিষ্টি নিল, তখন একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উপরে বাতি একটা জ্বলছে। মা ঠাকরুণ আজও তাকে সেই পেতলের গ্লাস দিয়ে চা দিয়েছেন। রসকরা দিয়েছেন কাগজে। তাকে বেশি আদর করেন নি, আগের সমানেই দেখেছেন। সে মা ঠাকরুণের দিকে বড়

মমতা ভরে তাকায়। মা ঠাকরুণ কাউকে উপকারের বিনিময়ে আদর করেন না। আজও করেন নি কর্তা এবং বড়বাবুর মতো। গ্লাসটা ধুয়ে সে রান্নাঘরের বারান্দায় রাখে। মা ঠাকরুণের হাত থেকে পান নেওয়ার সময় সে স্বাভাবিক ভাবেই রূপ কোথায় জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখল উঠানের অন্ধকারে পুঁটলি একটা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা ঠাকরুণকে সে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

তার সঙ্গে যখন এ সম্পর্কে কোনো কথা হয়নি এ পর্যন্ত, তাহলে আর কি দরকার। তাছাড়া মা ঠাকরুণ হচ্ছেন স্বয়ং লক্ষ্মী। তুলসী। "আসি", বলে সে খপ্ করে মা ঠাকরুণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দ্রুত নেমে যায়। মা ঠাকরুণ চমকে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

সে উঠানের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা রূপেশ্বরীকে বলল, "এসো রূপ।" রূপ তার পিছু পিছু বুক সমান উঁচু চত্বরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সে আর কোনো কথা বলে না। একে অন্যের দিকে তাকায় না।

বাড়ির দেউড়িতে ঘোড়ার গাড়ি একটা দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে বড়বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ির দরজা খুলে সে রূপকে প্রথমে উঠতে দিল। তারপর সে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। বড়বাবু "যাও" বলার পর কোচোয়ান গাড়ি চালিয়ে দিল। সে বড়বাবুকে কিছু বলতেও ভুলে গেল। সে ভাবছিল ঃ একদিন মাদার গাছের তলায় পান তুলতে গিয়ে রূপকে নির্জনে একটা কথা বলেছিল। বলেছিল যে কোনোদিন রূপকে সে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে পালিয়ে যাবে। ❐

**হেমেন বরগোহাঞি**

জন্ম 1932, লক্ষ্মীমপুর। কটন কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। 'শান্তিদূত' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও বিদ্যালয় শিক্ষক ছিলেন। তারপর আসাম সিভিল সার্ভিসে তের বছর চাকুরি করেন। পরে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সাপ্তাহিক 'নীলাচল'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বরগোহাঞি একাধারে যশস্বী কবি, সমালোচক, ঔপন্যাসিক, এবং প্রবন্ধকার। এখন পর্যন্ত পাঁচখানা গল্প সংকলন, তিন-খানা উপন্যাস এবং দু'খানা প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক। অসম সাহিত্য সভা দ্বারা প্রকাশিত 'কুড়ি শতিকার অসমীয়া সাহিত্য' নামক গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেছেন।

# পর্দা

আধ-খাওয়া মদের গেলাসটি মুখের সামনে নিয়ে মিঃ পেরেরা রঞ্জিতদের কাছে বৌদ্ধদর্শন ব্যাখ্যা করছিলেন। আমি আর মুনীন ঠিক সেই সময়ে হাজির। পেরেরা হঠাৎ থমকে গেলেন। তলানিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করে গেলাসটা ঠক্ করে টেবিলে রাখলেন, তারপর সিগারেটের জন্য মুনীনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। সতীশ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যেন বড়দরের একটা বিপদ থেকে নিস্তার পেয়েছে। তার মনের ভাব আন্দাজ করে একটু খুনসুটি করার ইচ্ছা জাগল, পেরেরাকে বললাম, "থামলেন কেন, আপনার কাছে বৌদ্ধদর্শন শুনব বলেই তো আজকে এলাম।"

"বৌদ্ধদর্শন আর কি শুনবেন বরুয়া। সকল দর্শনের সার কথা আমি খুঁজে পেয়েছি যোহানের 'ইউ নেভার ক্যান টেল'-এর একটি মাত্র বাক্যে—ইট্স্ আনওয়াইজ টু বি বর্ণ', ইট্স আনওয়াইজ টু বি ম্যারিড, ইট্স্ আনওয়াইজ টু লিভ এণ্ড ইট্স্ ওয়াইজ টু-ডাই।" —পেরেরা তার বহু বিজ্ঞাপিত জীবন দর্শনটি আবার ঘোষণা করলেন।

মুনীন ঠিক সেই ধরনের মানুষ, নিজের জীবনের দুঃখ আর হতাশার কথা বিগলিত ভাষায় বর্ণনা করে অন্যের সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টাকে যারা প্রচণ্ড ঘৃণা করে। পেরেরার স্বভাবটা ঠিক তার উল্টো। পেরারা মুখ খুললেই তাই মুনীনের সারা গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়। আজ পেরেরার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে আপাততঃ ভূমিকা পর্বটুকু মাত্র চলছে, মূল বক্তৃতা এখনও বাকী। অতএব আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্যে 'চম্পা, ও চম্পা' বলে ডাকতে ডাকতে সে অন্দরে ঢুকে গেল।

হ্যামলেটের মত রক্তিম মুখ করে সতীশ পর্দার ওপাশের অন্ধকারটুকুর দিকে

শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পেরেরার চোখ শূন্য গেলাসের দিকে, যেন আয়নায় মুখ দেখছে। বিষণ্ণ একটা হাসি তার মুখে সঞ্চারিত। রঞ্জিত গুনগুন করে একটা গান ধরল। তার এই সুর ভাঁজাটুকু যে কোনো মানসিক আবেগের সহজাত প্রকাশ নয়, তা বুঝতে কোনো স্বল্প বুদ্ধিরও ভুল হওয়ার কথা নয়। মনে অবসাদিত উত্তেজনাকে চেপে রাখার এটা একটা ভূয়া আবরণ মাত্র।

আমার এক্ষেত্রে কিছু করার নেই, আমি নির্বিকার দর্শক মাত্র। সতীশের ওখানে মদ খাওয়া শুরু করার পর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি। মুনীন প্রায়ই কোনো না কোনো ছল করে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে সতীশ, রঞ্জিত ও পেরেরার মধ্যে অনিবার্য ঐ লক্ষণগুলো দেখা দেয়। কী রহস্য যে এর মধ্যে রয়েছে আমার জানা নেই। এটুকু বুঝেছি যে কোথাও সূক্ষ্ম একটি বীণার তার ঝুলছে, তাতে আঘাত করলে একই সঙ্গে সবগুলো হৃদয়েই ঝংকার ওঠে। কিন্তু কোথায় রয়েছে সেই তার?

"আপনি গল্প লেখেন?" পেরেরা হঠাৎ আমাকেই প্রশ্ন করলেন। পেরেরার এমন প্রশ্নের জন্যে আমি তৈরী ছিলাম না। একটু থতমত খেয়ে গেলাম। পেরেরার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করলাম যে কথাগুলোর মধ্যে কোনো উপহাসের ইঙ্গিত রয়েছে কি না। কিন্তু তার মুখ দেখে কিছু বোঝা সম্ভব নয়। অকাল প্রৌঢ়ত্বের বলিরেখা অঙ্কিত, কঠিন সেই ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল কোনো আবেগের ঢেউ লেগে কোনোদিনই চঞ্চল হয়েছে বলে মনে হয় না। পেরেরার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গেলাম, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম প্রথম দর্শনের বিহ্বল বিস্ময় নিয়ে।

—"আমি অসমীয়া জানি না। আপনার গল্প পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি"—আমার জবাবের অপেক্ষা না করে পেরেরা নিজে থেকেই বলতে লাগলেন,—"আপনার লেখার কথা আমি মুনীনের কাছে শুনেছি। সতীশের মুখে আপনার দুর্নামও শুনেছি অনেক। পতিত মানবাত্মা অন্ধকারে যে লড়াই চালায়, তার কাহিনী মানুষকে শোনাতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কদর্য ইঙ্গিতপূর্ণ যে গঞ্জনা আপনি শুনছেন, আপনার বন্ধু হিসাবে তাতে আমি গর্ববোধ করি।"

পেরেরার গুরুগম্ভীর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ভেবে কিছু অনুমান করতে পারলাম না। অবশ্য লোকটির স্বভাবই এমনি। বক্তৃতার বিষয় বৌদ্ধদর্শনই হোক আর পরকীয়া প্রেমই হোক, শব্দচয়ন আর বর্ণনা-ভঙ্গিতে সেই একই নিপুণ সতর্কতা। আমার বলার কিছু নেই, শুনে যাওয়াই আমার কাজ।

—"একটা গল্প বলব, শুনবেন? আপনার কাজে আসতে পারে।"—কথাগুলো বলে পেরেরা সতীশকে কি যেন একটা ইঙ্গিত করলেন। সতীশ টেবিলে আরেকটা বোতল এনে রাখল। মুনীনের জন্যে ভেতরে ভেতরে আমার কিন্তু উৎকণ্ঠা হচ্ছিল।

এতক্ষণ সে কি করছে? কৌতূহল আটকে না রাখতে পেরে ডাকলাম, "মুনীন"। তৎক্ষণাৎ পর্দা সরিয়ে মুনীর ঘরে ঢুকল, যেন এতক্ষণ আমার আহ্বানেরই অপেক্ষায় ছিল। অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে আমি লক্ষ্য করলাম মুনীনের মুখ আরক্ত, চুল এলোমেলো, চাহনি বিহ্বল—লাগামহীন নেশায় বিপর্যস্ত মানুষের মত তার হাবভাব। পরক্ষণে মনে হল শুধু আমি নই, অন্য সবাইও আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করছে। প্রত্যেকেই অবশ্য ভাবছে যে আর কারো তা নজরে পড়ছে না।

পেরেরা গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। গল্প শোনার জন্যে সবাই উৎকর্ণ। পেরেরাকেও মনে হল যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করছেন। একটু সময় তিনি মাথা নীচু করে বসে রইলেন। শুরুটা কোথায় করলে গল্পটা আরো জমজমাট হবে, তাই ভেবে নিচ্ছেন মনে হল। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে আমার চোখে চোখ রেখে একেবারে ক্লাসিক্যাল কায়দায় শুরু করলেন ঃ

"এক যে ছিল নারী। নাম, ধরে নিন রানী। দিন যাপনের গ্লানিতে মলিন, আবার মদিরার ফেনায় উচ্ছল, বিনিদ্র রজনীর বেহাগ রাগের গুঞ্জনের মতো সে ছিল একটি রহস্যময় জগতের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা। তার ছিল সৌন্দর্য—এই একটি মাত্র কথা বললেই তার সম্পর্কে সব কিছু বলা হয়ে যায়। তাকে দেখলে এমন একটা অনুভূতি হত যেন কোনো মানব-মানবীর সঙ্গমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার জন্ম হয়নি, কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বিস্ময়কর বিধানে সে অবতীর্ণ হয়েছে। পিতৃপরিচয়হীন সে নারীর মুখের গড়ন ছিল অজন্তার অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত নারীমূর্তির মুখাবয়বের মতো, পাষাণের বুকে চিরকালের মতো স্তম্ভিত হয়ে থাকা সেই অমর সৌন্দর্যের স্বপ্নাবেশ জড়ানো ছিল তার আঁখিপল্লবে। সুগঠিত বক্ষ, নিটোল উরু, তার দেহের খাঁজ আর ঢেউগুলো আমাকে মনে করিয়ে দেয় জন কীটস্-এর আঁকা ছবির কথা, যা মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে নিঃসাড় করে একটা অতীন্দ্রিয় ক্ষুধার সঞ্চার ঘটায়। তার সৌন্দর্যের তুলনা চলে প্রকৃতির মহিমার সঙ্গে, প্রতিভার সংজ্ঞাহীন রহস্যের সঙ্গে, মানবমনের মধুরতম বিষাদের সঙ্গে।"

যেন সেই বিস্ময়কর সৌন্দর্য এই মুহূর্তেই তাঁর চোখের সামনে রয়েছে, এমনি একটা তন্ময়তার আবেশে পেরেরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। সেই সুযোগে আমি আশপাশটা দেখে নিলাম। যে মুনীন পেরেরার কথা শুনলেই অস্থির হয়ে ওঠে, সে মাথা নীচু করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে, তন্ময় হয়ে শুনছে পেরেরার কাহিনী। গেলাসের আধ-খাওয়া মদটুকু শেষ করতেও সে ভুলে গেছে। কোনো মহান স্বপ্নের উত্তাল আবেশ কিংবা বহু শতাব্দীর স্মৃতিজর্জর তার অন্তর্লীন সত্তা যেন তাকে বশ করে নিয়েছে। নিরুপায় আত্মসমর্পণের আকুতিতে তার গোটা মুখমণ্ডল ভারাক্রান্ত। কিন্তু, কিন্তু এ সমস্ত আমি ভেবে মরছি কেন, গল্প তো গল্পই!

পেরারা আবার শুরু করলেন ঃ

"রানী যে বাড়ীতে থাকত, দু একজন উচ্চ অভিজাত সমাজের যুবক সেখানে যাওয়া-আসা করত। একটি রাতের জন্য নারীদেহ সম্ভোগ—এতেই তারা চরিতার্থ হত। রানী অবশ্য নৈমিত্তিক ব্যবসার চাইতে কোনো একজনের রক্ষিতা হয়ে থাকাটাই বেশি পছন্দ করত। একদিন অশোক বলে একজন যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল, নিজেরই ঘরে। অশোক বড় সরকারি চাকুরি করত। মা-বাবা নেই, বাড়ীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সংসারে কারো কাছ থেকে সে ভালবাসা পায়নি, তাকে ভালবাসার মতো কেউ কোথাও ছিল না। স্নেহ-ভালবাসার কোনো ক্ষেত্র নেই, নেই কর্তব্য আরোপিত কোনো দায়দায়িত্বও, অশোক তাই হয়ে উঠেছিল উচ্ছৃঙ্খল আর খামখেয়ালী। তার ক্ষেত্রে মানবিক স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সা রূপান্তরিত হয়েছিল গভীর শিল্পানুরাগে। মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে নি বলেই সে আশ্রয় খুঁজছিল সাহিত্য, দর্শন আর কাব্যের মধ্যে। কিন্তু গভীর সব উপলব্ধিকে সদাসর্বদা স্পর্শ করা যায় না, কাব্যপাঠেও তাই কোনো কোনো সময়ে শান্তি আসে। মনের এমনি এক নিরালম্ব অবস্থায় অশোক মদ ধরেছিল। অভ্যাস শেষটায় এমন দাঁড়াল যে মদ না হলে তার আর চলে না। অতিরিক্ত নেশার দুটো প্রতিক্রিয়ার সে শিকার হয়েছিল। প্রথমতঃ খুবই বিপজ্জনক ধরনের যক্ষায় সে আক্রান্ত হয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ সে বুঝতে পারছিল যে পুরুষোচিত সামর্থ তার ক্রমেই কমে আসছে।

রানীর ঘরে সে ঢুকে পড়েছিল ভুল করে, তার অন্য একজন বান্ধবীর ঘর মনে করে। মদের ঘোরে তার বেহুঁশ অবস্থা। পর্দাখানা তুলেই সে ভুলটুকু বুঝতে পারল, কিন্তু সে ভুলের জন্য অনুতাপ করার সময় তার আর হল না। নির্জন কক্ষে আপন শয্যায় রানী তখন আধশোয়া অবস্থায়, তার বেশভূষাও আলুথালু। আপন চিন্তায় বিভোর অবস্থায় হঠাৎ একটা অচেনা মানুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। উদভ্রান্ত বিস্ময় নিয়ে সে অশোকের দিকে তাকাল। অন্যদিকে অশোক স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে, বজ্রাহতের মত। রানীর দুঃসহ সৌন্দর্যের অগ্নিশিখা অশোকের মুখখানা যেন পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে—তার দৃষ্টির শূন্যতায় এমনি একটা আভাস। রানী অবাক নয়নে তাকিয়ে রইল, তারপরই তার সম্বিত ফিরল। নিত্যদিন নানা অচেনা অতিথিকে যেমন নিজের শয্যায় আমন্ত্রণ জানায়, মুখে তেমনি একটি রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বিছানায় বসেই ডাকল, "ভেতরে আসুন।"

রানীর কণ্ঠস্বরে আবাহনও ছিল না, বিসর্জনও নয়। কিন্তু তাতেই তার যেটুকু পরিচয় উন্মোচিত হল, সেটুকুতেই অশোক যেন তার দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। এই অলোকসামান্য সৌন্দর্য, নারী দেহের এই পরিপূর্ণ মহিমা মানুষের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে কক্ষনো তৈরি হয় নি, হতে পারে না। নেহাৎ নিঃস্পৃহ-ভাবে যন্ত্রের মত সে রানীর শয্যার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর

কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করেই বিছানার একপ্রান্তে বসে পড়ল। রানী তার শঙ্খশুভ্র গ্রীবা সামান্য ঘুরিয়ে অশোকের দিকে তাকাল। মনোরম সেই মুহূর্তে অশোক মাত্র একবারের জন্যে তাকে মুখ তুলে দেখল। বাকী সমস্তটুকু সময় সে মাথা নুইয়ে বসে রইল। কিছু সময় এমনি গেল, তারপর অকস্মাৎ এক আশ্চর্য আবেগে অশোকের বুক মুচড়ে উঠল। অজান্তেই তার দুচোখ বেয়ে ঝরতে লাগল বিরামহীন অশ্রুধারা।

ব্রঞ্জের মূর্তির মত কালো মসৃণ অশোকের মুখাবয়ব, ওষ্ঠের ভাঁজে ফুটে ওঠা মধুর বিষাদ আর কপালে চিন্তার কুঞ্চনরেখা দেখেই রানীর মনে এক অনাস্বাদিত আবেগের শিহরণ খেলে গিয়েছিল। হঠাৎ তাকে কাঁদতে দেখে রানী বিচলিত হল। কিন্তু কোন চঞ্চলতার প্রকাশ না ঘটিয়ে শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কাঁদছেন? কেন?"

"তুমি—তুমি কী সুন্দর"—অশোকের কথাগুলো শোনাল উদ্দেশ্যহীন প্রার্থনার মতো।

টেবিলের নীচে মুনীনের হাতখানি খুঁজে বের করে সবার অলক্ষ্যে চেপে ধরলাম। সর্বশক্তি দিয়ে ধরেছি, তার রক্ত প্রবাহের দ্রুত স্পন্দনগুলো জোর করে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। বাহ্যিক চেতনা লুপ্ত মানুষের মত সে অসাড় নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে। তার মুখখানা লক্ষ্য করলাম, দেখলাম তাতে মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছে—আরো দেখলাম......

"সেই ঘটনার কিছুদিন পর"—পেরেরা আবার শুরু করলেন, "মহেশ বলে একজন লোকের সঙ্গে রানীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে মানে অবশ্য সামাজিক ভাবে কিছু হল না, মহেশের সঙ্গে রানীকে দম্পতির মতো থাকতে দেখা গেল মাত্র। মহেশ ছিল চোরাই মদের কারবারি, অশোকের মদ খাওয়ার আড্ডাও ছিল মহেশের ঘরেই। বছর চল্লিশেক বয়েস, মানুষটি নিজেও দুর্দান্ত মদ্যপ, যে পরিমাণ মদ সে বিক্রি করত, তার চাইতে নিজে টানত বেশি। চেহারাখানাও একান্ত ষণ্ডের মতো। অনেকদিন আগেই অশোক স্বেচ্ছায় তার ভরণপোষণের দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। সাদা কথায় সে ছিল অশোকের হাতের মানুষ। কিন্তু অশোক ছাড়াও আরেক জনের সঙ্গে মহেশের বন্ধুত্ব ছিল। তার নাম আর্নল্ড। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আর্নল্ড ছিল তার দোকানের নিয়মিত খদ্দের। তার একমাত্র জীবিকা ছিল জুয়া। এমন নয় যে অন্য কাজকর্মের যোগ্যতা আর্নল্ডের ছিল না। কিন্তু এক শ্রেণীর মানসিক রোগগ্রস্তের মতো আর্নল্ডও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ভয়ের চোখে দেখত। গোটা দিন জুয়া খেলত, তাতে যা মিলত, তা খরচ করে সস্তা হোটেলে ভাত খেয়ে তারপর মহেশের ঘরে বসে মদ খাওয়াই ছিল তার নিত্যদিনের রুটিন।

মহেশের ঘরে রানীকে দেখে আর্নল্ডের মনে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। ব্যাপারটাতে একটা রহস্য রয়েছে, সে তা গোড়া থেকেই আন্দাজ করেছিল। রানীর সান্নিধ্যলাভের উগ্র লালসায় সে পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু বন্ধুত্বের অসম্মান করার সাহস তার হল না। অক্ষম কামনার উত্তাপে জ্বলেপুড়ে সে গুমরাতে লাগল।

অশোক আগের মতোই মদ খেতে মহেশের ঘরে আসে। কিন্তু রানীর আগমনের পর থেকে তার যে পরিবর্তন ঘটছে, তা ক্রমেই নজরে এল। আজকাল সে কম কথা বলে, মদ খাওয়াও কমিয়ে দিয়েছে। আর লোকমুখে শোনা গেল সে নাকি আজকাল পড়াশোনায় খুব মন দিয়েছে, খামখেয়ালীপনা গেছে কমে। এরই মাঝে সাময়িক পত্রে যেদিন অশোকের লেখা একটা গল্প বেরুলো, সেদিন তার পরিচিতজনদের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তার রচনারীতি অপরিণত, কাহিনীর গাঁথনী দুর্বল, তবু তার গল্পের মধ্যে ছিল নূতন ধরনের আবাহন, মৃত্যুকে জয় করার সংকল্প। এমন মিরাক্‌ল্‌ কোন মন্ত্রের জোরে ঘটল, তা কেউ কেউ আন্দাজ করতে পারল। আর্নল্ড তাদেরই একজন।

আর্নল্ড নিশ্চিত বুঝল যে নারী-প্রেমই অশোকের রুক্ষ হৃদয় ভূমিতে নূতন প্রত্যয়ের ফুল ফুটিয়েছে। রানীই যে সেই নারী, সে সংশয়ও ছিল না, কিন্তু রানীর স্বামী অর্থাৎ মহেশের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এমন ব্যাপার কি করে সম্ভব? আর্নল্ড লক্ষ্য করল যে অশোক আজকাল বাইরে অন্য খদ্দেরদের সঙ্গে বসে মদ খায় না, মহেশ থাকুক কিংবা নাই থাকুক, সে অনায়াশে ভেতরে চলে যায়। স্ত্রী-পুরুষের যুগল কলকণ্ঠ, হাসি ঠাট্টার উচ্ছল তরঙ্গ মাঝে মাঝে দরজার সামনের রঙ্গিন পর্দায় এসে আছড়ে পড়ে। পর্দার ওপারে নেপথ্য জীবনের যে অজ্ঞাত রহস্যের নর্তন চলছে, বাইরে বসে থাকা অর্ধমৃত মানুষগুলোর কোটরগত চক্ষু তার কল্পনায় বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

মদ খেয়ে আর্নল্ড আগেভাগেই বাড়ি ফেরে। অশোক কখন ফেরে কিংবা আদৌ বাড়ি ফেরে কিনা, আর্নল্ড তা জানতে পারে না। এই লীলাখেলার শেষটুকু পর্যন্ত দেখতে আর্নল্ডের দুরন্ত ইচ্ছে হল। কিন্তু রাতটা কি করে থাকা যায়? আর্নল্ডের মাথায় বিপজ্জনক একটা বুদ্ধি খেলল। সেদিন সে মদ খেতে বসেই বোতল থেকে একটু মদ ঢেলে দিল ঊরুর কাপড়ের উপর, হঠাৎ যেন ছলকে পড়ে গেছে। একটু পরে সিগারেট ধরাতে গিয়ে অন্যমনস্কতার ভান করে জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি ফেলে দিল সেই মদে ভেজা কাপড়ের উপর। দপ্‌ করে আগুন ধরে গেল। মহেশ দৌড়ে এসে আগুন নেভাল বটে, কিন্তু তার আগেই আর্নল্ডের দুটো ঊরুই জখম হয়ে গেল। জখমের ধরনটা গুরুতর, আর্নল্ড যতটা ভেবেছিল তার চাইতে অনেক মারাত্মক। এক মাসে ঘা সারলো বটে কিন্তু তারপর দেখা গেল তার চলৎ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। মহেশের ঘরেই আর্নল্ড আশ্রয় পেল, পঙ্গু বিকলাঙ্গ অবস্থায়।”

এটুকু বলেই পেরেরা সতীশের চোখের উপর চোখ রাখলেন। জ্বলন্ত একটা উত্তেজনা চাপা দেওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টায় সতীশের মুখ বিবর্ণ। আমি এর কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না। গল্পটাতে সে বোধহয় যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে। পেরেরা দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার শুরু করলেনঃ

"মহেশের বাড়িতে থাকার সময়ে আর্নল্ড আবিষ্কার করল যে মহেশ ও রানীর আচার আচরণ স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়। পরস্পরের মধ্যে একটা দূরত্ব বজায় রেখেই তারা চলাফেরা করে। আরো দেখল যে মহেশের সামনেই অশোক রানীর উপর যথেষ্ট দাবী খাটায়। অশোক-রানীর মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতা সকল সময়ে শালীনতার সীমাও মানে না। আর্নল্ড সংকল্প করল যে এই জটিল রহস্যের জট খুলতেই হবে। মহেশকে নানা ভাবে উস্কে যে কথাগুলো বের করা গেল, তার সারমর্ম হলঃ রানীর প্রেমে পড়ে অশোক প্রথমে তাকে জীবনসঙ্গিনীই করতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকারি পদমর্যদা, সামাজিক সম্মান আর সহজাত সংস্কার—এগুলোর চাপে শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। একজন দেহোপজীবিনীর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে একদিকে তার যেমন স্বাভাবিক দ্বিধা ছিল, অন্যদিকে রানীর প্রতি আকর্ষণটাও ছিল দুর্বার। দুয়ের সংঘাতে পড়ে সে সমঝোতার পথ বেছে নিল। অর্থলোভী মহেশকে সে বহুদিন ধরে চেনে, কয়েক হাজার টাকার টোপ ফেলতেই সে রানীকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে রাজী হয়ে গেল। সর্ত হল, তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে অশোক কোনো বাধা আরোপ করবে না, কিন্তু রানীর প্রেমের স্বাধীনতা থাকবে অবারিত, মহেশ তাতে বাধা দেবে না। মানসিক বোধ-শক্তির দিক দিয়ে মহেশ ছিল একেবারেই নিম্নস্তরের জীব, এ ব্যবস্থা তার কাছে লোভনীয় বলেই মনে হল। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এত চড়া দাম দিয়ে রানীর প্রাত্যহিক সান্নিধ্য কেনাটা তার ক্ষমতার বাইরে ছিল।

কথাগুলো শোনা অবধি আর্নল্ডের মনে রানী সম্পর্কে একটা নূতন উপলব্ধির জন্ম হল। এমন আশ্চর্য ঘটনাও ঈশ্বরের পৃথিবীতে ঘটে! এই রানী—সৃষ্টির বিস্ময়, মূর্তিমতী সৌন্দর্য, জর্জর পৃথিবীতে নূতন করে বেঁচে থাকার মহৎ প্রেরণা, মহত্তম বেদনা—সেই রানীর সঙ্গে যদি তার হৃদয়ের সামান্যতম যোগাযোগও ঘটে, তবে সেই বেগবান প্রবাহের বহতা স্রোতে অবগাহন করে সেও মুক্তিলাভ করবে পঙ্কিল এই জীবনযাত্রার পাপ আর পতন থেকে। সৌন্দর্যের বেদীমূলে আত্মনিবেদন করে সে প্রকৃতির সঙ্গে নূতন করে পরিচিত হবে, দুর্লভ এই সুখানুভূতির মাধ্যমেই জীবন আর জগৎকে নূতন করে ভালবাসতে শিখবে। মহেশের মুখে সব কথা শুনে আর রানীর অতীত জীবনের পরিচয় পেয়ে আর্নল্ডের সব সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। দুপুরের এক নির্জন মুহূর্তে রানীর কাছে সে তার প্রেম নিবেদন করল। বলল যে রানীর একবিন্দু সহানুভুতির প্রত্যাশায় সে গোটা জীবনের জন্যে পঙ্গুতা বরণ করে নিয়েছে।"

মেয়েরা যাকেতাকে চট করে ভাল না বাসলেও প্রণয়ার্থীর আন্তরিক প্রেম নিবেদনে মনের সঙ্গোপনে নিশ্চয়ই পুলক অনুভব করে। আর্নল্ডের কথায় রানী বিচলিত হল। কিন্তু স্বভাবতঃই সে ছিল গম্ভীর তদুপরি অশোকও তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। সে বলল ঃ ‘অশোককে ভালবেসেই শিখেছি যে একজনকে একান্তভাবে ভালবাসা, একজনকে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দেওয়াটা জীবনের কতবড় একটা মহৎ অভিজ্ঞতা। সংসারে কারুর থেকেই আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আমার মতো মানুষ তো আর জ্ঞান দিয়ে বা সেবা দিয়ে জগতের কোনো উপকার করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের মতো মেয়েরাও প্রত্যেকেই অন্ততঃ একজনকে সুখী করতে পারে, আর নিজেও সুখে থাকতে পারে, নিজের শক্তি আর সাধ্যমতো। একজন প্রকৃত সুখী মানুষ আর কিছু দিয়ে না হোক, শুধুমাত্র নিজের সুখের মহিমা দিয়েই জগতের উপকার করে।.......আপনাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, অবশ্য বন্ধুত্বটুকু পেতে পারেন।’

আর্নল্ড রানীর কথাগুলো শুনল অভিভূতের মতো। তার পরেই হঠাৎ মনে হল, আরে, রানীর মুখে সে তো অশোকের কথারই প্রতিধ্বনি শুনছে। আসলে অশোকের বুদ্ধি ক্ষুরধার, সে ঠিকই বুঝেছিল যে আর্নল্ড একদিন না একদিন রানীর কাছে প্রেমভিক্ষা করবেই। পুরো উত্তরটি তাই সে রানীকে দিয়ে মুখস্ত করিয়ে নিয়েছে। অশোক-রানীর যুগল আত্মা গভীর প্রেমের উত্তাপে গলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। রানীর আজ আর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। আর্নল্ডের প্রচণ্ড ঈর্ষা হল......বিস্ময়ে সে মুগ্ধ হল, অবাক হল,—নূতন করে শিখল, যে জীবনের সবকিছুই পরিবেশ নির্ভর, হীন বা কলুষিত হয়েই কেউ জন্মায় না। প্রতিকূলতার চাপে কেউ যদি বা ভ্রষ্ট হয়, প্রেম, দয়া, সৌন্দর্যবোধ, বা সমজাতীয় হৃদয়বৃত্তিগুলো মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। প্রেমের যাদুদণ্ডের স্পর্শে রানী তাই নবজন্ম পেয়েছে। সে প্রেমিকা, অশোকের সে লীলা-সঙ্গিনী, অন্য কোনো পরিচয় তার আর নেই—সে প্রাক্তন গণিকা নয়, মহেশের তথাকথিত পত্নী নয়, সুঠাম একটা নারীদেহ মাত্রও নয়। আর্নল্ডের মনে হঠাৎ বড় আনন্দ হল। রানী তাকে আর কিছু দেয়নি, কিন্তু এমন একটা প্রত্যয়ের সন্ধান দিয়েছে, যার আভায় হেলাভয়ে সে মৃত্যুর দুয়ারের দিকে একাই যাত্রা করতে পারবে। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল।”

এটুকু বলে পেরেরা হাসলেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখে জল টলমল করছে। মুনীনের দুচোখে আগুনের ঝলক। হাতে হাতে ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো সতীশকে কুণ্ঠিত আর করুণ দেখাচ্ছে। এ সবের অর্থ কি? এদিক ওদিক তাকাচ্ছি হতবুদ্ধির মতো, হঠাৎ চোখে পড়ল রাঙা পর্দার ওধারে একটা ছায়ামূর্তি দ্রুত ভেতরে সরে গেল। তৎক্ষণাৎ জীবনের করুণ রহস্যের রক্তাক্ত একটি যবনিকা

আমার চোখের সামনেও উন্মোচিত হল। কি এক অন্ধ উত্তেজনার আবেগে পেরেরার পায়ের উপরকার কাপড় আমি সরিয়ে দিলাম। দেখি, দুই উরুর উপরই শ্বেত কুষ্ঠের মতো আগুনে পোড়া ক্ষতচিহ্ন, দলাপাকানো শিরার জট। বুঝলাম, একজন অসামান্য রূপবতী নারীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে তিনজন উদ্বাস্তু মানুষের জীবন—একই নারীর মধ্যে একজন পেয়েছে সম্ভোগের আনন্দ, একজন পেয়েছে প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতি, আর আরেকজন পেয়েছে—পৃথিবীতে নূতন করে বেঁচে থাকার মহৎ প্রেরণা। তিনজনের মধ্যে কার প্রাপ্তি সর্বাধিক, তা বোঝার জন্যে একে একে সতীশ, মুনীন আর পেরেরার মুখগুলো আমি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম। কিন্তু এ প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তর দিতে পারে একমাত্র সেই রহস্যময়ী নারী, যে দ্বারমুখের ঐ রাঙা পর্দাখানার ওপারে আশ্চর্য রহস্যময় একটি শয্যার প্রান্তে বসে নিজ হৃদয়ের পর্দা সরিয়ে নির্ণয় করতে চাইছে তার মধ্যে সতীশ, মুনীন কিংবা পেরেরার স্থান কোথায়। ❒

**পদ্ম বরকটকী**

জন্ম 1927, যোরহাট। স্কুল ও কলেজের শিক্ষা যোরহাটে সমাপ্ত করে সাংবাদিকতায় ব্রতী হন। 1965 পর্যন্ত সাহিত্য সাময়িকী 'আমার প্রতিনিধি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রূপে কাজ করেন। অতঃপর "নূতন প্রতিনিধি'র সম্পাদক। গল্প সংকলন ঃ 'অশ্লীল', 'রীতার প্রেম' 'বিয়ার প্রথম নিশা' ; আর উপন্যাস 'মনোর দাপন', 'ঘরর বিচারি', বিচারের বারে', 'কোনো খেদ নাই', 'জীবন এষণা', 'নজ্বলা ধূপর ইতিকথা', 'অবিবাহিতার মন', 'দুরন্তর চুমা'। কবিতা সংকলন ঃ 'শোন প্রিয়া মোর পরিচয়'। গীতের সংকলন ঃ "সপোন দেখো মই"। এছাড়াও ইবসেন, টুর্গেনিভ, হেনরি জেমস্ এবং কিছু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন।

# ফুলঝুরি

যুবকটির কথা বলার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা ছিল। প্রতারিত হওয়ার বেদনা উঁকি মারছিল তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে। এই বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য সরকার থেকে প্রায় এক কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। কথা ছিল স্থানীয় লোককে চাকুরি দেবে। এখন সবাই এসে নালিশ করেছে যে অসমীয়া কাউকে ওখানে চাকুরি দেওয়া হয়নি। আগেকার মন্ত্রী মশাইকে টাকা পয়সা খাইয়ে সেই চুক্তিটা নাকচ করিয়েছে কিনা কে জানে? কিছুই বিচিত্র নয়। তা যদি হয়েও থাকে, তবে তারও তো তদন্ত হওয়া দরকার, সত্য তথ্যগুলো জনসাধারণের জানা দরকার। নইলে তো শুধু শুধুই বর্তমান মন্ত্রীমশাইর দুর্নাম হবে। এই মন্ত্রীমশাই সৎ মানুষ, তাঁর তো অকারণে এ সমস্ত কথ্য সহ্য করার কথা নয়। জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে সেই জনসাধারণকেই প্রতারণা করার মত গর্হিত কাজ তিনি নিশ্চিয়ই করবেন না।

যুবক ক'জন সামনে বসা, মন্ত্রীমশাই মাথা নীচু করে চিন্তা করছেন। এবারে মুখ তুলে বললেন, "ঠিক আছে, তোমাদের কথা আমি বিশ্বাস করলাম। ব্যাপারটি আমি নিজে তদন্ত করে দেখব। আর যদি দেখা যায় যে—সত্যিই তারা অসমীয়া যুবকদের চাকুরি দেয় নি, তবে তার প্রতিকারও করব।"

কাছে বসে থাকা প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডেকে বললেন, "রাধা ইণ্ডাস্ট্রিজকে একটা খবর দিন তো, আগামী দু'তারিখ সোমবার আমি ওদের প্রতিষ্ঠানটি দেখতে যাব। প্রোগ্রামটা একবার দেখুন দেখি, সোমবারে যেতে পারব কি না।"

প্রাইভেট সেক্রেটারি এনগেজমেন্টের তালিকা দেখে জানালেন যে ইণ্ডাস্ট্রিটা যে শহরে সেখানে সকাল ন'টায় কংগ্রেসের একটা কর্মী-সভায় মন্ত্রী মহোদয়কে

যেতে হবে, আর বিকাল পাঁচটায় তাঁর নবনির্মিত কংগ্রেস ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করবার কথা।

"ঠিক আছে, তাহলে আমি বেলা দশটা নাগাদ ইণ্ডাস্ট্রিতে যাব, আর পাঁচটা পর্যন্ত ওখানেই থাকব। তন্নতন্ন করে সমস্ত খবর নিতে হবে। আপনি আজকেই জানিয়ে দিন।"

মন্ত্রীর সামনে বসে থাকা অভিযোগকারী যুবক ক'জন পুলকিত বোধ করল। এই নূতন মন্ত্রীর উপর জনগণের বিশ্বাস তাইতো দিন দিন বানের জলের মতো এমন উপচে পড়ছে। তারা খুশী মনে বিদায় নিল।

যথা সময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের জবাব এল। মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষ থেকেই মন্ত্রী মহোদয়কে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে মন্ত্রীমহোদয়ের শুভ পদার্পণে প্রতিষ্ঠানটি নূতন শক্তি সঞ্চয় করবে। এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নূতন একটি প্রকল্পকে স্বীয় পদধূলিস্পর্শে উৎসাহিত করার কথা যে মন্ত্রীমহোদয় বিস্মৃত হন নি, সেটা সম্ভবপর হয়েছে শুধুমাত্র তিনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, যথার্থ জনপ্রতিনিধি এবং অক্লান্ত কর্মী বলেই।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে। মন্ত্রীমহোদয় যেখানে উঠেছেন, নির্দিষ্ট দিনে সেখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দু'খানা দামী গাড়ী এসে উপস্থিত হল। গাড়ী দু'খানাতে শুধু মহিলারাই রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তার স্ত্রী এবং তাঁর যুবতী কন্যাও এদের সঙ্গে এসেছেন। মন্ত্রী বেরিয়ে এলে এরা সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। মন্ত্রীকে কর্মকর্তার স্ত্রী গাড়িতে তুলে নিলেন। এপাশে তিনি, ওপাশে তাঁর যুবতী কন্যা, মন্ত্রীমহোদয় বসেছেন মধ্যিখানে। গাড়ির মধ্যেই সুগন্ধি মশলা দেওয়া পানের থালা মন্ত্রীর সামনে এগিয়ে দেওয়া হল। তাঁর গালে একটা সরু সূতোর টুকরো ঝুলছিল, কর্মকর্তার যুবতী কন্যা তার কোমল অঙ্গুলি দিয়ে তা সরিয়ে দিলেন।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি গাড়ী সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, তার পেছনে মন্ত্রীবাহী গাড়ী, সবশেষে মন্ত্রীর নিজস্ব গাড়ীখানা, তার আরোহীর আসন অবশ্য শূন্য। সামনের গাড়ীর মহিলারা শিল্প এলাকার এক মাইল আগে থেকেই পাকা রাস্তার উপর খই আর ফুল ছড়িয়ে দিতে লাগলেন, মন্ত্রীবাহী গাড়ী চলল সেই খই আর ফুলের উপর দিয়ে। প্রতিষ্ঠানের সীমায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে গেল। পরপর চারখানি তোরণ, সবগুলোর উপরেই "স্বাগতম্" লেখা আছে। মন্ত্রীর গাড়ী অতি ধীরে সেগুলো অতিক্রম করল। প্রতিটি তোরণের দু'ধারে সুন্দরী যুবতীর দল দাঁড়িয়ে, তারা মন্ত্রীর গাড়ীতে ফুল ছুড়ল। রাস্তার দুধারে সারি সারি ঘর, শ্রমিকরা দরজা জানালার সামনে থেকে মন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে জয়ধ্বনি দিল। সোমবার বলে কারখানার কাজ চলছে, পুরুষ শ্রমিক যারা কাজ

ছেড়ে আসতে পারল না, তারা ভেতর থেকেই জয়ধ্বনিতে সামিল হল।

নির্দিষ্ট জায়গায় মন্ত্রীর গাড়ী এসে থামল। কর্মকর্তার স্ত্রী তড়িঘড়ি নামলেন। বড় একটা রঙিন কার্পেট পাতা, মন্ত্রীর গাড়ী থেমেছে তারই পাশে। মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে চারপাশে প্রায় পাঁচ'শ মহিলা দাঁড়িয়ে। ধূপধূনো জ্বালানো হয়েছে। একটা মাইক্রোফোন রয়েছে একপাশে। কর্মকর্তার স্ত্রী গাড়ী থেকে নেমে তাঁর গায়ের দামী কাশ্মিরী শালটি পেতে দিলেন কার্পেটের উপর। অতঃপর মন্ত্রীকে হাত ধরে নামিয়ে তার উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। ততক্ষণে ওপাশ থেকে কর্মকর্তার কন্যাও নেমেছেন। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মন্ত্রীর ঝকঝকে জুতোজোড়া অকারণেই তিনি মুছে দিলেন। চারপাশে প্রতীক্ষারতা মহিলারা এবারে এগিয়ে এলেন। একজন মন্ত্রীর কপালে ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, আরেকজন পরালেন পদ্মফুলের মালা। তারপর এত মালা মন্ত্রির গলায় চাপল যে তাঁর আর মাথা নোয়াবার ক্ষমতা রইল না। অতি সুন্দরী একটি যুবতী মন্ত্রীর উপর আতর ছিটিয়ে দিতেই মন্ত্রীমহোদয় একটি মালা খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন হাসি হাসি মুখে। অতঃপর কর্মকর্তার স্ত্রী মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে সুললিত ভাষায় মন্ত্রীকে স্বাগত জানালেন। উত্তরে মন্ত্রীমহোদয় তাঁর ভাষণে প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং শ্রমিক উভয় পক্ষেরই প্রশংসা করলেন। সেই সঙ্গে বিশেষ করে ভারতের নারীশক্তিকে সাধুবাদ দিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে দেশের প্রগতি নির্ভর করছে নারী-শক্তির জাগরণের উপর।

এগারোটা বাজল। এর পরের অনুষ্ঠান মন্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিদর্শন। অভ্যর্থনা মণ্ডপ থেকে কারখানার সদর দপ্তর হাত পঁচিশেক দূরে। কর্মকর্তার স্ত্রী মাইকে ঘোষণা করলেন যে এবারে মাননীয় মন্ত্রীকে প্রকল্প পরিদর্শনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তক্ষুনি তিনটি সুন্দরী মেয়ে এসে মন্ত্রীর সামনে দাঁড়াল। প্রথম জনের হাতে এক আঁটি পান, দ্বিতীয় জনের হাতে একটি কাঁচি, তৃতীয় জন অবশ্য শূন্য হাতে। প্রথমা একটি পান তুলে দিল দ্বিতীয়ার হাতে, সে কাঁচি দিয়ে পানের বোঁটা এবং গোড়ার একটু অংশ কেটে নিল। তৃতীয়া ঐ পানটি কার্পেটের উপর রাখল। অনুরোধ করা হল মন্ত্রীমহোদয় যেন তাঁর পা-টি দয়া করে ঐ পানের উপর রাখেন। গলায় ফুলের মালার বোঝা নিয়ে মন্ত্রীর আর ঘাড় নীচু করার উপর ছিল না। অতি কষ্টে নীচে তাকিয়ে তিনি একটি পা পানের উপরে রাখলেন। আবার পুরো অনুষ্ঠানটির পুনরাবৃত্তি করে আরেকটি পান কার্পেটে রাখা হল, মন্ত্রীর দ্বিতীয় পা তার উপর পড়ল। এভাবে এক একটি পানের দুদিক ছেঁটে মেয়েরা মাটিতে রাখছে, আর তার উপর পদরক্ষা করে হাঁটি হাঁটি পা পা কায়দায় মন্ত্রীমহোদয় অগ্রসর হচ্ছেন। রাস্তার দুপাশে জোড়া কলাগাছের সারি, প্রতি জোড়ার নীচে একটি করে মেয়ে, প্রতিটি মেয়ের হাতে

একজোড়া করে পায়রা। মন্ত্রীমহোদয় একবার করে পদ নিক্ষেপ করেন, আর মেয়েরা একজোড়া করে পায়রা আকাশে উড়িয়ে দেয়।

এই পদ্ধতিতে পঁচিশ হাত পথ অতিক্রম করতে আধঘণ্টা সময় লাগল। ইতিমধ্যে মন্ত্রীও গলদঘর্ম হয়ে পড়েছেন। প্রধান দপ্তরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কর্মকর্তারা সসম্মানে নমস্কার জানিয়ে মন্ত্রীকে নিয়ে প্রকল্প পরিদর্শনে বেরিয়ে গেলেন। শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে-কর্মে ব্যস্ত। কর্তৃপক্ষ মাননীয় মন্ত্রীকে প্রতিটি যন্ত্রের ক্রিয়া-কৌশল প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। বড় বড় যন্ত্রগুলির সামনে মন্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হল। বেলা একটা নাগাদ পরিদর্শন-কার্য সমাপ্ত হল। প্রধান দপ্তরের সামনে ফিরে আসার পর মন্ত্রীকে তোলা হল একটি জীপে। এবারেও মন্ত্রীর পাশে কর্মকর্তার স্ত্রী আর কন্যা। অন্য মহিলারা পেছনের গাড়ীগুলোতে উঠলেন। এবারে মন্ত্রীমহোদয় সদলবলে প্রতিষ্ঠানটির চতুস্পার্শ নিরীক্ষণ করলেন। শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে সরজমিন অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে দু'একটা শ্রমিক-নিবাসের ভেতরেও ঢুকে পড়লেন।

অতঃপর দুপুর দেড়টায় মন্ত্রীর মধ্যাহ্ন ভোজন। ভোজসভায় প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশনের দায়িত্ব মহিলারাই পালন করলেন। প্রধান কর্মকর্তা জানালেন যে প্রতিষ্ঠানের সবাই মন্ত্রীমহোদয়কে স্বচক্ষে দেখতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু সোমবার বলে সবাই কাজেকর্মে ব্যস্ত। তাই সকলে মিলে ঠিক করেছে যে অন্য একটা ছুটির দিনে মাননীয় মন্ত্রীকে আবার নিয়ে এসে তারা উৎসব করবে। বলা বাহুল্য, শ্রমিকদের মধ্যে মন্ত্রীমহোদয় যে কতখানি জনপ্রিয়, সে বিষয়ে অবহিত করতেও প্রধান কর্মকর্তার ভুল হয়নি। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তিনি একটু তাড়াতাড়ি করেই নিজের কাজে চলে গেলেন। মহিলারা মন্ত্রীকে একটি সুসজ্জিত শয়নকক্ষে নিয়ে এলেন। পরিপাটি করে বিছানো একটি শয্যা, কিছু ফলমূল ও এক গেলাস জল পাশে রয়েছে। সুশোভন এই শয়নকক্ষে মন্ত্রীমহোদয়ের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম। মন্ত্রীমহোদয় ডাকলেই যাতে সাড়া পান, তাই কজন মহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মন্ত্রীকে জানানো হল যে বেলা চারটায় একটা সভা রয়েছে। এটা একটা সাপ্তাহিক সভা, নিমমিত ভাবে প্রতি রবিবারে বসে। প্রতি সপ্তাহেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কাউকে না কাউকে নিয়ে এখানে আলোচনা হয়। মন্ত্রীর সম্মানে এ সপ্তাহের আলোচনাটি হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে। মন্ত্রীকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার জন্যে মহিলারা যখন বেরিয়ে গেলেন, মন্ত্রী দেখলেন বিছানার পাশে বইয়ের তাকে রবীন্দ্রনাথের বইগুলো সাজানো রয়েছে।

বিশ্রাম হল, চা পর্বও শেষ হল। ক'জন মহিলা মন্ত্রীকে সভাস্থলে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রীমহোদয় সভাপতি, রবিঠাকুরের বড় একটা ছবির পাশে তাঁর আসন। সভায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ হল, তাঁর বিষয় আলোচনা হল, আর

রবীন্দ্রবিশারদ মন্ত্রীমহোদয়কে সভাপতি হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করা হল। সভাপতির ভাষণে মন্ত্রীমহোদয় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন, কবি কি ভাবে মহাত্মা গান্ধীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, সে বিষয়ে আলোকপাত করলেন, আর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহিলারা যে রবীন্দ্রনাথের মূল্য যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করেছেন, তার দরুন আনন্দ প্রকাশ করলেন। বলা দরকার, পুরুষমানুষের মধ্যে শুধু মন্ত্রী আর কর্মকর্তাই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্য সবাই যে যার কাজেকর্মে ব্যস্ত।

পাঁচটা বাজল, এবারে বিদায়ের পালা। তক্ষুনি কারখানার ছুটির ঘণ্টাও বাজল। হাজার মানুষ এসে মন্ত্রীর গাড়ী ঘিরে ধরল। ধাক্কাধাক্কিতে অবস্থা এমন হল যে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্যে মন্ত্রী নিজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চারদিক থেকে একটাই চিৎকার ঃ "আমরা মন্ত্রীমশাইকে দেখব।" উপায়ন্তর না দেখে দুটি মেয়ে কোত্থেকে একটা চেয়ার খুঁজে আনল। মহিলারা বলিষ্ঠকায় মন্ত্রীমশাইকে ধরাধরি করে চেয়ারের উপর তুলে দিলেন। তাঁরাই তাঁকে চারপাশ থেকে ধরে রাখলেন যদি পড়ে যান। মন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠল। জোড়হাতে তিনি সবাইকে নমস্কার জানালেন, মুখে মৃদুমন্দ হাসি। তারপর একজন মহিলার কাঁধে ভর দিয়ে তিনি চেয়ার থেকে নামলেন। জনতার উচ্ছ্বাস উল্লাসের মধ্য দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ী ধীরে ধীরে রওয়ানা হল। গাড়ীতে সমাসীন হয়ে মন্ত্রী আবার সবাইকে হাসিহাসি মুখ করে জোড়হস্তে নমস্কার জানালেন। তখন সন্ধ্যা নামছে মাত্র, সেই আধো অন্ধকারেই মন্ত্রীর গাড়ীর পাশে ফুলঝুরি জ্বালানোর ধুম পড়ে গেল।

স্থানীয় লোকের চাকুরির যে ব্যাপারটার তদন্তের জন্যে মন্ত্রীমহোদয় রাধা ইন্ডাস্ট্রিজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, সে কাজটা কিন্দু আদৌ করা হল না। সে কথাটাই তাঁর মনে পড়ল অনেকদিন পর, যেদিন সেই অভিযোগকারী যুবক ক'জন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। সেদিন মন্ত্রীমহোদয় আর তাদের সঙ্গে দেখা করলেন না, বলে পাঠালেন যে আজ তিনি বড় ব্যস্ত। ❑

নিরোদ চৌধুরী

জন্ম 1937, ডুমডুমা। কটন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে 'আসাম ট্রিবিউন' ও 'অসম বাণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে নিয়োজিত রয়েছেন। গল্প সংকলন ঃ অঙ্গে অঙ্গে শোভা, মোর গল্প, হংস মিথুন, বায়ু বহে পূরবৈয়া, প্রথম প্রহর, সোনা পরুয়া। উপন্যাস ঃ মন প্রজাপতি, দেবী, পানী, কুকুহা, স্তব্ধ বৃন্দাবন, কালহীরা, দেহ দেউল, বনহংস, জটায়ু, নষ্টচন্দ্র। "অসমীয়া প্রেমেব গল্প" নামে একটি সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক।

# ললিতা বনাম কান্তা

একটা গল্প লিখতে তুমি সব সময়ই বলছ, আর বলছ ভাল গল্প লিখতে। গল্প একটা হয়তো লিখতে পারি, কিন্তু ভাল গল্প লেখার নিশ্চয়তা তোমাকে কি করে দিই? তোমার আমার প্রেমের কথা যদি ফলাও করে লিখি, তুমি বাধা দেবে। বলবে, শুধু তোমার কথাই আমি লিখছি। আর যদি গুয়াহাটির জুবিলী রোডের মিতালী দত্তের সেই কেলেংকারির কাহিনীটি বলি, তুমি বলবে, এ তো সেই মামুলী প্রেমের গল্প। অথচ কার কথা আমি লিখব। মিতালী দত্তের গল্প বললে বলা যাবে না ডিব্রুগড়ের প্ল্যাটফর্মে দেখা হওয়া সেই অসমীয়া মেয়েটির দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। আবার যোরহাটের ভায়োলীনা বরুয়ার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেই দশ বছরের মেয়েটির কথাই বা না বলে থাকি কি করে? আরো কত রয়েছে সুমিতা চৌধুরী, শ্রুবাবতী হাজরিকা, শর্মিষ্ঠা দত্ত আরো কত। আরো অ-নে-ক। বহু কথা রয়েছে বলার। বহু কথা রয়েছে লেখার। বহু ঘটনা রয়েছে জানাবার মতো।

মিতালী দত্ত, সুমিতা চৌধুরী অথবা শ্রুবাবতী হাজরিকার গল্প আমি পরে বলব। আজ অন্য একটা কাহিনী বলি। কাহিনীর নায়ক নায়িকা এখনও জীবিত। হয়তো তোমার সঙ্গে কোনো একটা চা বাগানের একটা বাংলোর বারান্দায় বসে বিরাট একটা এ্যালসেশিয়ান কুকুরের উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে এই গল্পের নায়কও এই গল্পটি পড়ছে, আর নায়িকা হয়তো সেই একই বাংলোর একটা ঘরে পাশাপাশি পাতা, দুটো বিছানার একটায় শুয়ে আটমাসের একটা শিশুকে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে। এই বইটা তার সামনে ফেলে দিলেও নায়িকা বুঝবে না যে এখানে তার কথাই আমি লিখেছি। জানবে না যে ছোট কালো কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে শুধু তার কথাই নিহিত রয়েছে, নারীমনের অলিখিত এক বেদনার কাহিনী।

এই গল্প আমি শুনেছিলাম নায়িকার নিজের মুখে। সে এক বর্ষামুখর দিন। গল্পের নায়িকা একজন কুলি যুবতী। নায়ক বাগানের একজন ম্যানেজার। তুমি ভাবছ এ আর কি নূতন গল্প! এখন ম্যানেজারের বাংলোয় কোনো কাজে মেয়েটি যাবে। প্রথম দিন ম্যানেজার জিজ্ঞেস করবে "তোর নাম কি?" পরদিনই কুলিকামিনদের

সর্দারনীকে ডেকে এনে বলবে ঐ মেয়েটিকে যেন তার বাংলোয় কাজ করতে পাঠায়। একদিন দুদিন যাওয়ার পর মেয়েটি ধীরে ধীরে ম্যানেজারের কাছে ঘেঁষবে এবং একদিন সুযোগ বুঝে ম্যানেজার সেই মেয়েটিকে...।

দাঁড়াও, তুমি ঠিকই ভেবেছ যে একদিন কুলি মেয়েটির দেহের রঙ কাদামাটির পাখীর রঙের মতই ম্যানেজারের হাতের স্পর্শে উঠে যাবে। সেদিন হয়তো সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে। একটা হল ম্যানেজার মেয়েটিকে বিয়ে করবে, দ্বিতীয়টি, কিছু টাকা পয়সা দিয়ে মুখ বন্ধ করে অন্যের সাথে তার বিয়ে দেবে। এমন গল্প তুমি অনেক পড়েছো। চা-বাগানের কুলি মেয়ের সঙ্গে ম্যানেজারের অবৈধ প্রণয়, সংসর্গ বা বিয়ের অনেক গল্প তুমি পড়েছো। কিন্তু আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি তা শুধু প্রেমের গল্প নয়। শুধু দেহের আকর্ষণের জ্বালা এর উপজীব্য নয়। এটা এক নারী-হৃদয়ের অকথ্য বোবা বেদনার জীবন্ত কাহিনী। সে গল্প আমি নীরবে শুনেগিয়েছিলাম। কখনও ভাবি নি এ নিয়ে কখনও গল্প লিখব বলে। আমার সামনের দুটো বিছানার একটাতে একটি শিশু শুয়ে রয়েছে। আরেক বিছানায় এক কোণে বসে এই গল্পের নায়িকা। রঙিন শাড়ি পরনে, নাকে ছোট্ট একটা সোনার ফুল, কপালে বড় করে দেওয়া সিঁদুরের ফোঁটা, দেখতে অপরূপ না হলেও একবার চোখ পড়লে আবার তাকাতে ইচ্ছা হয়। মেয়েটি বসেছিল। আর আমাকে বলে গিয়েছিল তার কাহিনী, ছোট ছোট বাক্যে—ভাষা ভাঙ্গা অসমীয়া, কুলিদের ভাষা মেশানো। আমি মাত্র দুহাত দূরে বসে শুনে গিয়েছি কোনো প্রশ্ন না করে—শুধু উঠে আসার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু কি জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কথা এখন থাক। সে কথা পরে বলব। আগে কি করে তার সঙ্গে দেখা হল তাই বলি, শোন...।

ডুমডুমা থেকে কিছু দূরে একটা চা-বাগান। চেনা বাগান। বন্ধে বাড়ি গেছি, মাকে বললাম সেখানে এমনি বেড়াতে যাচ্ছি। বাগানটির প্রতি অবশ্য আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতাও ছিল। কারণ কোনো এক সময়ে সেখানে আমি থাকতাম, আমার শৈশবের হাজার স্বপ্ন সেখানেই ডানা মেলেছিল। ধরে নেওয়া যাক বাগানটির নাম নাহরনি। ছোট বাগান। শহর থেকে দূরে, রেল ষ্টেশন থেকেও। দেড়শ'র মতো শ্রমিক কাজ করে। একজন হেড ক্লার্ক, একজন সেকেণ্ড ক্লার্ক, দু'জন মুহুরি আর কজন কুলি-সর্দার নিয়ে বাগানের অফিস। বাগানের একমাথায় একটা ছোট স্কুল ঘর, তার পাশে একটা মুদির দোকান। কলঘরটির পাশে বাবুদের কোয়ার্টারের সারি। তার মধ্যে একটু আলাদা করে বড়বাবু আর ডাক্তারের কোয়ার্টার দুটো। বাগানের উত্তর দিকে দু'সারি নারকেল গাছের মধ্য দিয়ে সুন্দর একটি বাংলো, খড়ের চাল। সেটাই ম্যানেজারের বাংলো। সামনে বিরাট ফুলের বাগান, তাতে রঙ-বেরঙ-মরশুমি ফুল। ম্যানেজারের বাংলোর পিছনে কিছুদূর গেলে বাগানের

কলঘরটি দেখা যায়। কলঘরটির কিছু দূরে কুলি লাইন। অফিসের পাশে খোলা একটা চত্বরে প্রতি শনিবার ছোট একটা হাট বসে। মাইনে পাওয়ার সেই দিনটাতে কুলিদের বুকে আনন্দের মাদল বাজে। আনন্দের আতিশয্যে তারা হাড়িয়া খায়, সন্ধ্যায় ঝুমুরের আসর বসে, অশ্লীল কথার স্রোত বয়।

এই নাহরনি বাগানে আমি গিয়েছিলাম আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। সঙ্গে আমার বোন দুটি ছিল। রেলষ্টেশন থেকে সকাল দশটা নাগাদ বাগানের কয়লা কুচি আর পাথর মেশানো নিজস্ব রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করি। আসার সময়ে মা বলে দিয়েছিলেন সে নাহরনি বাগানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগের সেই রমরমা অবস্থা আর নেই। কারবারে ভাঁটা পড়েছে। আরো বলেছিলেন নাহরনি বাগানের ম্যানেজারের কথা, ক'বছর হল কুলি মেয়ে একটা ওর কাছে রয়েছে। আমি আশ্চর্য হইনি, আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি। কিন্তু আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না যখন মা আমাকে অন্য একটা কাহিনী শোনালেন। ডুমডুমাতে প্রত্যেক রোববার হাট একটা বসে। আশেপাশের বাগানের সমস্ত কুলিকামিন তাতে হাট করতে আসে। নাহরনি থেকেও লোক আসে। একদিন রোববারে আমাদের বাড়িতে একটি মেয়ে এসেছিল—কুলি মেয়ে। মা দেখেই চিনতে পেরেছিলেন যে ও হল নাহরনি বাগানের বুধন সর্দারের মেয়ে। বাবার যখন নাহরনি বাগানে দোকান ছিল, তখন থেকেই বুধন সর্দারের সঙ্গে পরিচয়। সেই সূত্রে এখনও কখনো কখনো বুধন বা তার বৌ ডুমডুমা এলে আমাদের বাড়িতে দেখা করে যায়। একটু গল্পসল্প করে, তারপর চলে যায়। সেদিনও মা বুধন সর্দারের মেয়েকে বাইরে একটা মোড়ায় বসতে দিলেন। মেয়েটি মাথা থেকে একটা পোটলা নামিয়ে মায়ের হাতে দিল। ভেতরে নিয়ে পোটলাটা খুলে বোনেরা পেল কয়েকটা করলা, দুটো চালতা, কিছু কাঁচা লঙ্কা আর আধ সেরের মতো তেঁতুল। মা মেয়েটিকে চা খেতে দিলেন, সঙ্গে আর কারা এসেছে জিজ্ঞেস করলেন। মেয়েটি চা খেতে খেতেই বাবা এলেন, এসেই মায়ের উপর ক্ষেপে গেলেন। মাও কথাটা জেনে বড় লজ্জা পেলেন। বাবা বললেন যে মেয়েটি নাকি এখন ম্যানেজারের স্ত্রী। তাকে সাধারণ কুলি মেয়ের মতো বাইরে বসতে দেওয়া বা এলুমিনিয়ামের গ্লাসে চা দেওয়াটা আদৌ ঠিক হয়নি। মা তখন তড়িঘড়ি মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন, "মিনি, তোর কথা তো আমি জানতাম না, রাগ করিস নি।" হেসে হেসে বুধন সর্দারের মেয়ে জানায় যে সে খারাপ পায় নি। একটুও নয়। তারপর বলেছিল, "সাহেবের বৌ হলেও তোমাদের কাছে আমি আগে যা ছিলাম, তাই থাকব।"

যে সময়টুকু ও বসেছিল, তাতেই বলেছিল ওর বিয়ের কথা, সঙ্গে ওর সোনার হার, কানের ফুল, হাতের বালা সবই দেখিয়েছিল। এগুলো সাহেব ওকে দিয়েছেন

মাত্র গত মাসে। আরো বলেছিল যে সাহেব আজকাল ওর বেশি চলাফেরা করাটা পছন্দ করেন না। দুদিন হল সাহেব ডিব্রুগড় গেছেন। তাতেই ও বাজারে আসার সুযোগ পেয়ে গেছে। ওর সঙ্গী মেয়েরাও এসেছে। তারপর চায়ের গ্লাসটা নিজের হাতে ধুয়ে ছাতাটা কাঁধে নিয়ে গম্ভীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছিল বুধন সর্দারের মেয়ে। ভুল বললাম—নাহরনি বাগানের মেমসাহেব।

নাহরনি বাগানের নূতন এই মেম সাহেবের গল্প শুনে কেন জানি না আমার মনের কোণে একটা তার রিমঝিম করে বেজে উঠেছিল। একজন সামান্য অশিক্ষিত কুলি মেয়ের অদ্ভুত পরিবর্তন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই নাহরনি বাগানের কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবছিলাম যে উপায়েই হোক নাহরনি বাগানের নূতন মেমসাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। আসার সময় মা বলে দিয়েছিলেন, "সময় পেলে ম্যানেজারের ওখানে একবার যাবি।" আর আমি ভাবছিলাম যে সময় না পেলেও আমি যাব, যেতেই হবে।

আমি গিয়েছিলাম। মেমসাহেবের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল, কথাও হয়েছিল। নাহরনি বাগানের মেমসাহেবের সঙ্গে সেদিন আমি অনেকটা সময়ই কাটিয়েছিলাম। বোনদের বাইরের একটা ঘরে বসতে দিয়ে রেডিয়োগ্রামটা বাজিয়ে দিয়ে নাহরনি বাগানের মেমসাহেব আমার সঙ্গে অনেক কথাই বলেছিল। আমি নির্বাক হয়ে শুনেই গেছি শুধু। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। প্রথমে মৃদু, তারপরে অঝোরে। কি জানো, কোনো সঙ্কোচ না রেখেই কথা বলছিল। যেন অতি আপন পরিচিত একজন মানুষের কাছে মনের নিবিড় সব কথা বলছে। নাহরনি বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সামনে গিয়ে আমি প্রথমে দেখলাম বিরাট সবুজ রঙের গেটটা যেন তালাবন্ধ রয়েছে। উঁকি মেরে ভেতরের দিকেও কাউকে দেখতে পেলাম না। সামনের রাস্তা ছেড়ে পেছনের দিকে ঘুরে যেতে কার যেন গলা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। বাংলোর পেছন দিকের একটা ছোট্ট খড়ের ঘর থেকে একটা ছেলে জিজ্ঞস করল, "কাকে লাগে?" আমি এগিয়ে এসে বললাম যে ম্যানেজারকে খুঁজছি। ছেলেটি জানাল যে ম্যানেজার এখন নেই, সকালে ডিগবয় গেছেন, সন্ধ্যায় ফিরে আসবেন। যদি দেখা করতে হয় তবে কাল সকালে আসতে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে খড়ের ঘরের পাশ থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। বোনেরা আমার গায়ে চিমটি মেরে জানাল যে এই সেই ম্যানেজারের স্ত্রী। আমি কিছু বলার আগেই বুধন সর্দারের মেয়ে বোনদের চিনতে পেরে এগিয়ে এল। ছেলেটিকে দিয়ে পেছনের গেটটা খুলিয়ে আমাদের ভেতরে যেতে বলল। বোনেরা এগিয়ে গেল। আমি পেছনে। আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর অসমীয়ায় বলল, "দাদা, তাই না?" আমি নমস্কার করলাম। প্রতিনমস্কার জানিয়ে আমাকে বাংলোর ভেতরে নিয়ে গেল।

বেশ খোলামেলা একটা ঘর, চারদিকের সব দরজা জানালা বন্ধ, শুধু আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছি সেই দরজাটা খোলা। ঘরে পাশাপাশি দুটো বিছানা। এক কোণে ছোট একটা আলমারি, একটা আলনা। অন্য কোণে একটা স্টোভ। রান্নার কিছু সাজ সরঞ্জাম, একটা মাটির কলসী। আমি অবাক হয়ে ঘরটির দিকে তাকিয়ে ভাবলাম এই বুঝি নাহরনি বাগানের মেমসাহেবের ঘর? একটি বিছানায় আন্দাজ আট মাসের একটা শিশু জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে। অন্য বিছানায় দু'বছরের আরেকটা ছেলে প্লাস্টিকের একটা পুতুল নিয়ে খেলছে। ঘরের মধ্যে একটা মৃদু দুর্গন্ধ আসছে, কিন্তু কোত্থেকে তা ধরা যাচ্ছে না। দরজা জানালায় পর্দা রয়েছে কিন্তু সেগুলো কোনোদিন হাত দেওয়া হয়নি। ধূলা মাটিতে সেগুলো মলিন হয়ে রয়েছে। আমাকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়েছিল আর তারপর বলেছিল...।

কি বলেছিল তাই তোমায় বলতে চলেছি। সত্য কথা বলতে কি আমি একটু আঘাত পেয়েছিলাম। নাহরনি বাগানের মেমসাহেবকে অন্তত ঠিক এই ধরনের অস্বাভাবিক একটা পরিবেশের মধ্যে আশা করিনি। কিংবা এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে তাকে অবিষ্কার করতে চাইনি। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবছিলাম কি দরকার ছিল এ সবের মধ্যে ঢোকার? একটু পরই উঠে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নাহরনি বাগানের মেমসাহেব উঠতে দিল না। কোনো কিছু না খাইয়ে আমাদের ছাড়বে না। আমার চোখের সামনেই স্টোভ জ্বালিয়ে চা করল, জলখাবার করল, আমাকে খেতে দিল আর সেই অবসরে অনেক কথাই বলল। অনেক কথা। আজ তোমাকে সেসব কথা বলতে গিয়ে ভাবনাগুলো সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।...কোত্থেকে আরম্ভ করব ভেবে পাচ্ছি না......নাহরনি বাগানের মেমসাহেব সেদিন যা বলেছিল তা আমার ভাষায় বলছি শোনো......।

ধরে নেওয়া যাক যে নাহরনি বাগানের মেমসাহেব, বুধন সর্দারের সেই মেয়েটির নাম সোনিয়া। এই সোনিয়ার বয়স তখন পাখা-গজানোর বয়স, উড়ে বেড়ানোর বয়স। নাহরনি বাগানের কুলি মেয়েদের মধ্যে সোনিয়াই দেখতে সবচেয়ে সুন্দরী। সে কথা যে সোনিয়ার বন্ধুরাই শুধু বলত তা নয়, বাগানের বাবু মুহুরি সবাই তা স্বীকার করত। মেয়ের এই সুখ্যাতিতে বুধন সর্দারের বুক দশ হাত হয়ে উঠত। সোনিয়াকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। কিন্তু সোনিয়ার রূপের গর্বে সব চাইতে গৌরবান্বিত ছিল তার মা লছমী। অবশ্য অকারণে নয়। লছমী নিজেও ছিল সুন্দরী। তার মতো রূপ হঠাৎ চোখে পড়ে না। অনেকে বলত লছমী এখনও সোনিয়ার চাইতে সুন্দরী। যাই হোক, লছমী তার মেয়ে সোনিয়ার সৌন্দর্যের জন্য গর্বিত ছিল এবং সেই গর্বের দরুনই সোনিয়াকে বাগানের অন্য দশটা মেয়ের মতো চা-তোলার কাজে লাগায় নি। সোনিয়া এমনি ঘরে বসে থাকত। সোনিয়ার এই রূপের গর্বে অন্যদের হিংসা হত। হলেও তাতে বুধন সর্দার বা তার বৌ ভ্রূক্ষেপ করত না।

সোনিয়ার নিজের কিন্তু এই ঘরে বসে থাকাটা ভাল লাগত না। কাজকর্ম নেই, গোটা দিন কাটানোই ছিল একটা সমস্যা। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহসও ছিল না। বাবাকে কোনো কোনো সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হয়তো বা বলত, কিন্তু মাকে বলতে ভয় পেত। তাই সে চুপচাপ থাকত। আরেকটা কারণে সে মাকে ভয় পেত। অবশ্য ঠিক ভয় নয় মাকে তার খারাপ লাগত। সে হচ্ছে তার বিয়ের ব্যাপার। লছমীর খুব ইচ্ছা আগামী ফাগুয়ার আগেই সোনিয়ার বিয়ে দিয়ে দেয়। তার জন্য অবশ্য লছমী ছেলে একটা দেখে রেখেছে—বিছাকুপি বাগানে। লছমীর উৎসাহ থাকলেও বুধন সর্দারের কিন্তু এত শিগ্‌গির মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা নেই। বুধন বলে এত তাড়াতাড়ি সোনিয়ার বিয়ে দিলে সে বড় একা হয়ে পড়বে। লছমী রাগ করেছিল, কিন্তু সোনিয়া খুশি। তারও ইচ্ছা নেই এত তাড়াতাড়ি কারো হাতে ধরা পড়ে। বিয়ে হলেই পরের বছর ছেলে হবে। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা......। সোনিয়া এই বন্ধন চায় না। একটু খোলা বাতাস, চঞ্চল সময়ের একটু কাঁপুনি, সামান্য একটু মিষ্টি হাসি কারো বা, এগুলো পেলেই আপাতত তার যথেষ্ট। আর একদিন যখন বিয়ে হবেই, তখন এত তাড়াহুড়োর কি আছে?

তাড়াহুড়োর প্রয়োজন যে রয়েছে সে কথা কিন্তু কদিন পরেই সোনিয়া বুঝল। আর এই প্রয়োজন কিসের তাড়নায় তাও বুঝল। ঘটনাটা এই ধরনের ঃ একান সেকান হয়ে সোনিয়ার কানেও পৌঁছেছিল সে বাগানের ম্যানেজার আজকাল সময়ে অসময়ে লছমীকে তার অফিসে কিংবা বাংলোয় ডেকে পাঠান। নানা কাজের অজুহাত দেখিয়ে লছমী যায়ও। প্রথমে কেউ কিছু মনে করেনি। কিন্তু সেদিন শনিবার হাট সেরে আসার পথে তাদের লাইনের কজন মেয়ে-পুরুষ দেখে এল যে সাত নম্বর লাইনের পাকা কলটার কাছে সন্ধ্যেবেলা ম্যানেজার লছমীর সঙ্গে কথা বলছে। মানুষের দেখা পেয়ে অবশ্য ম্যানেজার সরে যায়, লছমীও।

সোনিয়া শুনেছিল কথাটা তার সঙ্গের মেয়েদের কাছে। সে জানত এমন একটা কিছু হবেই। বাগানের ম্যানেজারকে সে কোনো দিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। ম্যানেজারকে দেখলেই ও বুঝত লোকটা সুবিধার নয়। সোনিয়া এটাও লক্ষ্য করছিল যে লছমীর আজকাল সাজগোজের সখ বেড়ে গেছে, নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার দিকে এখন ওর মনোযোগ বড় বেশি। সোনিয়া নিজেই দেখেছে যে লছমী আজকাল কেনা বডিস পরে, আঁটসাঁট করে রঙিন শাড়ি পরে কাজে যায়। তাই এসব কথা শুনে সে তেমন আশ্চর্য হয় নি, যদিও দুঃখ পেয়েছিল খুব। তার সহজ সরল বাবার কথা ভেবে কিছু সময় কেঁদেও ছিল। তবুও সে নিরুপায়। মায়ের সঙ্গে কথা বলার সাহস তার ছিল না।

কিন্তু আসল ঘটনা ঘটল তার কিছু দিন পর। সেদিন রোববার। বিকেল বেলা মা ও বাবা দুজনেই ফিরছিল ডুমডুমার হাট থেকে। বাড়ি এসে বুধন সঙ্গী একজনের

সঙ্গে আবার বেরিয়ে যায় আরো হাড়িয়া খাবে বলে। এ দিকে সোনিয়া আর লছমী খাওয়া দাওয়া সেরে শোবার যোগাড় করছিল। হঠাৎ লছমী সোনিয়াকে বলল যে ওর বাপ রাতে এসে বাইরে বসে থাকতে পারে, তাই ও আজ বাইরের দিকের ঘরটায় ঘুমাবে। সোনিয়া ভেতরে শুয়ে থাকুক। সোনিয়া মেনে নিল। কারণ সোনিয়া জানে যে মদ খেয়ে বাবা যদি বাড়িতে ফিরেও আসে, তবুও কেউ নিজে উঠে দরজা খুলে না দিলে বাইরের বারান্দায়ই পড়ে থাকবে—তবু কাউকে ডেকে বিরক্ত করবে না।

তখন রাত কত সোনিয়ার মনে নেই। কার যেন কথা শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটুক্ষণ বিছানায় বসে সে বেড়ার ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকাল। সোনিয়া দেখল যে বারান্দায় যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে আর কেউ নয়—বাগানের ম্যানেজার। আস্তে আস্তে সে লছমীর নাম ধরে ডাকছে। সোনিয়া একটুক্ষণ কেটে ফেলা গাছের মতোই বসে পড়ল। ছিদ্রটা থেকে চোখ সরাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বাইরে চাঁদের ম্লান আলোয় দেখল যে ম্যানেজার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু পরে সে আবার লছমীর নাম ধরে ডাকল। সোনিয়া বুঝল যে মায়ের সঙ্গে আগেই ব্যবস্থা ছিল, কারণ বাবা চলে যাওয়ার একটু পরেই লছমীও বাইরে গিয়েছিল। হয়তো তখনই....।

কিন্তু মা দরজা খুলে দিচ্ছে না দেখে সোনিয়া আশ্চর্য হল। ভিতরের দরজা একটু ফাঁক করে সোনিয়া দেখল যে মা শুয়ে রয়েছে। হয়তো ঘুম একটু বেশি গভীর হয়ে গেছে, কিছুই জানতে পারছে না। সারা দিনের ক্লান্তি, তদুপরি মদ।......সোনিয়া দেখল যে মা সেই নূতন রঙ্গীন শাড়িখানা পরে শুয়েছে। নাকের মৃদু শব্দ হচ্ছে, হয়তো হাত দু'খানা বুকের উপর রয়েছে।

সোনিয়ার প্রথমে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। ডেকে মাকে তুলে দিতে পারত, কিন্তু দিল না। আশেপাশের সবাইকে জাগিয়ে তুলে একটা স্থলুস্থূল করতে পারত, কিন্তু তাও করল না। নতুবা সামনা-সামনি মায়ের সামনে ম্যানেজারকে প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারত, কিন্তু তাও করল না। তার বদলে সোনিয়া একটা অদ্ভুত কাজ কলল। শাড়িটা ভাল করে পরে চাদর একটা মাথায় মুড়ে পা টিপে টিপে সে বাইরে বেরিয়ে এল। মা জাগেনি। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতে ম্যানেজার তাকে জড়িয়ে ধরল, আর বাধা দেওয়ার আগেই মুখে একটু চুমু খেল। ম্যানেজারের হাত ধরে সে বাইরে বেরিয়ে এল, কোনো কথাবার্তার সুযোগ না দিয়ে। বেরিয়ে এসে বলল যে সে সাহেবের বাংলোয় যাবে।

সেদিন রাতে নাহরনি চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলোয় যাওয়ার রাস্তাটায় যদি তোমার কিংবা আমার চোখ পড়ত তাহলে দেখা যেত চা গাছের মধ্য দিয়ে সেই পথে আগে আগে যাচ্ছে ম্যানেজার আর তার পিছু পিছু যাচ্ছে একটা মেয়ে।

বাংলোয় ঢুকে সাহেব নিজের ঘরে মেয়েটিকে নিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে আলোটা জ্বালতে যেতেই মেয়েটি বাধা দিল। আর তারপর নাহরনি বাগানের সেই বাংলোর অন্ধকার কোঠার বুকে এক চিরন্তন ইতিহাস রচিত হয়ে গেল। সোনিয়া যা বলেছিল তা আমার ভাষায় লিখলে দাঁড়ায় এই রকম ঃ ম্যানেজার সাহেব আমাকে লছমী ভেবে অনেক কথা বলেছিলেন। আঁধারে আমাকে আদর করতে করতে দুবার উঠে গিয়ে মদ খেয়ে এলেন। ম্যানেজারের কথা থেকে জানতে পারলাম সেই রাতেই মায়ের সর্বনাশের রাত হিসাবে ঠিক করা ছিল। সাহেব আমাকে বলেছিলেন— "লছমী, তোকে আমি বিয়ে করতে তো পারব না, কিন্তু আমার কাছে তোকে সব সময়ই আসবে হবে—বল আসবি।" আমি মাথা নেড়ে আসব বলে জানিয়ে দিলাম। তারপর আমি আমার অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলাম, এক সর্বনাশী অক্টোপাশের মতো দৃঢ় বন্ধনে আমি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলাম।

এটুকু পর্যন্ত বলে নাহরনি বাগানের মেমসাহেব চুপ করে গিয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম, সোনিয়া সেদিন সাহেবের উপর এক নিদারুণ প্রতিশোধ নিয়েছিল। আভিজাত্যের গৌরবে গর্বিত যে মানুষটি একজন বিবাহিতা নারীর জীবন নষ্ট করতে চেয়েছিল, আঠারো বছরের এক কুলি মেয়ে তার উপর নিষ্করুণ এক প্রতিশোধ নিয়েছিল। কিভাবে? বলছি শোনো—

পরদিন ভোর বেলাই ম্যানেজার বুঝেছিলেন যে তিনি ভুল করেছেন। লছমী মনে করে যে মেয়েটির সঙ্গে তিনি রাত কাটিয়েছেন, সে লছমী নয়, তার মেয়ে। সাবধানী ম্যানেজার নানা লোভ দেখিয়ে সোনিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সোনিয়া সে সব কথা শুনল না। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলোয় যারা কাজ করে তাদের সবাইকে সে জানিয়ে দিল যে সাহেব তার ইজ্জত নষ্ট করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলোর সামনে উত্তেজিত কুলির ভীড় জমে গেল, তাদের দাবী সোনিয়াকে সাহেবের বিয়ে করতে হবে, নইলে—।

সোনিয়াকে বিয়ে করতে নাহরনি বাগানের ম্যানেজারকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছিল। কুলিরা সব শান্ত হয়ে ঘরে গেল। তারা মন্তব্য করল—"বুধন সর্দারের মেয়ের কোনো দোষ নেই, বৌটার জন্যই এমন হল। লছমীর নসীব ভাল। লছমীর মেয়ের নসীবও ভাল।" কিন্তু কেউ বুঝল না যে মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য বুধন সর্দরের মেয়ে স্বেচ্ছায় এই ঘৃণার জীবন বরণ করে নিয়েছিল। নিজের ভবিষ্যৎ বিধাতার হাতে সঁপে দিয়েছিল।

নিজের কাহিনী শেষ করে সোনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। কাঁদা উচিত ছিল, কিন্তু কাঁদে নি। অল্প হেসে বিছানায় শোয়া শিশুটিকে দেখিয়ে বলল—"একেবারে বাপের মতো হয়েছে।" জড়োসড়ো শুয়ে থাকা শিশুটির দিকে তাকালাম—নিষ্পাপ শিশু-মুখ। সোনিয়া আমাকে বলল যে সাহেব তাকে ভালবাসেন না সত্যি, তবে

ঘৃণাও করেন না। তার হাতের রান্না সাহেব খান না। তার জন্য স্বতন্ত্র একটা ঘর দিয়েছেন, যদিও সাহেব দিনে এখানে আসেন না। ছ'বছরের আর তিন বছরের ছেলে দুটো সাহেবের সঙ্গে থাকে, তাদের এদিকে বড় একটা আসতে দেওয়া হয় না। আজ পাঁচ বছর হল সে ম্যানেজারের বাংলোর বাইরে যায় নি। এমন কি গত বছর রক্তবমি করে তার মা যখন মারা গেল, তখনও নয়। তার বাবা এই বাগান ছেড়ে কবেই চলে গেছে। কোথায় গেছে তা নাহরনি বাগানের মেমসাহেব জানে না।

বাহিরে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি চলে আসার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সোনিয়া বলল—"কি হবে আর এই সব কথা শুনে। সব ভুলে যাবেন।" আমি উত্তর দিই নি। বোনদের নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় জিজ্ঞেস করলাম—"ছেলেগুলো আপনাকে ভাল বাসে তো?" সোনিয়া হেসে বলল—"বাসে।" আমি বুঝলাম যে এই হাসি মাতৃত্বের গৌরবের হাসি। বাইরের গেট খুলে দেওয়ার জন্য এক জনকে ডেকে দিল, তারপর সোনিয়া নিজেও আমাদের এগিয়ে দিতে সঙ্গে চলল। বাইরের বাগানে দুটি সুন্দর ছেলে একটা পাখি ধরা জাল নিয়ে খেলছিল। অচেনা মানুষ দেখে থেমে গেল। আমি হাত দিয়ে বড়টিকে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম,—"কি নাম তোমার?" সুন্দর ইংরেজিতে নাম বলল। "কোথায় পড়?" জিজ্ঞেস করায় জানলাম যে বাড়িতে বাবাই পড়ান, স্কুলে যায় না। আমি ছেলেটিকে আদর করে ইঙ্গিতে দূরে দাঁড়ানো নাহরনি বাগানের মেমসাহেবকে দেখিয়ে বললাম—"হু-ইজ শি, মাই বয়?"

সোনিয়া হেসে তাকাল, ছেলেটা দৌড়ে সোনিয়ার কোলে উঠল, তারপর চেঁচিয়ে বলল—"আয়া, প্লিজ হেল্প মি, ঐ পাখিটা আমায় ধরে দাও না।"

গেটখানা বন্ধ করে আমি চলে এলাম। ❐

**অপূর্ব শর্মা**

জন্ম 1943, তেজপুর, হেলেম। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1965 সালে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করে এক বছর সংবাদিকতা করেন। অতঃপর নগাঁও মহিলা কলেজে অধ্যাপনার বৃত্তি নেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প এখনও সংকলিত হয় নি।

# রোগ

সেদিন বিকালে পুরানো ভাঙ্গা সাইকেলখানা বাইরে থেকে এনে সামনের ঘরে আওয়াজ করে রেখে অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে হাতল ভাঙ্গা চেয়ারে বসে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে দুবার ধোঁয়া ছাড়ার পর অতি স্বাভাবিক ভাবেই এক কাপ চায়ের কথা রোষেশ্বর পণ্ডিতের মনে পড়ল। রোষেশ্বর পণ্ডিত তাঁর প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, রৌদ্রদগ্ধ ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের অধিকারী, নিরীহ ধূপের মতো শান্ত, কিন্তু তাঁর দীর্ঘ দেহ, সুপ্রশস্ত কপাল, গৌরবোজ্জল দন্তরাজি আর সুন্দর একজোড়া গোঁফ থেকে যৌবনকালে তাঁকে কোনো দুর্ধর্ষ অভিযানের বা 'গল্প হলেও সত্যি' জাতীয় কাহিনীর নায়ক হিসাবে কল্পনা করা যেত। এখন, পৃথিবীচ্যুত আকাশমগ্ন অবস্থায়, তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন শূন্যে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার অনুধাবনে ব্যস্ত আর সেই ঘটনাগুলোকে একটি ব্ল্যাকবোর্ডে ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌লের মত মেলানোর চেষ্টায় ব্রতী। অতঃপর অকাশচ্যুত হয়ে তিনি বিড়ি ধরান, কারণ এই চেষ্টায় তিনি হতাশ এবং ক্লান্ত, ঘটনাগুলো অস্পষ্ট, অগোছালো, মিলশূন্য অনেকগুলি খণ্ডাংশই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি তাঁর দৃষ্টির শূন্যতা সামনের আপাতশূন্যতার দিকে নিবদ্ধ (অর্থাৎ কোথও নিবদ্ধ নয়)। ফলে তিনি চিন্তাশ্রান্ত আর ধূমপানে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। সময় সন্ধ্যা হয় হয়। ঘরের মধ্যে ক্ষীণ রঙিন একফালি আলোর একটা প্রদীপ, যা থেকে কোনো কোনো সময়ে ফটফট শব্দ বের হয় এবং যা পরোক্ষে ঘরের প্রতিষ্ঠিত অন্ধকারকেই আরো প্রতীয়মান করে। ঘরের পরিবেশে রয়েছে নিষ্ঠুরতার নিশ্বাস আর দমবন্ধ বাতাস। কেন না, বাইরের গোটা পরিপার্শ্বের আবহই থমথমে, গম্ভীর। আকাশ মেঘলুপ্ত কিন্তু করাল। একটা পচা গুবরে গন্ধ কোনো একটা পচা জন্তুর গন্ধের মেশামেশি করে ভেসে আসছিল।

এখন তাঁর এক কাপ চায়ের কথা মনে হল। এই স্মৃতিতে, স্মৃতিতে নয়, বরং আগ্রহে, তাঁর শ্রান্তি, দীর্ঘদিনের অভ্যাস এবং সময়ের একটা কারসাজি ছিল। কিন্তু যৌবনের যে কোনো প্রিয় বিলাস (যা এখন বিগত এবং যার স্বাদ শুধুমাত্র স্মৃতিতেই বর্তমান) যেমন দাবা খেলা, গানবাজনা বা শিকারের নেশার মতোই এই স্মৃতিও এক দুঃখজনক অস্তিত্ব। কেন না, আজ চার-পাঁচদিন হয় চা শুধু তাঁদের বাড়ি থেকে নয়, গোটা গাঁ থেকেই অদৃশ্য। গত এক পক্ষ কাল প্রবল বর্ষণের ফলে রাঙা নদী উত্তাল। যদিও তাঁদের গাঁয়ের অবস্থান যথেষ্ট উঁচুতে, যদিও বা তাঁদের

পাশের আরিভঙ্গা, লেতেকুবারী, গেলেকী ইত্যাদি প্রায় প্রতি বৎসর বন্যাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের গ্রামে জল ওঠার কোনো স্মৃতি তাঁদের মনে পড়ে না, তবুও আজ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তাঁদের গাঁয়ের সবাইর বাড়ি, কারো বা উঠান, কারো বা বারান্দা, কারো বা ঘরের ভেতরে পর্যন্ত জল ঢুকে তুমুল কাণ্ড করে গেছে। পরশু থেকে জল সরছে, তবু রাস্তাঘাটে, বাড়ির সামনে এখনও জল। লেতেকুবারীতে জল কমেছে। গেলেকী এখনও জলমগ্ন। অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতিতে তাঁদের গাঁয়ের দোকানী ভোগেশ্বরের দোকানের প্রায় সমস্ত জিনিসপত্র শেষ হয়ে গেছে। (ঘটনাক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই গাঁয়ের একমাত্র দোকানী বা মহাজন ভোগেশ্বর রোষেশ্বর পণ্ডিতেরই অনুজ। বিবাহোত্তর সময়ে দুই পরিবার আলাদা হয়ে গেলেও তাঁদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ)। এবং দূরের বড় বাজার থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসার ব্যাপারে বোধহয় ভোগেশ্বর এখন আর তেমন উৎসাহী নয়। হয়তো তার হাতে পয়সাকড়ি নেই বা অন্য কোনো অসুবিধা রয়েছে। হয়তো তার নিরুৎসাহের কারণ এই যে গাঁয়ের মানুষের হাতে এখন পয়সার চূড়ান্ত অভাব রয়েছে এবং তার ফলাফল ভোগেশ্বরের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রোষেশ্বর পণ্ডিতের রৌদ্রদগ্ধ ম্লান অমার্জিত দাড়িভর্তি মুখে গভীর ছায়া পড়ল। এই ছায়া যৌবন অপ্রমাণিত হওয়ার বেদনায় বিধুর কোনো অসুন্দরী কুমারীর মুখে বিরাজিত দেখা যায়। এমন মনে হল, রোষেশ্বর পণ্ডিত যেন নিজের পৌরুষকেই ধিক্কার দিতে গিয়ে পুনরায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। উপায়ন্তর না পেয়ে তিনি বিড়িতে জোরে টান দিয়ে নাকে মুখে প্রচুর ধোঁয়া ছাড়লেন। তাঁর মনের চায়ের কাপ শূন্যের ধোঁয়ার মতো বিলীন হয়ে গেল। এই ক্ষণটুকুতে বাইরের পরিবেশে বিরাজিত ছিল আদিমতা, নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন প্রকৃতির ক্রুদ্ধ নিশ্বাস যুদ্ধের সময়কার রাতে নিনাদিত বিদেশী সৈন্যের বুট জুতার শব্দের মতোই ছিল অবিশ্বাস্য আর ভয়াবহ। ফলে রোষেশ্বর পণ্ডিত বুকের মধ্যে এক অলৌকিক নিষ্পেষণ আর তাঁর বিরুদ্ধে নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করছিল। একটা উৎকট গন্‌গনে গরম পড়েছে। গতকাল আর আজ দিনে ছিল প্রচণ্ড রোদ। গরমে অনিশ্চিয়তা ছিল, ছিল বিপদের গন্ধ। সন্ধ্যা থেকে মেঘ করেছে কিন্তু বৃষ্টি নেই।

বাইরে একটা গলা খাঁকারির শব্দ শোনা গেল। পণ্ডিত দরজার দিকে তাকালেন। মেঝেতে কর্দমাক্ত পায়ের ছাপ ফেলে মহীরাম ঢুকল। সে বেঁটে, পুষ্ট শরীর, মধ্য-বয়স্ক, কঠিন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল অপসৃয়মান, গায়ে গেঞ্জি, ধূতি হাঁটুর উপরে। মহীরামের চোখে বিমূঢ়তা, কিন্তু মনে হয় তা সাময়িক। কারণ, বোঝা যায় যে সে নিজের বাহুর উপর আস্থা রাখে। সে নামকরা চাষী, তার বিমূঢ়তা সহজবোধ্য, কারণ তার জমি (যা এখন সহজশান্ত ভাবে জলের নীচে আশ্রিত, এবং যা জানে না যে তার মৃত্যু ক্রমশই নিশ্চিত হয়ে আসছে, এবং

না জেনেই হয়তো এখন যা মাছের সঙ্গে খেলছে) প্রায় আধা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

'অ' মহী...বসো'—পণ্ডিত বললেন। বেঞ্চে হাত রেখে মহী বসল।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

—"না......ঘর থেকে......জল"—আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। মহীরামের হ্রস্ব রুক্ষ উত্তরে তার ক্রোধ ও বিরক্তি একই সঙ্গে প্রকাশ পেল। বস্তুতঃ বলার মতো তাদের কিছু ছিলই না। তাঁদের দুঃখ, তাঁদের ক্ষোভ এমন কি তাঁদের অহসায়তা প্রত্যেকের নিকট স্পষ্ট। অন্য পক্ষে ক্ষয় ক্ষতির তারতম্যের হিসাব করার সময় এখনও আসে নি।

"দেখো"...রোষেশ্বর উচ্চারণ করলো। এর পেছনেও কোনো আবেগ, অনুযোগ বা বিদ্রোহ ছিল না। বরঞ্চ তার উচ্চারিত শব্দটিতে যে নির্জীবতা, শুষ্কতা নিহিত ছিল তাতে ঘরটার নগ্নতাই ব্যক্ত হল। বাইরে স্তব্ধতা। রাস্তায় জলের মধ্যে মাঝে মাঝে মানুষ গরু আসা যাওয়ার শব্দ। রান্নাঘর থেকেও দু'একটা শব্দ আসছে। নিস্তব্ধতার উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রোষেশ্বর পকেটে হাত দিয়ে একটা বিড়ি বের করে মহীরামকে দিলেন আর মাটি থেকে প্রদীপটিও তার হাতে তুলে দিলেন। মহীরাম দাঁত দিয়ে বিড়ির এক অংশ ছিঁড়ে তারপর প্রদীপ দিয়ে বিড়ি ধরাল। ধরাবার সময় প্রদীপের লাল আলো, কালো ধোঁয়া আর উত্তাপ তার মুখে লাগে আর তার মুখমণ্ডল রাঙা আভাস রঞ্জিত, চক্ষু সংকুচিত এবং মুখ রুক্ষ এবং একাগ্র হয়। সেই মুহূর্তে মহীরামের মুখমণ্ডল কোনো এক প্রবীন পলাতক বিপ্লবী নেতার মতো দেখাচ্ছিল। রোষেশ্বর স্থিরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই দৃশ্য সততই উপেক্ষিত, কিন্তু আজ রোষেশ্বর নিজের অজ্ঞাতসারেই ঈষৎ চমৎকৃত হলেন, হয়তো বা এই কারণেই যে দৃশ্যটা তাঁর মনে স্বদেশীর চিকমিকানি এনেছিল।......জল ভেঙ্গে কে একজন যেন আসছে মনে হল।

"আছেন নাকি?"

"অ...এসো..." পণ্ডিতের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সুপুরুষ সুঠাম যুবক পদ্ম এসে ঢুকল আর মহীরামের উদ্দেশ্যে "অ...দাদাও..." বলে মহীরামের বেঞ্চটাতেই একটু সরে বসে পড়ল।

"কোথায় গিয়েছিলে?" মহীরাম এই নিস্তব্ধতাকে অনুমাত্র আঘাত না করে অতি নিম্নস্বরে প্রশ্ন করল যেন এই নিস্তব্ধতা, যা পরিবেশটা কঠিন রোগীর উপস্থিতির সন্ত্রস্ততা বা বিপ্লবের গোপনীয়তা দিয়ে মণ্ডিত করেছে, তাতে তার অতীব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

—"এখানেই...আর কোথায় যাব?...দোকানটিও বন্ধ...।" পদ্ম বলে। পদ্মের উত্তরে ভোগেশ্বরের দোকানের সান্ধ্য গ্রাম্য তর্ক আর আলোচনা, তার সরস মুখরতা, নিশ্চিত আনন্দের মোহ, দোকান বন্ধ থাকার অসুবিধা, নির্জীব সন্ধ্যা, বন্যা, গরম,

বিপদ আর হতাশার স্মৃতি এবং চিন্তা ইত্যাদি তাদের মনের মধ্যে কলরব করে উঠল। এমন কি এই সমস্ত চিন্তার সঙ্গে রোমেশ্বরের মনে ভুলে যাওয়া সান্ধ্য চায়ের স্মৃতিও জেগে উঠল।

"গেলেকীতে বুঝি সাতজন মরেছে"—পদ্ম খবর দিল।

"কোথায়?" রোমেশ্বরের প্রশ্নটা চিৎকারের মতো মনে হল। আধা অবিশ্বাস আর বিস্ময় মিশিয়ে মহীরাম পদ্মের দিকে তাকাল আর দুর্বল প্রতিবাদের সুরে বলল, "আমি যেন লেতেকুবারীতে লোক মারা গেছে শুনেছিলাম।"

—"সে তো পরশুর খবর, এখন ওখানে এক কুড়ির উপর গেছে বোধহয়।"—পদ্মের উত্তরটা উদাসীনের মতো শোনাল, কেননা তার সত্ত্বাটা উত্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। ভোগেশ্বর ঘরে ঢুকে বলল, "আজ পি, ডব্লিউ, ডি'র মানুষ এসেছিল নাকি?"

"আরিভঙ্গার বাঁধ দেখতে? এখন?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পদ্ম জবাব দিল।

"সাব ডেপুটির কাছে দরখাস্ত একটা এখনই দিয়ে রাখা দরকার আমাদের।"

কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টি-প্রসূত হলেও এই প্রস্তাবে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। কারণ বাঁধ, বন্যা, সাবডেপুটি, ক্ষতিপূরণ এই সমস্ত শব্দ এখন অচল, অক্ষম মুদ্রা বিশেষের মতো অর্থহীন এবং অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে। দীপশিখার মতো, দহনমুখী পলিতার মতো, দুপুরের বাতাস তাড়িত নারকেলের পাতার মতো তাদের অন্তরে একটা আশঙ্কা থেকে থেকেই শিরশির করছিল। আর দুপুরের রোদে এই আশঙ্কার গন্ধ ভাসছিল।

"টাউন থেকে কেউ আসেন নি?" রোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ দুপুর পর্যন্ত তো কারো খবর নেই। আমাদের ডাক্তার তো ভাগলই।"

এই অঞ্চলের একমাত্র সরকারী হাসপাতাল লেতেকুবারীতে। ডাক্তার রেবতী শর্মা জল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি কিংবা তার কোনো বদলি আসেন নি। পদ্মের উক্তিতে তাদের মনে সেই পুরনো অবস্থা ফিরে এল, যা সব সময়ই সঙ্গত বিক্ষোভ, নিরুপায় হতাশা এবং সমর্পণের চেতনায় পূর্ণ। বিদ্রোহের ধ্বনি তাতে এখনও স্পন্দিত হয় নি। এরা ক্লীব, সুপ্ত, পথহারা।

"একটা হালকা বৃষ্টি না হলে..." শূন্য মন্দিরে সর্বস্বান্ত করুণ প্রার্থনার মতো রোমেশ্বরের কথাগুলো শোনা গেল। আর এই সময়ে এই সমস্ত কিছুর বৈপরীত্য রূপে হাতে পানের থালা নিয়ে কুসুম—রোমেশ্বর পণ্ডিতের পঞ্চদশী মেয়ে—প্রবেশ করল। কুসুমের শরীর বিনম্র আর গতিতে একটা ছন্দ রয়েছে। তার অবয়বে প্রচ্ছন্ন আগ্রহ এবং প্রতীক্ষা। দুপুরের আকাশের নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রে নিঃসন্দেহে হারিয়ে গিয়ে সে দীর্ঘ গভীর নিশ্বাস ফেলে। আর রাতের নিরুপদ্রব নীরবতায় বিছানায় শুয়ে সে ভরা রঙ্গা নৈ'র ধ্বনি শোনে, আর তার মাঝে একটা অস্পষ্ট

অচিন সুর যেন ঢেউয়ের উপর দিয়ে কেঁপে কেঁপে চলে যায়। সুরটা ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে ওঠে। তাকে আচ্ছন্ন করে। সে অধীর হয়ে ওঠে। একটা চরম বিন্দুতে এসে সুরটা থেমে যায়, ক্রমে নীচে নামে, আর শেষে অঘোরে নিদ্রার মধ্যে হারিয়ে যায়। এখন তার চোখ দুটো নিষ্কম্প, সময়ের বিরূপতা অথবা পরিবেশের অনুজ্বলতার জন্য মুখ কিঞ্চিৎ মলিন। সে পদ্মের দিকে পানের থালাটা এগিয়ে দেয়। আর পদ্ম দেখল, ঘরের ক্ষীণ আলোয় মরচে-ধরা থালার উপরে কুসুমের হাত—গার্হস্থ্যের অজস্র শ্রমের কাঠিন্য, ধূলাময় মালিন্য সব কিছুকে উপেক্ষা করে এই হাত কোমল, উজ্জ্বল, আগ্রহশীল এবং উন্মুখ, সে থালা থেকে সুপারী তুলে নিয়ে কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "রান্না করছ?"

পদ্মের উপস্থিতি হয়তো কুসুমের শরীরে পর্যাপ্ত দ্রুত রক্তের চলাচল ঘটিয়েছিল। আর তার প্রশ্নমাত্রই তার মুখ আরক্তিম, যেন ঘরের বাতাসে মিলিয়ে যাবে। হয়তো ঘরে এতজন লোক না থাকলে এত লজ্জা হত না, কিন্তু পিতার উপস্থিতিতে সচেতন হাসি হেসে উচ্চারণ করল মাত্র—"না, মা রাঁধছেন।"

এই সমস্ত কথার মধ্যে জীবনের অনুচ্চ আবহের সুর ভেসে আসছিল, ঘর সংসার পুত্র পরিবার, গোয়ালের গরু, ক্ষেতের ধান, বাগানের সুপারী—এই সমস্তের ভাসমান ছবি পরিস্ফুট হচ্ছিল। আর মুহূর্তের জন্য প্রত্যেকেই এক অস্বাভাবিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করল। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় জীবনের পরিচয়ের মতোই গভীর। তবুও প্রকৃতির উদ্দণ্ড কৌতুকে তারা প্রত্যেকেই ভীত হয়। অস্বাভাবিকতার ভীতি তাদের অসহায় করে, চেতনা বিফল করে, অথচ নিজের দেহের গন্ধের মতো এ তো নিজের অজ্ঞাতেই চিরকাল উপস্থিত।

পরদিন কড়া রোদ উঠল। আহারান্তে রোমেশ্বর পণ্ডিত বিছানায় গড়াচ্ছিলেন। লেতেকুবারীতে নিজের স্কুলের দিকে একবার যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে খারাপ খবর এসেছে। দুদিনের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ ছাড়িয়েছে। গেলেকীর অবস্থাও তদ্রূপ। আজ সকাল পর্যন্ত কোনো সাহায্য এসে পৌঁছায় নি। প্রচণ্ড গরম। তিনি ঘামছেন, ঘুমাতে পারছেন না। কাল রাতে শেষের দিকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তিনি শোওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নিদ্রা চেষ্টার অসাধ্য। গতরাতের ঘটনাটি তাঁর মনে পড়ল। গরমে ঘামছিলেন, তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পিঠের দিকে শীত শীত লাগল। তিনি আবার ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ মনে হল যে পিঠের শীতটা গতিশীল। মুহূর্তে তাঁর চিন্তাচক্রে একটি ছবির দ্রুত কিছু ঢেউ খেলে গেল। প্রায় লাফ দিয়েই তিনি নেমে পড়লেন। সভয়ে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে বাতি জ্বালিয়ে দেখলেন যে শীতল বস্তুটি আসলে কালো, দীর্ঘ, সুন্দর ভয়াবহ—সর্পিল গতিতে সে বাইরে বেরিয়ে গেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশির করে উঠল। বাকী রাতটুকু আর ঘুমানো হলো না। অসম্ভব কিছু

খবর আর তার ছবি পরিষ্কার হুবহু তাঁর মনে এল ঃ গেলেকীতে প্রায় ডুবন্ত একটা ঘরে তেরটা সাপ জড়াজড়ি করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে, আরিভঙ্গায় একজন বৃদ্ধার সঙ্গে ছানাপোনা নিয়ে তিনটি সাপ একই বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আরেকটা, বোধহয় সংবাদপত্রের খবর, কোথায় যেন বন্যার সময়ে ছ'টি সাপ দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় একটি নারীকে উদ্ধার হয়। কিছু সাপ মারার দৃশ্য আর সর্পঘাত এবং তা থেকে বেঁচে যাওয়ার অনেক রহস্যজনক ঘটনা, বহু ওঝার গল্প, শঙ্খ ওঝা পর্যন্ত, তাঁর মনে পড়ল। আর এভাবেই এক সময় রাত শেষ হল।

গরম তাঁর অসহ্য লাগছে। মাথাটা ভারি। চোখ জ্বলছে। বোধহয় তিনটা বাজল। রোষেশ্বরের স্ত্রী সোমলতা ঘরে ঢুকে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললেন—"চা খাওয়ার আর উপায় হল না—"

রোষেশ্বর বিছানায় পড়ে রইলেন। সোমলতা এবার দরজার দিকে তাকিয়ে নীচু গোপনীয় কণ্ঠে বললেন—"ভায়ের ঘরে চা-পাতা রয়েছে যেন..."

"কি বললে?" রোষেশ্বরের প্রশ্নের সঙ্গে অবিশ্বাসের ভ্রূকুটি ছিল। সোমলতা প্রথমে নিশ্চুপ রইলেন। তারপর বললেন—"হ্যাঁ, কলতলায় চা-পাতা পড়ে থাকতে দেখেছি।"

"এ্যা, যত...বলতে নেই এসব" রোষেশ্বর অর্ধ ভর্ৎসনার সুরে বললেন। বিছানা থেকে নেমে তিনি হঠাৎ দ্রুত কুয়ার পারে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন। তাড়াতাড়ি আরো এগিয়ে আবার কান পাতলেন। তারপর কিছু বুঝতে না পেরে আবার কুয়ার কাছে ফিরে গেলেন। দূর থেকে দুটি কণ্ঠের দীর্ঘ ক্রন্দনের সুর যেন শোনা যাচ্ছে। মুখ ধুয়ে তিনি সামনের দিকে গেলেন। ভোগেশ্বর যেন কোত্থেকে আসছে। তার মুখের চূর্ণবিচূর্ণ স্বাভাবিকতার অন্তরালে উত্তেজনা এবং অচিন দেশের ভীতি প্রচ্ছন্ন ছিল। তার পদক্ষেপ অস্থির, যেন নিজের অজ্ঞাতেই হাঁটছে। প্রশ্নোদ্যত রোষেশ্বরের দিকে তাকিয়ে গাছের শিকড় পর্যন্ত কেঁপে যায় এমনি এক সুরে বলল—"ডাইনীচুকের উমারামের বৌটা গেল..."

"কী?" রোষেশ্বর চিৎকার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কণ্ঠে যেন স্বয়ং মৃত্যু ভর করেছে, এমনি নীচু, অদ্ভুত, অপরিচিত সুরে তাঁর প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

"কিছুই ছিল না,...আজ সকালে তিনবার বা চারবার পায়খানা...তারপরই শেষ।"

ইতিমধ্যে দুইবাড়ির দরজার সামনে দুজনের স্ত্রী, কুসুম, কুসুমের বোন সাবিত্রী, হাতে কাটারি নিয়ে ভোগেশ্বরের ছেলে সোনা, রোষেশ্বরের ধুতির খুঁট ধরে তাঁর ছেলে ময়না, সবাই জড়ো হয়েছে।

"কে? কে?"—সোমলতা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন। রোষেশ্বর স্থির, নিশ্চল, শিলার মতো। ভোগেশ্বর সংক্ষেপে সোমলতার প্রশ্নের জবাব দেয়।

তখন সমগ্র পরিবেশ, এমনি কি সময়ও স্থির হয়ে রইল। ম্লান, রংহীন স্তব্ধতা

অমোঘ শূন্যতার মধ্যে বিরাজ করছে। সে শূন্যতা যেন উপস্থিত চরিত্রগুলোর চৈতন্য লুপ্ত করে দিয়েছে। কিছু সময় পর সোমলতাই অকস্মাৎ নির্জীবতা থেকে মুক্ত পেয়ে অতি দীন নিরাশ্রয় কণ্ঠে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করলেন এবং সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে গেলেন। রোমেশ্বর অকস্মাৎ গতিশীল হলেন এবং সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কান্নার শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। হরিধ্বনির শব্দও যেন কানে পৌঁছাচ্ছে। গাঁয়ে আবার মৃত্যুর হাত পড়ল আর তার শীতলতাই রোমেশ্বর পণ্ডিতের রক্তকে স্পর্শ করেছে।

রাত। রোমেশ্বর পণ্ডিত বাইরে বেরিয়ে এলেন। নব বধূর মত শ্লথ, ভোরের গ্রাম্য প্রকৃতির মত শান্ত রাত আজ তাঁর কাছে বড় অশান্ত বলে মনে হল। অথচ গাঁয়ের দুদিকে দুটো কুকুরের চিৎকার ছাড়া চারদিকের পৃথিবী, হয়তো বা মৃতের বাড়িও, সুপ্ত। শুতে যাওয়ার সময়ে ডাইনীচুকের দিক থেকে আরো একবার কান্নাকাটি, হরিধ্বনি রাতের নীরবতার মধ্য দিয়ে বেশ স্পষ্ট শোনা গেল। শ্মশান থেকে মানুষগুলো কি ফিরে এল? চিতা নিভল? আজ উমারামের ঘরে বৌয়ের প্রেতাত্মা কি স্বামীর বিছানার চারিদিকে ঘোরাঘুরি করছে? শ্মশানে ভূতপ্রেতের নৃত্য কি শুরু হয়েছে? এমন অসংখ্য অসমঞ্জস চিন্তার নিরসনের জন্য রোমেশ্বর অভ্যাসবশতঃ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সন্ধ্যায় আকাশে হালকা মেঘ ছিল। কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মেঘের ফাঁকে দু-একটা পিপাসার্ত তারা এদিক ওদিক দেখা যাচ্ছে। ভ্যাপসা গরমটা এখনও রয়েছে। তার সঙ্গে দুর্গন্ধ। সময় ভয়াবহ সম্ভাবনায় বিমর্ষ আর কুকুরের চিৎকারের মধ্যে অমঙ্গলের বার্তা। রোমেশ্বর সমগ্র হৃদয় উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই রাত্রি যেন মায়াহীন শূন্যতার ভারে অস্থির পৃথিবীর কাতরতাকে প্রকাশ করছে আর এ উপত্যকা থেকে উপত্যকা, শিখর থেকে শিখর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে নদী, বৃক্ষ আর ভূতলকে সমভাবে স্পর্শ করছে। তিনি জানেন যে কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুলা, আর জীবন কেবল তার হ্রস্বতা তার মৃত্যু-নিশ্চয়তার দরুনই বিচিত্র, রহস্যময়, উপভোগ্য। অথচ এই অনুভূতি, দিনের বেলার কাটা ক্ষতের বেদনা সন্ধ্যা বেলা ইষ্টমন্ত্র জপ করার সময় মনে হওয়ার মতো, দূর শূন্যে, নক্ষত্র নিচয়ে অথবা বরগীতের শুদ্ধ পদে মনোনিবেশ করার সময়ই মাত্র মনে জাগ্রত হয়। সন্ধ্যা বেলাকার বিক্ষিপ্ত, টুকরো কিছু সত্য আর কিছু গুজব তার মনে অস্পষ্টভাবে ক্রিয়া করছিল। খবর এসেছে যে লেতেকুবারীর চাইতেও গেলেকীতে মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। মৃতের সংখ্যাও মুখে মুখে ওঠানামা করছে। কোনো কোনো ঘর শূন্য হয়ে পড়েছে। গ্রাম উচ্ছন্নপ্রায়। যাদের সাধ্য রয়েছে তেমন দু-একঘর শহরে পালিয়েছে। মানুষের রক্ত শীতল হয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখে, মনে, আকাশে বাতাসে, সমগ্র পরিবেশে সদম্ভে নিষ্ঠুরভাবে শুধুমাত্র মৃত্যুই বিরাজ করছে। মহামারী তার কালান্তর রূপে গ্রামে নামছে। একমাত্র

উৎসাহজনক খবর আনল পদ্মই, লেকেকুবারীতে সরকারের প্রথম রিলিফ পার্টি, চারজন কম্পাউণ্ডার এসে পৌঁছেছে, আর বিকেল থেকে তারা ঔষধ বিলি শুরু করেছে। ডাক্তার রেবতী শর্মা ইস্তফা দিয়েছে,নূতন একজন ডাক্তার দু-একদিনের মধ্যেই আসছেন। এ সমস্ত খবর তার মনে আনল অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা আর তার অনুষঙ্গ কিছু ছবি। এ ছবি তাদের শৈশবের রংহীন ভয়ের মতো ভয়াবহ, নির্মম গম্ভীর কোটমার্শালের দৃশ্যের মতো নিদারুণ। সদরে একটা কুকুর গোঙাচ্ছে। এই ক্রন্তনের বিলম্বিত লয়ে অনেক করুণ অভিযোগ ছিল। রোযেশ্বর ঘরের ভেতরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু বিড়াল যেমন চোখ বুজেও শব্দের সন্ধানে কান পেতে রাখে, তেমনি নির্মিলীত-নয়ন নিদ্রাপ্রয়াসী রোযেশ্বরের কানও শব্দের সন্ধানে জেগে রইল। শেষ রাতে তার ঘুম এল।

পরদিনও রোদ উঠল না। আকাশ হালকা মেঘে আবৃত। দু-একবার মেঘ ক্রমশঃ ঘন হয়ে নীচে নেমে এসে বর্ষণের উদ্যোগ করেছিল, কিন্তু তারপর আবার ধীরে ধীরে হালকা হয়ে উপরে উঠে গেল। বিপর্যস্ত অভিশপ্ত মানুষগুলি নির্বাক অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার মাথা নীচু করছিল। কাজকর্মে তাদের উৎসাহ নেই। জল শুকালেই মাঠে নেমে পড়ার সংকল্প যারা করেছিল তাদের উৎসাহও সংকুচিত হচ্ছিল। গতরাতে ডাইনীচুকে তিনটি মৃত্যু হয়েছে, তার ছায়া এ গাঁয়েও পড়েছে। নূতন দুঃসংবাদের জন্য, মৃত্যুর নূতন সমারোহের আশংকায় সবাই ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছে। তবুও দিনের বেলায় কোনো নূতন অঘটন ঘটল না, দু-একটা খবর অবশ্য এসে পৌঁছল। দু'জন ডাক্তার আর নূতন কিছু ঐষধপত্রের চালান এসেছে। মৃত্যুকে তবু রোধ করা যায়নি। বাধাহীন তার যাত্রা। গেলেকীতে ন'জনের একটা পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা অচেনা শব শেয়ালে মাটির নীচ থেকে টেনে বের করেছে। দিনরাত চিতা জ্বলছে, রীতিনীতি সব উধাও হয়ে গেছে। দু-তিনটি শব একটা চিতায় তোলা হচ্ছে। অহরহ হরিবোল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকারের ছায়ায় শ্রান্ত রাত্রি অসময়ে নিদ্রিত হয়ে পড়ল। সমগ্র পরিবেশ বিষণ্ণ। গাঁয়ের মোড়ে শেয়াল চীৎকার করছে। উত্তরে দুটো কুকুর একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। আকাশের মেঘ হালকা। ভোগেশ্বরের দোকানের ক্ষীণ আলোর বাতিটা নিয়ে পদ্ম, তার পেছনে রোযেশ্বর গাঁয়ের পথ দিয়ে হাঁটছিলেন। বন্যার পর গাঁয়ের পরিচিত রাস্তাঘাটও অপরিচিত ঠেকছিল। পদ্ম ডানদিকের রাঙা নদীর দিকে তাকাল। জল কমছে। স্রোতের শব্দ কম শোনা যাচ্ছে। বাঁ দিকের দূরের শ্মশানের দিকে তার দৃষ্টি গেল। তার মনটা সংকুচিত হয়ে গেল। মনে পড়ল যে ভোগেশ্বর আজ দুপুরে রোযেশ্বরের সাইকেল নিয়ে লেতেকুবারী গিয়েছিল। প্রথমে রোযেশ্বর যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর জেদ চেপেছিল বাইরে বেরোবেনই। তিনি জানেন যে

লেতেকুবারীতে মৃত্যু রয়েছে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে দুর্বল সংগ্রাম রয়েছে (মৃত্যু শব্দটা এখনও কত চিত্র-ময়)। তবু তিনি নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে ভয় আর হতাশার মধ্যেও এ দুটোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি পুরুষের মতো গিয়ে দাঁড়াবেন। তাঁর স্কুল রয়েছে, ছাত্রছাত্রী রয়েছে, তাদের প্রতি তাঁর কর্তব্য রয়েছে, তিনি সেই কর্তব্যের মুখোমুখি হবেন। কিন্তু তক্ষুনি দোকানের জিনিসপত্র আনার জন্য ভোগেশ্বর এসে তাঁর সাইকেলটা খুঁজল। ভোগেশ্বর এখন পর্যন্ত, এই রাত অবধি ঘুরে আসেনি। এই মুহূর্তে বিপ্লবের মধ্যে পলায়নপর দুটো চরিত্রের মতো তাঁরা দুজনে পথ হাঁটছিলেন। এই পথটি হ্রস্ব, কিন্তু রাত এখন নির্জন এবং ভীতিপ্রদ। দিনের নিরহংকার নিরীহ গাছগুলো সৌহার্দ্যের সবুজ নিশান নামিয়ে শত্রুর কালো মুখোশ পরে এখন দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাখীগুলো নীরব, সুপ্ত—শুধুমাত্র একটা যম ডাকিনীর অমঙ্গুলে স্বর নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছিল। অল্প দূরে একপাল শেয়াল চিৎকার দিচ্ছে। দু-একটা আহার সন্ধানী জীব তাঁদের কাছে এসেই সরে যাচ্ছিল। গাঁয়ের দিক থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ থেমে থেমে ভেসে আসছে।

বিপরীত থেকে বাতি নিয়ে কে যেন আসছে। তাঁদের গতি মন্থর হল, মনটাও একটু হালকা লাগল। তাঁরা লোকটার দিকে তাকালেন, লোকটাও তাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পার হয়ে গেল। না—ভোগেশ্বর নয়। তাঁরা এগিয়েছেন, হঠাৎ শুনলেন—"কে? রোষ নাকি?"

লোকটা ডাকছে। তাঁরা ঘুরে দাঁড়ালেন।

"হ্যাঁ", রোষেশ্বর বললেন। লোকটা কে ধরতে পারেন নি। মনের মধ্যে অনেকগুলো মুখ এসে মিলিয়ে গেল। লোকটা এগিয়ে এল।

"আমি...অনিরাম," কিছুটা অপ্রস্তুত সুরে লোকটা কথা বলল আর বাতিটা একটু তুলে ধরল। সর্বস্বান্ত চেহারা, অনন্যোপায় হয়েই বেঁচে রয়েছে, কৃশ শরীর নিয়ে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

"অ...অনিরাম," রোষেশ্বর বলেন। একটা অজানা ভীতি তার মনে পাক দিয়ে উঠল। অনিরাম তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়—এই রাতে! ঝড়ে গাছগুলো যেমন দুমড়ে মুচড়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তারপর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, তাঁর মনেও তেমনি একটা অবস্থার সৃষ্টি হল।

"আমি..." রোষেশ্বর কথাটা শেষ করতে পারেন না।

"ভালই হল...", নীচুস্বরে পলায়নপর উত্তর। রোষেশ্বর চমকে উঠলেন। "ভোগ" তিনি কোনোক্রমে উচ্চারণ করেই অনিরামের আশাহীন জর্জর মলিন মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাতের প্রকৃতির বুক যেন ছিঁড়ে খানখান হয়ে যাচ্ছিল, পাখীরা সব চমকে উঠছিল আর অনিরামের ক্ষুদ্র হৃদয়ের পক্ষে এ সমস্ত ব্যাপার সহ্যের অতীত হয়ে উঠছিল। সে মাথা নীচু করল, তারপর

রোযেশ্বরের কাছ ঘেঁষে এল। হয়তো তার ভয় হচ্ছিল রোযেশ্বর হঠাৎ পড়ে যাবেন। সে রোষেশ্বরের পিঠে হাত রাখল।

"মায়ার বাঁধন"—শোনা না শোনার মাঝে অনিরাম বলে চলে। রোষেশ্বরের শরীরে হিমপ্রবাহ বইছে।—"দুপুরে বাড়ি এসে আমাকে খুঁজল, আমি নেই। তারপর বাইরে ঘুরতে গেল। পরে নিজে নিজেই ডাক্তারের কাছে গেল। ওষুধ খেল...ফিরে এসে পড়ল..." অনিরাম থামে। অন্ধকার প্রকৃতির পটভূমিতে তিনটি কালো মূর্তি, দুজনের হাতে বাতি—দৃশ্যটা খোদিত হল।

তারা যখন অনিরামের বাড়ির মুখে পৌঁছলেন, দেখলেন উঠানে প্রদীপের আলো, দু-চারজন মানুষ। রোষেশ্বর প্রায় দৌড়ে গেলেন। ভোগেশ্বর উঠানে শয্যাগত। রোযেশ্বর মাটিতে বসে ভোগেশ্বরের ডান হাতখানা ধরে ডাকলেন, কণ্ঠস্বর ব্যগ্র কিন্তু অনুচ্চ, "ভোগ, ভোগ, আমি...দাদা..."

মুহূর্তের জন্য ভোগেস্বর দুর্বল খোলাচোখে তাকাল, তারপর চোখ বন্ধ হল। জীবনের কোনো লক্ষণ নেই, তবুও মৃত্যুর কিছু বিলম্ব আছে। ডাক্তার এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন। কম্পাউণ্ডার একজন কাছে রয়েছে। পদ্ম রোযেশ্বরের কাছে গেল। মৃত্যুর এমন সহজ এবং এত নিশ্চিত রূপ এত কাছে থেকে দেখে সে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। পরিচিত মানুষের জীবন একে একে কত সহজে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেও তাদের একজন হতে পারে। বাঁ হাত দিয়ে ভোগেশ্বর তার পকেটটা দেখায়। কম্পাউণ্ডার পকেট থেকে বের করল একটি কাগজ ও কয়েকটি বড়ি। ভোগেশ্বরের চোখের কোণে দুটো জলবিন্দু—এগুলো যেন ভোগেশ্বরের তরফ থেকে রোষেশ্বরের কাছে পৌঁছে দেওয়া শেষ সংবাদ। রোযেশ্বরের অন্তর শিউরে উঠল, মনটা প্রচণ্ড মোচড় খেল। ভোগেশ্বরের ঠোঁট দুটি দুর্বল ভাবে নড়ে উঠল। কে যেন একটা বাটিতে করে জল আর একটা চামচ রোযেশ্বরের সামনে এনে রাখল। রোষেশ্বর আরেক বার কেঁপে উঠলেন, তারপর ভোগেশ্বরের মুখে জল দিলেন। তৃতীয় চামচ জল ভোগেশ্বর আর নিতে পারল না, গলায় আটকে গেল। তার গলাটা একটু বেঁকে গেল, যেন ঈশ্বরের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট ভোগেশ্বর মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

মধ্যরাতে শ্মশান থেকে ফিরে এসে রোযেশ্বর দেখলেন যে সোমলতা আর কুসুম বসে রয়েছেন। ভোগেশ্বরের ঘর থেকে নীচু কান্নার সুর থেকে থেকে তখনও আসছে। উনুন জ্বালানো হয়নি। বাচ্চারা জল খাবার খেয়ে শুয়েছে। মা কুসুমকে জোর করে একটু খাইয়েছে। কাপড় ছেড়ে রোষেশ্বর বাতি নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। একটা বিছানায় ছেলে আর ছোট মেয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে। তাঁর নিজের ঘরে রং-ওঠা, একটা টিনের বাক্স, ভোগেশ্বরের পকেট থেকে আনা কাগজ আর বড়িগুলো তার উপর রাখা ছিল। কাগজটি খুলে তিনি দেখলেন, দোকানের মালের

হিসাব। বড়িগুলো গুনলেন, চব্বিশটা, আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই আটটা একসঙ্গে খেতে হয়।

সোমলতা ঢুকলেন, বললেন—"দুধ একটু খাবে নাকি?—"না, দরকার নেই,"—রোষেশ্বর বলেন।—"কি বড়ি? কার?" সোমলতা প্রশ্ন করেন।

রোষেশ্বর কি একটা বলতে চাইছিলেন, হঠাৎ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নীচু করে বললেন—"সে এনেছিল, খেয়েও ছিল, কিন্তু..." তিনি বড়িগুলো বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে ধীর শান্ত সুরে বললেন—"তুমি ও বাড়িতে শোও গে, বেচারী একা...ঠিক নয়..."

সোমলতা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বেরিয়ে গেলেন। বাতি নিভিয়ে রোষেশ্বর বিছানায় পড়লেন। অন্ধকার। আজকের অন্ধকার যেন একটু বেশি ঘন বলে মনে হল তাঁর। কী একটা অতল রহস্য এর মধ্যে ডুবে রয়েছে। অদৃশ্য কিছু বস্তু যেন অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছে। এর মধ্যে তিনি ভোগেস্বরের ঘরের টিনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলেন আর দৃশ্যটা তাঁর মনে এল। অন্ধকারে আলোর ধারণা শূন্য হয়ে পড়ে, অন্ধ বিশ্বাসের ডানা মনের মধ্যে ঝটপটিয়ে উড়ে বেড়ায়, পৃথিবী আর বিশ্বস্ত থাকে না। দুটো কুকুর থেকে থেকে চিৎকার করছিল। অন্ধকারকে চলমান বলে মনে হচ্ছিল। ভোগেশ্বরের সঙ্গে বিজড়িত শৈশব কৈশোরের অজস্র ছবি তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছিল। ছেলেবেলার ডানপিটেমির ভোগেশ্বর ছিল সব চাইতে তেজি আর উদ্যোগী অংশীদার। ভোগেশ্বরের বিয়ের পর তার বাবার মৃত্যু হয়। প্রায় ছ'বছর ভোগেশ্বরের সন্তান হয় নি, ফলে তার মুখে হাসি ছিল না। তারপর তার একমাত্র সন্তান সোনার জন্ম হয়। সে একটি দোকান খোলার উদ্যোগ নেয়। তার অবস্থা স্বচ্ছল হয়। পরিবারে সুখ ফিরে আসে। আজ অবিশ্বাস্য ভাবে একদিনের ভেতরে সেই ভোগেশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। অথচ সে ছিল নিরোগ, স্বাস্থ্যবান পুরুষ। স্মৃতির শিথিল শিকলে বাঁধা টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো হটাৎ আজ ঝুনঝুন করে বাজতে শুরু করেছে। ভোগেশ্বর একবার দাঁত কালো রঙে রাঙিয়ে, বিশাল গোঁফ এঁকে মহিষাসুর সেজেছিল, সে কথাটা মনে পড়ল। মনটা বড় বিমর্ষ লাগছে। এমনিতেই দিনের বৈদ্যুতিক পরিবেশ, ভয়, শঙ্কা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভোগ সমস্ত কিছু ছিলই তারপর ভ্যাপসা গরম আর দুর্গন্ধ, কুকুরের চিৎকার আর মৃত্যুর নিত্যনূতন দুঃসংবাদ, ক্রন্দন আর হরিধ্বনি, এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে আজকের সন্ধ্যার ঘটনাটি—ভোগেশ্বরের মৃত্যু—এক চরম বিন্দুতে পৌঁছে তাঁর মনকে নিষ্পেষিত করতে শুরু করল। আর তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় নেমে আসা জলে সমগ্র পৃথিবী, অর্থাৎ তার ঘর, দৃশ্যমান সব বস্তু, এমন কি ঘরে রন্ধ্রহীন অন্ধকার পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে পড়ল।

সকাল বেলা। রোষেশ্বর পণ্ডিত ধীরে ধীরে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে উঠছিলেন।

হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। তারপর তিনি দেখলেন যে সকাল হয়েছে, তাঁর ঘুম ভেঙ্গেছে, বাইরের উঠানে শব্দ হচ্ছে, কোথাও কোনো অস্বাবিকতা নেই। কিছু সময় তিনি বিছানায় পড়ে পইলেন। তারপর ক্লীষ্ট দেহে দুর্বল মন নিয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে তিনি বেরুলেন। সোমলতা হাতের কাজ থামিয়ে মুহূর্তের জন্য তাঁর দিকে তাকালেন। রোষেশ্বর আবার ঘরে ঢুকলেন। কুসুম বিছানায় নেই, ছোটরা সবাই ঘুমোচ্ছে। তিনি উনুন থেকে কয়লা নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দোর গোড়ায় গেলেন। ভোগেশ্বরের ঘরের ভিতরে তাঁর অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী চেনেহী মাটিতে বসে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। রোষেশ্বরকে দেখে ঘোমটা টানল। সদর দরজার সামনে একটা কুকুর শুয়ে আছে। সামনের কলাঝাড়ে একটা কাক চেঁচাচ্ছে। রোষেশ্বর দাঁত মাজলেন অনেক সময় নিয়ে। তাঁর মন দূরে ভ্রমণ করছে, অনির্দিষ্ট কিছু ভাবনা তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি যান্ত্রিক ভাবে মুখ ধুলেন, তারপর ঘরে এসে দেখেন সোমলতা দ্বিধাগ্রস্ত ও সংকুচিত ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"কুসুম...কোথায় গেল?" সোমলতার এই নিম্নভীত প্রশ্ন অর্থহীন, হাস্যকর ঠেকতে পারে, কিন্তু বীজের মধ্যে যেমন জীবন কিংবা মৃত্যুর সুদূর সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, তেমনি সোমলতার এই প্রশ্নের মধ্যে রোষেশ্বর এক ভয়ংকর আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেলেন।

"কোথায় গেল?" সোমলতার প্রশ্নটি রোষেশ্বরের মুখেও প্রতিধ্বনিত হল।

"জানি না, পায়খানায় যেতেও তো দেখিনি।" সোমলতার কণ্ঠ কিছুটা কম্পিত। অস্থির পায়ে তিনি ভোগেশ্বরের বাড়ির দিকে যান। রোষেশ্বর হতভম্ব বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে ভেতরে গেলেন। কুসুমের বিছানা শূন্য, ছোটরা এখনও ওঠে নি। তিনি রান্নাঘরে গেলেন। উনুন ধরেছে ভাল করেই। পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাগানটা সুপ্ত, নির্জন, নিঃশব্দ। কিন্তু পায়খানার ঘটিটা চিরাভ্যস্ত অনাদরে পড়ে রয়েছে। সোমলতাই বাগানের দিকে গলা বাড়িয়ে চাইছেন। অনিশ্চিত পদক্ষেপে রোষেশ্বর ভয়ে ভয়ে বাগানের দিকে পা বাড়ালেন এবং একটু এগিয়েই তার সমস্ত শরীর হিমশীতল, কঠিন হয়ে স্থির হয়ে গেল। একটি পাতালস্পর্শী শব্দে, একটা প্রচণ্ডতম আঘাতে বিশ্বচরাচর খানখান হয়ে ধূলি কণায় পরিণত হল। রোষেশ্বর পণ্ডিতের ধুকধুকে হৃৎপিণ্ড, ধমনী সমূহ সমস্ত দেহ বিদীর্ণ করে বাইরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। শরীরের শেষ শক্তির সহায়তায় তিনি একবার চিৎকার করতে চেয়েছিলেন, সমস্ত হৃদযন্ত্রটা যাতে সেই চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে আসে, কিন্তু বিফল হয়ে বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়লেন।

আর তাঁর সামনে সদ্যজাগ্রত, নিরপেক্ষ, মৌন প্রকৃতির পটভূমিতে বিষ্ঠা ময়লার বিছানা শয্যায় একজন উলঙ্গপ্রায় যুবতী, যার নাম কুসুম। মৃত বা চৈতন্যহীন,

সিসিলিয়ান ভেনাস বা সিবাস্তিয়ানের নগ্ন নারীমূর্তির ভঙ্গিতে সে শুয়ে রয়েছে।

একটা নূতন তরঙ্গ উঠছে। প্রচণ্ড গরম। থেকে থেকে ক্রন্দনের রোল, হরিধ্বনি, বাঁশ ফোটার শব্দ, হাহাকার আর আর্তনাদের বুকভাঙ্গা শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল। সমস্ত দিন, আর এখন রাতেও রোযেশ্বর পণ্ডিত মাঝে মাঝে কান পেতে কি যেন শোনেন, কেঁপে ওঠেন, নিশ্চিত হন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সময়ে সময়ে, কখনো বা একই সঙ্গে ডাইনীচুক থেকে, মহীরামদের বাড়ির দিক থেকে, রাঙা নদীর পার থেকে, বিভিন্ন দিক থেকে নূতন বিচিত্র শব্দ ভেসে আসে। শুনে তিনি অল্পক্ষণের জন্য স্থির হয়ে কান পাতেন, শব্দটা কোন বাড়ি থেকে আসছে অনুমান করার চেষ্টা করেন, চেনা লোকগুলোর মুখ সামনে ভাসে, সোমলতা, মইনা, সাবিত্রীর মুখ ভাসে, অন্তর শিরশির করে ওঠে, তারপর অলসভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিষ্ঠুরতার আঘাতে রাত্রি গভীর হয়, বেদনার গভীরতায় আঁধার ঘন হয়ে আসে, অন্ধকারকে যদি জল বলে ধরা যায়, তবে তাঁর মন একটা নিঃসঙ্গ হাঁস, নিরুদ্দেশের দিকে যার যাত্রা। রাতের বুক থেকে বেদনার মুষিক-দাঁত যেন প্রতিটি মুহূর্তকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। গরমে শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে। কুকুরের ক্রন্দন ভেসে আসছে। সন্ধ্যায় দোর গোড়ার সামনে একটা কুকুর শুয়েছিল। মইনা তাকে ঢিল ছোঁড়ে, কুকুরটা তিন পায়ে ভর দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঐ দৃশ্যটা এখন আবার তাঁর মনে পড়ে। একবার ছেলেমেয়েদের বুকের কাছে জড়িয়ে ধরতে তাঁর বড় ইচ্ছা হল। টিনের বাক্সটার দিকে তাকালেন। টিনের বাক্সটার দিকে নজর পড়ল। নিষ্ঠুর বিগ্রহের মতো এই বাক্সটার দিকে গোটা দিনই তিনি মাঝে মাঝে তাকিয়েছেন, কিন্তু কাছে যাননি। এখন তাঁর মনে হল যে অন্ধকার ভূত হয়ে বাক্সটার উপর বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। রোযেশ্বর পণ্ডিত চোখ বন্ধ করলেন।

ভোরের আলো নামছে। রোযেশ্বর পণ্ডিতের ঘুম হয়নি, ভোরের সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। তিনি কান পাতেন। না, তেমন কোনো বিশেষ সংবাদ নেই, কিছু দূরে একটা সমবেত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাত্র। বিষাদের ছাপের চাইতে এই ধ্বনিটার মধ্যে একটা স্বাভাবিক এবং পরোক্ষ বিজয়ের আভাস ছিল। দিনের বেলা তিনি বেরোবেন না ঠিক করলেন। শরীর বড় দুর্বল। বাইরের কারো প্রতি, কোনো সংবাদের প্রতিও তাঁর কোনো কৌতুহল ছিল না। দুপুরের রোদের তীব্রতা তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনুভব করলেন। সঙ্গে তিনি বাতাসের স্বাভাবিক ঘনত্ব, ধোঁয়া আর মড়া পোড়ার গন্ধও অনুভব করলেন। ক্রন্দনের শব্দ তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়। হরিধ্বনির মধ্যে তিনি নির্বিকার ভাবে মৃত্যুর বিজয়োল্লাস শোনেন। নিজের অনুভূতিতে তিনি এখন নির্ভয়, নিশ্চিত। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে, গভীর দুঃখের মধ্যে, জীবনকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে

দেখতে পেলেন। এমন কি, কাল যারা সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, তাদের দু একজনের সঙ্গেও তিনি ক্ষীণ হাসির সাহায্যে সহজ ভাবে সম্ভাষণ করেছিলেন। প্রাচীন চিত্রের চিরস্থায়ী হাসির মতো তাঁর হাসির মধ্যেও আত্মজ্ঞানের বোধ নিহিত ছিল, আর বিশৃঙ্খল চুল, রাঙা-চোখ, দাড়িভর্তি মুখে ঘন রাত্রির তড়িৎরেখা সদৃশ্য সেই হাসি দিয়ে রোষেশ্বর পণ্ডিত তাদের সবাইকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন।

বিকালে রবিধর এল। খবরাখবর করার গাঁয়ে আর কেউ বড় ছিল না। প্রত্যেক ঘরে মৃত্যুর বাধাহীন অভিযান চলছে। আজ ভোরে পদ্মের বিধবা মা পার হয়েছেন। মহীরামের ছোট বোন আর ভাগনী আগে-পিছে গেছে। পদ্মরা বাড়ি ফিরে আবার শব নিয়ে গেছে। ডাইনীচুক প্রায় শেষ হয়ে গেছে। লেতেকুবারী, গেলেকীর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছে। নূতন ঔষধপাতি নিয়ে আরেকটা দল তাদের গ্রাম এবং আরিভাঙ্গার উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

সন্ধ্যায় মহীরামের বাড়ি থেকে ফিরে এসে রোষেশ্বরের মনে হল যে গ্রামখানা আর নেই, শেষ হয়ে গেছে। মহীরামের পরিচিত কঠোর মুখের উপর তিনি ভয়ের ছায়া লক্ষ্য করেছেন। রাস্তা নির্জন। বাড়িগুলি নীরব ও নিষ্প্রদীপ। অন্ধকার অদ্ভুত রহস্যময়। শিকার সন্ধানী কুকুরগুলি নিজের ভাষায় কি যেন বলছে। দিনে অসংখ্য শকুন আর কাক এসে হুলুস্থুল করেছিল। মানুষের উপর তারা ক্রুদ্ধ। ভক্ত পাগলা যে মারা গেছে কেউ জানত না। উঠানে শকুন নামতে দেখে কার যেন নজরে পড়ে। শব সরিয়ে নেওয়ার পরও হতাশ ক্ষুব্ধ শকুনগুলো বিকাল পর্যন্ত শিমূলগাছের মধ্যে বসে ছিল। কাকগুলো অবশ্য চতুর, অল্পক্ষণ চেঁচামেচি করে সরে গিয়েছিল। গ্রামখানি এখন শ্মশান। বাতাসে নির্ভুল শ্মশানের গন্ধ। কেবল শ্মশানের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের রক্তক্ষরা হাসি এখানে নেই। কিছুদিন আগে যে বন্যা হয়েছিল সে কথা এখন সহজেই ভুলে যাওয়া যায়। বরঞ্চ রোষেশ্বর পণ্ডিতের মনে হয় যে গোটা গ্রামখানার উপর দিয়ে প্রচণ্ড এক স্রোতের প্রবাহ এখন বয়ে চলেছে এবং গ্রামের একেকটি অংশ ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। আর তিনি এই ক্ষীয়মান অস্থিরতার মধ্যে, অহরহ ধ্বংসের মধ্যে, নিঃসম্বল দর্শক সেজেছেন। ভোগেশ্বরের ঘরে একটা বাতি জ্বলছে। তিনি বাচ্চা-কাচ্চাদের কথাবার্তা সোনার জন্য কান পাতলেন, নেই, বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। সোমলতা বসে আছেন বৈরাগ্য সাধিকার মতো, নিকটে মূক, রিক্তা, লুণ্ঠিতা চেনেহি, উভয়ে মিলে অভিনব একটা গ্রাম্য দৃশ্য রচনা করেছে। কোনো কথা না বলে রোষেশ্বর ভেতরে ঢুকলেন। আজ ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়নি, কিচ্ কিচ্ বালু পায়ে লাগে। অন্ধকারে অনুমানে তিনি খাটে উঠলেন।

এ গাঁয়ের অনেক মানুষ একই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। অনেক পরিচিত মুখ আর দেখা যাবে না। বুড়ো মাঘিরাম গেল। ঘনদের বাড়িতে সাতজন ছিল, সবাই শেষ। রমাকান্তর ছেলে বৌ গিন্নী সবাই, শুধু রমাকান্তই টিকে আছে। সারাদিনের

চিতার উত্তাপ আর ধোঁয়া গরমের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মৃত্যু ও ময়লায় গাঁ ভরে উঠেছে, বাতাসে তার দুর্গন্ধ। মৃত্যু সহজে আসে, দ্রুত আসে। হঠাৎ আরম্ভ হয়। মাত্র দু'এক ঘণ্টার কষ্ট, শরীর ঘামে, হাতে পায়ে খিঁচুনি ধরে, বমি পায়খানা, তারপর শেষ। মৃত্যু বড় সহজ। রাত বাড়ে। রোষেশ্বর পণ্ডিত ঘুমাতে চেষ্টা করেন। ঘুম আসে না, একটু যেন পেট কামড়াচ্ছে মনে হল। দুবার চোঁয়া ঢেকুর উঠল। শরীরটা একটু গরম লাগছে। বমির ভাব। মৃত্যু আসছে, রোষেশ্বর সহজ ভাবে ভাবলেন। আশ্চর্য, তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন, যেন বেশ স্বস্তি এসেছে মনে, তাঁর সব ভয় দুঃখ যন্ত্রণা যেনু অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তিনি প্রস্তুত, পুরুষের মতো তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন, তিনি নিজেকে বললেন (অর্থাৎ তিনি পলায়ন করতে চাইছেন, তাঁর ভয় দুঃখ সব কিছু একটা বিস্ফোরণের বিন্দুতে উপনীত হয়েছে)। কাল থেকে তিনি কামনা করছেন, মৃত্যু আসুক, কারণ এখন তাঁর জীবনে শেষ ঋতু চলছে, এখন অপরাহ্ন, তাঁর বিদায় বেলা সমাসন্ন। সম্প্রতি তাঁর মুখের মধ্যে একটা নিষ্কৃতির ভাব বিরাজমান। ছেলেমেয়ের কথা অত্যন্ত নিরুদ্বেগ ভাবে তাঁর মনে এল। সোমলতালে ডাকবেন কিনা চিন্তা করলেন, তারপর ঠিক করলেন ডাকবেন না। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। চোখ দুটো তিনি বন্ধ করলেন।

প্রথমে তিনি দেখলেন, আলো। কি হয়েছে ভাবার চেষ্টা করলেন। একটা দরজা, দরজার লাগোয়া একটা ঘর, ওদিকে অন্ধকার। মাটির দেওয়ালে একটা বৃত্ত, কাঠের এমব্রয়ডেয়ারির একটা ফ্রেম। কোনো কিছু পরিষ্কার হল না। হঠাৎ একটা তীব্র শব্দ—যেন কার গালে একটা চড় পড়ল এবং সেই মুহূর্তের নীরবতার পর বাধাহীন ক্রন্দনের ধ্বনি। আর অকস্মাৎ রোষেশ্বর পণ্ডিত বহু উপর থেকে নীচে পড়ে গেলেন। কলের গানের শব্দে শৈশবের মেলার যে স্মৃতি মনে জাগে, এই ক্রন্দন তেমনি এক পুরানো পৃথিবীর কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিল, যেখানে অভিযোগ ছিল, আক্ষেপ ছিল, প্রতিবিধান ছিল, সান্ত্বনা ছিল। রোষেশ্বর একটা স্মৃতিবহ বেদনা অনুভব করেন। কারণ মানুষের মুখের ভাষায় এখন কোনো সান্ত্বনার স্পর্শ নেই, শোকের আর্তনাদে নেই ঈশ্বরের প্রতি কোনো অভিযোগ। তাঁর মনে পড়ল যে কাল রাতে তিনি শেষনিদ্রার জন্য চোখ বুঝেছিলেন। একটা নিরাশা নিঃশ্বাস হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, কেন না, তিনি নিজের অজ্ঞাতেই গোপনে একটা আশা করেছিলেন। চোখ বন্ধ করে রোষেশ্বর আবার শুয়ে রইলেন। তন্দ্রার ভাব এসেছিল, কিন্তু কার যেন হাতের স্পর্শে তিনি চমকে জেগে উঠলেন।

"ওঠো তো—তাড়াতাড়ি", ভীত উদ্ভ্রান্ত সোমলতাকে তিনি মুখের উপরে দেখতে পেলেন। রোষেশ্বরের হৃদপিণ্ড মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, চোখ দুটো বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, তারপর তিনি সহজ হলেন। সোমলতা ছোটছোট নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, ভয়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

"কার?" তিনি বিছানা থেকে নামবার উপক্রম করছিলেন।

"দুটোরই—বৌয়েরও—সোনটা বেশি কাহিল।"

রোষেশ্বর ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রুত ঘর থেকে বেরুলেন। এই ঘরে মইনা—মুখে তখনও কিছুক্ষণ আগের ক্রন্দনের ভঙ্গিটা লেগে রয়েছে।

একটা খাটে সোন মৃতবৎ শায়িত। পাশে ভয়ে ক্লিষ্ট তাঁর ছোট মেয়ে সাবিত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরেকটি খাটে কেটেকুটে ধুয়ে রাখা মাছের মতো রক্তহীন বিবর্ণ মুখে শূন্য জ্যোতিহীন দৃষ্টিতে চেনেহি বিছানায় উঠে বসেছে। রোষেশ্বর ঢুকলে অভ্যাসবশতঃ যন্ত্রবৎ চেনেহির হাতটি তার মাথার কাপড়ের দিকে গেল। সোনার কাছে বসে রোষেশ্বর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সোমলতা ঢুকলেন। রাতের বেলা সোন বমি করেছে। নিরুপায় নিঃসম্বল মা পাহারা দিয়েছে। ভয়ে অস্থির হয়ে কাউকে ডাকতে সাহস করেনি। সঙ্কোচ করেছে। সকাল বেলা যখন সোন তিনবার পায়খানা আর দুবার বমি করল, তখন হৃদয়ের সমস্ত কিছু উজাড় করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় সে মনোনিবেশ করেছিল। ঠিক সেই সময় তার নিজের শরীরেও মৃত্যুর সংগ্রমণ হল। সে বমি করল। পায়খানার ভাব হল আর তখনই—পাগল হয়ে সোমলতার দরজায় গিয়ে ঘা দিল।

দুর্বল চোখ দুটো সোন কোনোক্রমে মেলে রেখেছিল। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে পড়েছে। মৃত্যুর ভয় তখন তার মনে সঞ্চারিত। সেই ভয় শ্মশানের অশ্বত্থের ছায়ার মতো তার মুখে ধরা দিয়েছে। সে জানে যে তার বাবা নেই, আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না, ফলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। রোষেশ্বর উঠলেন। অস্থির অনিশ্চিত ভাবে নিজের ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর মনে একটা রং-ওঠা টিনের বাক্স আর তার ভেতরে রাখা কিছু ধপধপে সাদা কাগজে মোড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর কথা তখন খেলছিল। শিশুদের খেলার মধ্যে একজন বৃদ্ধকে হঠাৎ টেনে নিলে যেমন কিছুই বৃদ্ধের পক্ষে বোধগম্য হয় না, ঠিক তেমনি তিনিও কি করবেন বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। ঘরে ঢুকে বাক্সটার দিকে এগিয়ে দেখলেন যে বাক্সটার উপরে একটা বই মেলে ধরে মইনা পড়ায় নিমগ্ন। বাক্সটা তার শরীরের নিম্নাংশ ঢেকে ফেলেছে, শুধু মুখখানিই দেখা যাচ্ছে। তার মন থেকে ক্ষুধার তাড়না আর মায়ের প্রহারের গ্লানি মুছে গেছে। তার করুণ মুখে অল্প আগের শাস্তির নির্মমতা, তার একাগ্র চোখে মগ্ন সরলতা—এই বৈপরীত্যই রোষেশ্বর পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করল। প্রথমে বেদনা, তারপর এক গভীর আসক্তি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। দুর্বল বোধ করে তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে গম্ভীর ভাবে তিনি দরজার মুখ থেকে সরে এলেন।

বাইরে এসে রোষেশ্বর অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন

প্রভাতী দৃশ্য চলছে। আকাশে সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত অজস্র সোনালী বর্শা চিকমিক করছে। মৃত্যুর শিবিরে প্রস্তুতির উল্লাসধ্বনি উঠেছে। রোষেশ্বর রোগীর কোঠায় ঢুকে বসলেন। সোনকে বাইরে ভেতরে আনা নেওয়া করলেন। বৌকে সোমলতা পরিচর্যা করছেন। তাঁর দিকে, সাবিত্রী আর মইনার দিকে বারবার তাকালেন। তাঁর মনে অনর্গল তর্ক উঠছে। ভয় এবং দুঃসাহস রক্তস্রোতের গতির মধ্যে পরিবর্তন আনছিল। তিনি আবার উঠলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে গেলেন। নিজের ঘরের দরজায় দেখলেন সোমলতা তাঁর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। রোষেশ্বর থেমে গেলেন। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে বাক্সটার দিকে ধীরে ধীরে এগুলেন। বাক্সের উপরে নিজের বইখাতা সুন্দর করে গুছিয়ে মইনা এখন বিছানায় শেলেট, পেন্সিল নিয়ে ব্যস্ত। রোষেশ্বরের দৃষ্টি বইয়ের সমাবেশের মধ্যে হারিয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন যে সোমলতার দৃষ্টি তাঁর পিঠের উপর নিবদ্ধ আর পিঠ ভেদ করে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। তিনি ঢোক গিললেন। বাক্সটার কাছে গিয়ে বিছানার নীচ থেকে একটা টুকরো বের করে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন, তারপর বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিপ্রাহরিক মৃত্যুর ধ্বনির মধ্যে, গাঁয়ের আকাশে কাক, শকুন, কুকুরের চিৎকারের সমারোহের মধ্যে আরো একটা মৃত্যু অন্য একটা সাধারণ ঘটনা হিসাবে যুক্ত হল। রোষেশ্বর পণ্ডিতের হাতে ভোগেশ্বরের ছেলে সোন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। শ্বেতশুভ্র রাজহাঁসের গলার নির্বোধ সরলতার মতো তার চোখ দুটো চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় বার শ্মশান থেকে ফিরে আসতে রোষেশ্বর পণ্ডিতের সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে রবিধর। পা দুটো ভারি ঠেকছে। শরীরে শক্তি নেই। রবিধরকে বিদায় দিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। ভোগেশ্বরের দোকানের বারান্দায় একটা কুকুর মাথা পেটের মধ্যে গুঁজে শুয়েছিল। তাঁকে দেখে লেজ ফেলে বাঁকা হয়ে দৌড়ল। দোকান অনেকদিন ধরেই বন্ধ, রোষেশ্বর দেখলেন এখন তাঁর বসত বাড়িটাও বন্ধ। সোমলতা ইতিমধ্যেই ঐ ঘরে একটা তালা মেরেছেন। তিনি নিজের বাড়ি এলেন। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়েও থেমে গেলেন। অদ্ভুত একটা ভয়ে শরীর গ্রাস করেছে। তিনি অস্বস্তিবোধ করলেন। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন মইনা আর সাবিত্রী পিঁড়ি পেতে বসেছে, সোমলতা কি একটা আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি বাইরে এলেন। ভেজা কাপড় গায়েই শুকাচ্ছিল, তিনি মাটিতেই বসে পড়লেন।

সন্ধ্যার মেঘহীন আকাশে তারা উঠেছে। উৎকট রোদের তাপ এখন নেই। পারিপার্শ্বিকতায় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। হঠাৎ রোষেশ্বর পণ্ডিত চমকিত হলেন। নিজের হৃদয়ের গভীরতার মতো, মায়ের স্নেহস্পর্শের মতো এক দমকা হাওয়া কোত্থেকে বয়ে এল। তিনি অনুভব করলেন যে নির্মেঘ তারকাখচিত আকাশে প্রভুর

আরতির আয়োজন চলছে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এক অতিভৌতিক অনুভূতি, সন্ধ্যার প্রশান্তিতে নিহিত বিস্মৃত ঈশ্বর গীতের স্বর্গীয় আভাস, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে একটা অতিপ্রাকৃতিক আবহ। পাপীর নিঃসঙ্গ অসহায় চেতনাই তাঁর অন্তরকে জর্জরিত করে তুলল। ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস তাঁর অন্তরকে হাহাকারে আকীর্ণ করল, কিন্তু তিনি কাঁদতে সাহস করলেন না। কারণ ক্রন্দনের জন্য নিভৃত কোনো আশ্রয়, সান্ত্বনার জন্য একান্ত গোপন কোনো সঙ্গী তাঁর ছিল না। আর ভয়, আদিম ভয় তাঁকে কম্পিত করছিল। ধমনীতে, শিরা-উপশিরায়, মাংস পেশীতে সেই ভয় প্রবাহিত। রোযেশ্বর পণ্ডিত অন্ধকারে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুহাত একত্র করলেন। আর সেই সময়ে সোমলতা বাতি নিয়ে ঢুকলেন আর তাঁর কাছে এসে কী যেন একটা এগিয়ে দিলেন। যান্ত্রিক ভাবে রোযেশ্বর পণ্ডিত বাতির মৃদু আলোয় দেখলেন যে তাঁর হাতে সোমলতা এক কাপ চা এগিয়ে দিয়েছেন। কাপটা ধরে তিনি সোমলতার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য ক্রমানুসারে প্রশ্ন, উত্তর, বিস্ময়, বজ্রাঘাত সবগুলোই বিদ্যুৎরেখার মতো স্পষ্ট হয়ে আবার মিলিয়ে গেল। সেগুলোর কোনোটাই পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার আগেই তাঁর দৃষ্টি মাটিতে নেমে এল। কারণ রোযেশ্বর পণ্ডিত সেই মুহূর্তে মেঘমুক্ত তারা-ভরা আকাশ থেকে, প্রশান্ত সন্ধ্যার মধ্য থেকে, ঝিরঝির হাওয়া থেকে, প্রকৃতির মৌন প্রার্থনা থেকে, গার্হস্থ্যের উচ্চতা থেকে, সোমলতা থেকে পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে শূন্যতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতে চাইছিল। ❐

**ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া**

জন্ম 1932, নগাঁও। কটন কলেজ থেকে বি এস. সি. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস. সি। অতঃপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি এবং ইম্পিরিয়েল কলেজ থেকে ডি. আই. সি উপাধি নিয়ে এসে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসাবে যোগদান করেন। কয়েক বছর পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক প্রকাশনা বিভাগের সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রী শইকিয়া 1952 সাল থেকে নিয়মিত গল্প লিখে আসছেন। তাছাড়া মৌলিক ধরনের নাটক ও বেতার-নাটকও রচনা করেছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথিকা ও সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধও লিখে থাকেন। উদয়, অরুণাচল, জালুকবারী, প্রাথমিক বিজ্ঞানকোষ ইত্যাদি কয়েকটি বই ও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। গল্প সংকলনগুলিব নাম—প্রহরী, বৃন্দাবন, গহ্বর এবং সেন্দুর।

# সমাধি

পূর্বে চৌরাস্তার মাংসের দোকান, পশ্চিমে সরাবভাটি। এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে দীনের ডিউটি পড়েছিল। রাস্তার কিনারা দিয়ে, এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে একবার সে মাংসের দোকান পর্যন্ত গেল, আবার ফিরে এল সরাবভাটিতে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় সে রইল মধ্যের পূজামণ্ডপটার আশেপাশে। মণ্ডপটার নীচেই বাসস্ট্যাণ্ড। বিভিন্ন চেহারার, বিভিন্ন আকৃতির বাসগুলোর কোনটার বা এখানে এসে যাত্রা শেষ, কোনটার বা শুরু। আধঘণ্টা আগে কদমতলা থেকে যদি 'মা শীতলা' নামের বাসটি এল, আধঘণ্টা পরে 'ভাগ্যলক্ষ্মী' নামক বাসটি পলাশনি-র দিকে যাত্রা শুরু করল। ইতিমধ্যে হয়তো 'দীপক' বাসটির হ্যাণ্ডিম্যান গোটা বাসরুটের আশেপাশের গ্রামগুলোর নাম চিৎকার করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে। এই স্ট্যাণ্ডে সাধারণত দিনে চারটির মত বাস যাত্রা শুরু এবং শেষ করে। তার বাইরে শহরে যে কয়টি বাস থাকে, সেই কয়টির ড্রাইভার আর হ্যাণ্ডিম্যান কাছের যখিনীমারা নদীতে নিয়ে বাসগুলোর আগপাশতলা ভাল করে ধুয়েপুছে নেয়। এ কদিন পূজা বলে বাসস্ট্যাণ্ডটা এখন বেশি ব্যস্ত, যখিনীমারার পারে এখন কোনো বাস নেই। অসুস্থতা জড়তা বার্ধক্য ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে বাসগুলো এ কদিন চারদিকের গ্রামগুলোর সঙ্গে একটা উৎসবসূচক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

বাসগুলি স্ট্যাণ্ডে আসার সঙ্গে সঙ্গে দীন পূজামণ্ডপ থেকে একটু সরে এসে বাসের যাত্রীদের প্রত্যেককে আলাদা করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করে। শহরের চারপাশে পনেরো কুড়ি মাইল এলাকা জুড়ে যে সমস্ত বসতি তাতে আদিবাসী ও চা-শ্রমিকদের

সংখ্যাই বেশি এবং শহরে পূজা দেখতে আসার সখও তাদেরই বেশি। তাই বাস থেকে তারাই দলে দলে নামছে। পরণে রঙিন রেশমি শাড়ি যুবতী মেয়েরা নামছে, তাদের মুখগুলো তৈলাধিক্যে চিক্‌চিক্ করছে। কোলে পিঠে শিশু নিয়ে আধবয়সী মেয়েরাও রয়েছে। যুবকরা রয়েছে, তারা সেজেগুজে এসেছে, ফর্সা কাপড়, গলায় রুমাল, বেশ একটু সবজান্তা ভাব। বুড়োরা নামছে, তাদের মুখে বাঁধা বুলি, "আগের দিনের সেই পূজা আর কোথায় পাবে হে?" বিচিত্র ধরনের অসংখ্য সব যাত্রী। তার মধ্যে লখিমী সরুমা এরাও আছে কিনা, প্রতিটি বাসেই দীন তা খুঁটিয়ে দেখে। তাদের না দেখে সে একদিকে নিরাশও হয়, আবার অপরদিকে আশ্বস্তও বোধ করে। এই মাত্র একটা বাস এসেছে। সেটা সে পর্যবেক্ষণ করে। আরেকটা বাস আসতে দেরী আছে। এই ফাঁকে সে মাংসের দোকান, চৌরাস্তা আর সরাবভাটি এক চক্কর ঘুরে আসে, তারপর আবার পূজামণ্ডপের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তার একটা সন্দেহ থেকে যায় যে সে যখন ওদিকে গিয়েছিল তখন তার অজ্ঞাতে কোনো বাস এসেছিল কিনা, এবং তাতেই লখিমী ওরা ছিল কিনা। তাই প্রত্যেক বারই ওদিক ঘুরে আসার পর সে স্ট্যাণ্ড-এর আশপাশের জায়গাগুলো খুঁজে দেখে। না; ওরা আসেনি।

দীনের খুবই বিরক্তি লাগছিল। এমনিতে সাধারণ গরম সে গ্রাহ্যই করে না, তাছাড়া আজকের দিনটি তেমন গরমও নয়। তবুও ইচ্ছা হয় রাস্তায় ঘোরাফেরা বন্ধ করে মণ্ডপের কোনো একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। হাতের হুইসেল বাঁধা দড়িটার ঘষায় খাকি শার্টটির হাতা ঘামে ভিজে গেছে। টুপিটা দুবার খুলে দেখেছে। ভিতরের দিকটা স্যাঁৎস্যাতে হয়ে গেছে। বারবারই ইচ্ছা হচ্ছে যে ধরাচূড়াগুলো খুলে একটু নিজের মতো করে আরামে বসতে।

অন্যদিন সে রাস্তার পাশের দোকানীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, খিলিপান দু-একটা খেয়ে বেশ ফূর্তি করে ডিউটি দেয়। আজ তা হচ্ছে না। সামান্য কথায় তার মগজ গরম হয়ে যাচ্ছে, মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা রিক্সাওয়ালা চিৎকার করে ঝগড়া শুরু করে দিল, দীন দৌড়ে গেল—কি হয়েছে। ব্যাপার কিছুই নয়—শক্তিধারিনী শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অল্প কারণ খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে দুজন চা-বাগানের কুলি রিক্সায় উঠে গোটা শহরটি দেখে বেড়িয়েছে। এখন নামবার সময়ে রিক্সাওয়ালা চাইছে দেড় টাকা, লোকদুটো দিতে চাইছে চার আনা। রিক্সাওয়ালার মতে এই দুজন দেড় ঘণ্টা ধরে তার রিক্সা আটকে রেখেছিল। আর লোক দুটোর মতে গোটা জীবনেই তারা মোট বিশ কিংবা পঁচিশ মিনিটের বেশি রিক্সা চাপে নি। দীন লোকদুটোকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে নেশা কাটিয়ে দিল, তারপর এক টাকা ভাড়া দিতে বাধ্য করল। টাকা দেওয়ার সময় লোক দুটো "সমস্ত দুনিয়াই বেইমান" এই জাতীয় কথা কিছু বলে তাড়াতাড়ি সরে গেল। ঘটনাটি সেখানেই

শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু হল না। দীন রিক্সাওয়ালাটাকে নিয়ে পড়ল। "আগে ভাড়া ঠিক না করে প্যাসেঞ্জার তুলিস্ কেন"—বলে সে লাঠিটা রিক্সাওয়ালার নাক বরাবর কয়েকবার ঘুরিয়ে আনল, তারপর রিক্সার পেছন দিকে লাঠি দিয়ে দুম করে এক ঘা বসিয়ে বলল, "যা, ভাগ্।"

দীনের আসলে আজকে ডিউটিই ছিল না। পনেরো দিন আগে সে থানার উপরওয়ালাকে অনুরোধ করে রেখেছিল যে এবার যেন পূজার কদিন সে ছুটি পায়। যদি ছুটি দেওয়া একান্ত সম্ভব না হয়, তবে তার ডিউটি যেন রাত্রে পড়ে। মায়ের অসুখ, জমির গণ্ডগোল, বোন সরুমার জন্য বর খোঁজা এবং মাঝেমধ্যে, ঠিক লখিমীকে দেখতে যাওয়ার জন্য নয়, এমনিতেই বাড়ি যাওয়া, এসব মিলিয়ে তার প্রাপ্য ছুটি আর ছিল না। নইলে সে উপরওয়ালাকে ডিউটি থেকে রেহাই দিতে অনুরোধ করত না। উপরওয়ালা একেবারে নীচ থেকে প্রমোশন পেয়ে উঠেছেন, বড় কড়া মানুষ। সিপাই-এর ডিউটি এদিক ওদিক করা আর এক পায়ের জুতা আরেক পায়ে পরা তার কাছে একজাতীয়ই ব্যাপার, সম্ভবপর হলেও কষ্টকর, অনিয়ম এবং অশোভন। তথাপি তিনি কথা দিয়েছিলেন যে একদিন দিনের বেলা দীনকে ডিউটি থেকে রেহাই দেবেন। কিন্তু একদিন হলেই তো হবে না, ঠিক কোন দিন সে ছুটি পাবে সেটা নিশ্চিত ভাবে জানা তার প্রয়োজন, কারণ তাকে আগেভাগে সেই অনুসারে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। শেষে ঠিক হয়েছিল যে নবমীর দিন রাত দশটা পর্যন্ত তার কোনো ডিউটি থাকবে না। সেই অনুসারে সে গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে ঠিক করে এল যে নবমীর দিন লখিমা আর সরুমা শহরে আসবে। সন্ধ্যার আগে সে তাদের শহরের পূজা দেখাবে, সন্ধ্যায় সে তাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে রেখে আসবে, তারপর যদি প্রয়োজন হয় রাতে ডিউটি করবে। এই আসা যাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ পূজার কদিন তাদের গাঁয়ের রাস্তা ধরে বিস্তর বাস মাঝ রাত পর্যন্ত যাতায়াত করে।

সরুমা একটা অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছিল। শুধু মেয়েমানুষ দু'জন, সঙ্গে কেউ নেই, একা একা শহরে যাওয়া—

"না, না, সে কোনো কথা নয়। দিনে দুপুরে মাত্র বিশ মাইল রাস্তা, বাসে উঠে বসলে এক ধাক্কায় শহরে পৌঁছে দেবে। আর সেখানে বাসস্ট্যাণ্ডে তো আমি থাকবই।"—দীন ব্যাপারটাকে সহজ করে দিল।

ফিরে আসার সময় তার বারবার মনে হচ্ছিল যে লখিমীর অন্য কোনো অসুবিধা আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও কথাটা আর তুলল না। বারবার বোনের কাছে লখিমীর নাম উচ্চারণ করতে তার লজ্জা করছিল। তাছাড়া সে জানে যে সরুমা যদি বলে যে সমস্ত আয়োজনটা সে করেছে, তবে লখিমী আপত্তি করবে না।

লখিমীর ব্যাপারে দীনের এখন প্রায়ই লজ্জার একটা অনুভূতি হয়। মুখোমুখি হলে কথাবার্তা শুরু করতে কোনো অসুবিধা হয় না। সে দুঃসাহসিক সিপাই, কত নারী, যুবতীকে সে আফিং বেচা, গয়না চুরি, ভেতরের দরজা খুলে চোরকে ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি দোষ স্বীকার করানোর জন্য ধমক দিয়েই কাঁদিয়ে ফেলেছে। তবু একবার কথা বলার পর লখিমী এমন করে যে তার লজ্জা লেগে যায়। দ্বিতীয় বার কথা বলতে তার কি রকম অস্বস্তি হয়। এক সময় শহরে স্কুলের সমবয়সীদের কাছে রসের কথা শিখে এসে সাত বছরের লখিমীর ফ্রকের কাটা অংশগুলি দেখিয়ে বলেছিল, "কী? বাতাস ঢোকার জন্য জামায় জানালা কেটে রেখেছিস্ নাকি?" লখিমী তখন সাঁৎ করে ঘুরে ফ্রকের কাটা অংশ আড়াল করে নিয়েছিল।

এখন লখিমী দীনের মুখোমুখি হলে নিজের গোটা শরীরটাই অদৃশ্য করার জন্য চাদরটা টেনে টেনে প্রায় ছিঁড়ে ফেলার যোগাড় করে। সে এমন করে যেন সকলের মাপে করা চাদরটা তার জন্য যথেষ্ট নয়। দীন এককালে যে জানালার কথা বলেছিল, লখিমী সেটা মনে গেঁথে রেখেছে আর সেই জানালা যেন সব সময়ই খোলা রয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে লখিমী তার মুখোমুখি হলেই রাঙা হয়ে যায়, বোবা মেরে যায়।

লখিমীর মা-বাবা মারা গেছেন, সে তার ঠাকুমার সঙ্গে থাকে। দূরে একজন মামা রয়েছেন, তিনিই তাদের জমিজমা দেখেন। দেখেন মানে বুড়ি আর লখিমীর বছরের খোরাকি দিয়ে বাকি ধানটুকু নিজে নিয়ে নেন। লখিমীর একটা গতি হয়ে গেলে, আর বুড়ি মারা গেলে এটুকু ধান দেওয়ার ল্যাঠাও আর থাকবে না। দীনের সঙ্গে লখিমীর কি যেন একটা আছে খবর পেয়ে তিনি একদিন ব্যস্ত অভিভাবকের মত শহরের থানায় দৌড়ে এসেছিলেন। দীনকে বলেছিলেন, "তাহলে শুভকাজে আর দেরি করার কি দরকার?"

দীন সসম্ভ্রমে লাজুক লাজুক মুখ করে বলেছিল, "অন্য কোনো অসুবিধা নেই, শুধু বোনটি ; মানে সরুমার একটা ব্যবস্থা আগে করে নিলে ভাল হয়।" সে আরো আশা প্রকাশ করেছিল যে লখিমীর মামা যদি তার ওদিকে ভাল কোনো ছেলে আছে কিনা একটু খুঁজে দেখেন। মামা "হবে, হবে" বলে বেশ জোরের সঙ্গেই সায় দিলেন, তারপর ফিরে গিয়ে একেবারে ডুব মের দিলেন।

বুড়ি ঠাকুমা ছাড়া লখিমীর তাই আর কোনো যথার্থ অভিভাবক নেই। সরুমাও বেশির ভাগ সময় তার সঙ্গেই থাকে, তার মাও সব সময় বুড়ির ভাল মন্দ খবর নিয়ে থাকেন। বুড়ি কোনো কোনো সময় লখিমীকে কাছে ডেকে নিয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন, "এখন তুই আর তার সঙ্গে বেশি মেশামেশি করবি না, তাহলে লোকে খারাপ বলবে।"

গাঁয়ের মানুষ দীনকে একটু বেশিই ভালবাসে, সে একটু এদিক ওদিক করলেও

কেউ তা লক্ষ্য করে না। আজ যে তারা শহরে যাবে, যাওয়ার সময় বুড়ি শুধু "দিনে দিনে ফিরে আসবি" ছাড়া আর কিছু বলেন নি। আর বাসে ওঠার সময়ে দুজন মধ্যবয়সী লোক "যাচ্ছিস্ যা, কিন্তু সেখানে যেন থেকে যাসনি, আর ফেরার সময় কিছু মিঠাই আমাদের জন্য নিয়ে আসবি" এ জাতীয় কথা ছাড়া আর কিছু বলে নি।

এ ধরনের সুবিধা রয়েছে বলেই অনেকদিন ধরেই দীনের মনে একটা বাসনা হচ্ছিল যে কোনো একটা উৎসবের দিনে যদি লখিমীকে এনে শহরটা ভাল করে দেখিয়ে দেওয়া যায়। শহরে দেখার মতো কিছু একটা নজরে এলেই তার প্রথমে লখিমীর কথা মনে পড়ে— ইস্, ওকে যদি এটা দেখানো যেতো। সভা সমিতি তিথি উৎসব কিছু একটা হলেই লাঠি হাতে নিয়ে কেবল গণ্ডগোলের গন্ধ শুঁকে ফেরাটা বড় নীরস কাজ। তাছাড়া একা একা অন্য লোকের হাসি ফুর্তি রঙ তামাসা দেখে ঘোরাটাও বড় ক্লান্তিকর লাগে। ডিউটি না থাকলেও ঘরে বসে থাকাটা আরো ক্লান্তিকর। ঘর মানে হল একটা কোঠা, তার মধ্যে গাদাগাদি করা দশটা খাট, রাতে পাঁচটা খাটে মানুষ থাকে, বাকি পাঁচটা খালি থাকে। ঘরটির সর্বত্র জঞ্জাল, মশারি বাঁধার দড়ি, কাপড় রাখার দড়ি, বেল্ট রাখার দড়ি, টুপি রাখার গজাল। তাছাড়া সময়ে অসময়ে টুয়েণ্টি নাইন তাসের আসর, বিড়ির গন্ধ, মার-পিট, চুরি ডাকাতির তেজাল খবর, সঙ্গীত শিক্ষার্থীর বাঁশির পিঁ পিঁ শব্দ, তদুপরি প্রতিটি কাষ্ঠখণ্ডে অজস্র ছারপোকার অবাধ বিচরণ। বাইরে যখন দুর্গা পূজা চলছে, তখন ঘরে বসে এগুলো সহ্য করা দীনের পক্ষে বড় কষ্টকর হয়। প্রায়ই ভাবে এমন একটা দিনে যদি লখিমী আসত আর তার ডিউটি না থাকত।

এবারে ঠিক সেই সৌভাগ্যের সুযোগ সে করে নিয়েছিল। তার ডিউটি থাকবে না, দুপুরে লখিমী আসবে, তারা ধীরে ধীরে ঘুরে ফিরে পূজা দেখবে, হটেলে চা খাবে, ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখবে, দু চারটা টুকিটাকি জিনিসও কিনবে, তারপরে যদি দেখা যায় যে লখিমী তেমন লজ্জা পাচ্ছে না, তবে দুজনের একটা ফটোও তুলবে। এর জন্যে দীন টাকা আলাদা করে রেখেছে, খাকি লংপ্যাণ্টে ডিউটির গন্ধ কিছুটা থেকে যায়, তাই সে সাদা লংপ্যাণ্ট আর সাদা শার্ট একটা ধোবা বাড়ি থেকে ধুইয়ে এনেছে।

কিন্তু হল না। পাশের একটা গাঁয়ে ভ্রাম্যমান একটা কোম্পানী মাঠের মধ্যে পূজার কদিন ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। কাল অষ্টমী পূজার দিন সেখানে বড়দরের একটা মারপিট হয়ে গেল। হাঙ্গামা অবশ্য রাতেই থেমে গেল, কিন্তু কিছু লোকে উস্কানি দিয়ে তাকে আবার চাগিয়ে তুলতে পারে, এমন আশংকা দেখা দিল। ফলে কিছু সিপাই সেখানে মোতায়েত করতে হল। তাতে শহরে সিপাইর ঘাটতি হল এবং দীনের ডিউটি পড়ল।

দীন খবরটা শুনেই হাউমাউ করে উঠল, উপরওয়ালার কাছে দৌড়ে গেল। উপরওয়ালা বললেন, আরেকজন উপরওয়ালা নাকি তাকে শহরের বাইরে পাঠাতে চেয়েছিলেন, তিনিই বুদ্ধি করে তাকে শহরে রেখেছেন। তাছাড়া পূজার ক'দিন ইমার্জেন্সি রয়েছে।

ফলে দীন পূর্বে মাংসের দোকান আর পশ্চিমে সরাবভাটি, এই অঞ্চলটুকুতে ডিউটি করছে আর বারে বারে সে অস্থির হয়ে পূজা মণ্ডপে ফিরে আসছে। যাত্রীর মধ্যে সে লখিমী আর সরুমাকে খুঁজছে। পূজা মণ্ডপের কাছেই গণ্ডগোল বেশি হয়, স্বকল্পিত এই যুক্তির আশ্রয় নিয়ে সে বেশির ভাগ সময় এখানেই ঘোরাফেরা করার সুযোগ করে নিয়েছে। একেকটি বাস আসে আর সে যাত্রীদের মধ্যে লখিমীদের না দেখে হতাশ হয়। আবার একটু আশ্বস্তও হয়। আজ তাদের না আসাই ভাল, কোনো কারণে যদি তারা আজ আসতে না পারে, তাহলেই রক্ষা। ওরা এলে সে আজ কি করবে? তার ডিউটি কখন শেষ হবে? সে যখন ছাড়া পাবে, তখন লখিমীদের দেখানোর জন্য পূজার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি? আবার তাদের রেখে আসতে হবে! না না, দরকার নেই, ওদের আজ আসার দরকার নেই।

কিন্তু পরমুহূর্তে দীনের মনটি দুঃখে ভরে গেল। নিজেকে বড় অসহায় বোধ হচ্ছে। এত আশা করেছিল আজকের দিনটির জন্য। তার সাদা পোশাকটা এখনও নির্ভাজ ভাবে টিনের সুটকেসে অপেক্ষা করছে, তার বুক পকেটে দেড় কুড়ি টাকা রয়েছে, দোকানে গিয়ে ফটো একখানা তুলতে দশ টাকা লাগে, সে কথা সে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে। বনওয়ারীলালের দোকান যে আজ খোলা থাকবে, সে খবরও নেওয়া আছে, আর সব চাইতে বড় কথা, আজ অনেকক্ষণ ধরে লখিমীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবে বলে তার মনে একটা অদ্ভুত আশা রয়েছে। এই শহরটিকে প্রথম বারের মতো নূতন করে দেখার জন্য তার মনে এক উদগ্র কামনা রয়েছে।

দীন ধীরে ধীরে সরাবভাটির দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে ফিরে আসছে, হঠাৎ মনে হল, পেছন দিক থেকে একটা বাস আসছে। বাসটা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে মুখ তুলে দেখে জানালার কাছে লখিমী বসে রয়েছে। বাস দ্রুত পার হয়ে গেল। দীনের গোটা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক মুহূর্তের জন্য তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান রইল না, পকেট থেকে হুইসেলটা বের করে যত জোরে পারে ফু দিল। বাসটা একটু দূরে গিয়ে থেমে গেল। পূজা উৎসবের সময়ে বাসগুলো বেআইনী কাজ বেশী করে, ড্রাইভার হ্যাণ্ডিম্যান নিজেরাই কথাটা বেশি জানে। তাই তারা দুজনেই ঘাবড়ে গেল। কি জানি কি ল্যাঠা লাগল। যাত্রী-ভরা বাসটার পেছনের দরজায় কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে দীন ভাবল এখন সে বাসখানা থামানোর কি কারণ দেখাবে? প্রথমে সে গম্ভীর হল, হ্যাণ্ডিম্যান-কে বাসটা ছাড়তে

বলল আর এমন ভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল যেন একটা পলাতক আসামী শুধু এই বাসে নয়, সবগুলো বাসেই যাত্রীদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের মধ্য দিয়ে সরুমা ওদের কাছে ভিড়তে তার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু অতিকষ্টে সে ইচ্ছা সে দমন করল।

বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে লখিমী একবার লাজুক চোখে তার দিকে তাকাল, তারপর একটু হাসল। দীন তার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। দু'মাস আগে সে একটা সিল্কের চাদর লখিমীকে দিয়েছিল, সেটাই সে গায়ে জড়িয়েছে। শহরের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার চেহারাটা আরো খুলে গেছে। তার গাল, বাহু, সবই যেন আরো পরিপুষ্ট সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে, তার মুখের ফর্সা রংটা ইতিমধ্যেই রাঙা আভা নিয়েছে।

সরুমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে দীন ভেবেছিল সে প্রথমেই তার কপালের দুঃখের কথা বলে ফেলবে, কিন্তু লখিমীর দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে সরুমার চোখে চোখ রাখতেই থতমত খেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "তোদের এত দেরি হল কেন? অপেক্ষা করছি তো করছিই, পরে ভাবলাম তোরা বোধহয় আর এলিই না।"

সরুমা বুঝিয়ে বলল যে বাসে সিট ছিল না, তারাও অপেক্ষা করতে করতে ভেবেছিল আর বোধহয় আসাই হল না।

"আয়", বলে সে তাদের রাস্তার পাশে নিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় নেবে? দীনের মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। সরুমা এমনিই জিজ্ঞেস করল, "তোর কি এখন ডিউটি রয়েছে নাকি?"

"বলবি না আর", বিরক্তিতে দীনের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। গায়ের খাকি পোশাকটা তার কুৎসিত দুর্গন্ধময় বাঘের ছাল বলে মনে হল, কোমরের বেল্ট, হুইসেলের দড়ি এগুলো মনে হল লোহার শেকল, মাথার টুপিটি হয়ে উঠল অসহ্য বোঝা। সে বলে, "এই গুণ্ডা বদমাসগুলোর জন্য শান্তি পাওয়ার আর উপায় নেই। কে কোথায় মারপিট করল, আর মধ্যি থেকে আমার ছুটিটা কাটা গেল।"

গুণ্ডা বদমায়েসের কথা শুনে সরুমা লখিমী দুজনেই দীনের মুখের দিকে তাকাল। গুণ্ডা বদমায়েসের তো কথাই নেই, সাধারণ ঝগড়াঝাঁটির কথা শুনলেই তাদের ভয় হয়। লখিমীর আবার রক্তের কথা শুনলেই মাথা ঘোরে। সরুমা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, "কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?"

দীন কথাটাতে পাত্তা দিল না। সরুমাই তখন জিজ্ঞেস করে, "তোর ডিউটি কখন শেষ হবে?"

"কি জানি, কেউ বলতে পারবে না, নিয়ম মতো তো ছ'টা বাজলে শেষ হওয়ার কথা।" বিরক্তিতে দীনের মনটা হাঁড়িতে জিইয়ে রাখা মাছের মতো উঠানামা করছিল।

লখিমী সরুমাকে চাপা গলায় কি যেন বলল, সরুমা 'বাদ দাও' বলে কথাটা উড়িয়ে দিল। লখিমী এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি, তাই দীন আগ্রহ ভরে বোনকে বলল, "কী হল?"

"কিছু হয়নি, ও বলছে আজ আমরা না এলেই ভাল ছিল।"

দীন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—"না না, সে কথা নয়। আমার এখানে ডিউটি। ডিউটি মানে রাস্তায় রাস্তায় পূজা দেখে ফেরা। কোনো অসুবিধা হবে না। এসো।"

"একটু আস্তে হাঁটো। আমরা এতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না।"

দীন থেমে গেল। সে পা চালায় নি, কিন্তু তবুও সে এগিয়ে গিয়েছিল। এমনিতে পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার অভ্যাস সে অনেক করেছে, কিন্তু লখিমীদের পায়ের সঙ্গে পা মেলানোর অভ্যাস তার একেবারেই নেই। এবারে তার চোখ গেল লখিমীর পায়ের দিকে। শহরের মেয়েদের লঘু ধীর পদক্ষেপ সে অনেক দেখেছে, লখিমীর হাঁটার ভঙ্গিটিও ঠিক সেই রকম। তার মনটা প্রসন্নতা আর সন্তুষ্টিতে ভরে ওঠার উপক্রম হল, কিন্তু তখনই আবার নিজের ভারী বুট জুতার নীচে থেকে উত্থিত কর্কশ পদধ্বনি তাকে বিমর্ষ করে দিল।

তারা পূজামণ্ডপের কাছাকাছি পৌঁছেছে, এমন সময় মনোহরপ্রসাদ তাকে ইঙ্গিত এবং শব্দ মিশিয়ে বিচিত্রভাবে ডাকল। মনোহর চালানী আমের ব্যাপারী, দীনের সঙ্গে ভাব রাখার চেষ্টা করে। দীন দাড়াল, লখিমী ওরা এগিয়ে গেল। রাস্তাটা পার হয়ে এসে মনোহরপ্রসাদ গোপন কথা বলার মত করে বলল, "কি হল?"

দীন পাল্টা প্রশ্ন করে—"কি—কি হবে?"

মনোহর চোখের ইঙ্গিতে লখিমীদের দেখাল। দীনের মাথায় হঠাৎ একটা রক্তের পিণ্ড যেন দলা পাকিয়ে উঠল। মনোহরের ইঙ্গিতটি সে সম্পূর্ণ হতে দিল না, বলল, "এ আমার বোন, সঙ্গের মেয়েটি আমাদের গাঁয়ের, আমার বোনের বন্ধু।"

মনোহরপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আশ্রমকন্যাদের অভিভাবক মুনিঋষিদের মতো সৌম্যমূর্তি ধারণ করল। সাঁচিপান, কিমাম আর জর্দায় রক্তিম দন্তপংক্তি বিকশিত করে হা হা করে একবার হাসল, তারপর বলল, "পূজা দেখতে এসেছে? দেখাও দেখাও। আমাদের ওদিকে বড়বাজারের কাছে একটা জবর পূজা হচ্ছে না, সেখানে নিয়ে যেয়ো একবার।"

দীন গম্ভীর মুখে সরে এল। এ টাইপ্‌টা সে চেনে। পূজা উৎসবের সময় গাঁ থেকে যে সমস্ত মেয়েরা আসে, অনেক সময়ই অভিভাবক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তারা বিপদে পড়ে, আর সে ধরনের ক্ষেত্রে ত্রাণকর্তার ভূমিকা নেওয়ার জন্য কিছু মানুষ অনবরত শহরটা চক্কর দিয়ে বেড়ায়। "পূজাটা যাক, তারপর তাকে একবার দেখব—" বলে দীন মনোহরপ্রসাদের নামে একবার দাঁত কিড়মিড় করল।

কোথায় একটা মোটর সাইকেলের ভট ভট আওয়াজ শুনে সে কান খাড়া করে দাঁড়াল। না, এটা অন্য ; থানার ওসির একটা মোটর সাইকেল আছে, তার শব্দ সে চেনে।

সে লখিমীদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, হঠাৎ হাঁটার গতি কমিয়ে দিল। লখিমীদের পাশে পাশে ঘোরার তার অন্য একটা অসুবিধাও রয়েছে। তার কোনো উপরওয়ালা যদি হঠাৎ এসে পড়েন। বিশেষ করে সেই তিরিক্ষি তেওয়ারী। বৌ পরিবারকে সাতশো মাইল দূরে ফেলে রেখে শুধু মনিওর্ডার পোস্টকার্ডের উপর ভরসা করে মহাসুখে বছরের পর বছর যে কাজ করে যাচ্ছে, সে যদি তাকে আজ লখিমীদের সঙ্গে নিয়ে ডিউটি করতে দেখে, তবে কি দীনের কৈফিয়ৎ তলব না করে ছেড়ে দেবে?

সামনে লখিমী যাচ্ছে, তার দিকে দীন বড় করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। হাঁটতে গিয়ে লখিমীর গোটা শরীরটাই ছন্দময় একটা দোল খাচ্ছে। তার নিজের কিনে দেওয়া সিল্কের চাদরটি সেই দোলের মধ্যে একটা মাতনের সঞ্চার করেছে। দীনের ইচ্ছা হল একবার সে চাদরটার উপর, লখিমীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

ওদের কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য সে পা চালাল। যা হয় হবে। সে বেড়াবেও, ডিউটিও করবে। সন্ধ্যায় ডিউটি শেষ হলে পর এদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু একদিকে মদের দোকান, অপর দিকে মাংসের, এর মধ্যে বেড়ানোই বা কি হবে?

একটু ইতঃস্তত করে সরুমার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় লখিমীর উদ্দেশে বলল, "আসলে এখানে টাউন বলতে এই রাস্তাটাই বোঝায়, বুঝেছ? ভাল ভাল সব দোকানপাট এখানেই রয়েছে। ওদিকে আরেকটা রাস্তা আছে, সেদিকে কাছারী, সিনেমা হল, আমাদের থানা, এই সব রয়েছে। মিছেমিছি বড় হুলুস্থুল হয় ওদিকে। তাছাড়া পূজার এই কদিন ওদিকে ভাল ভদ্রমানুষ যাওয়া আসাই ছেড়ে দিয়েছে।"

শহরটি সত্যিই ছোট, কিন্তু দীন যেভাবে বলল তত ছোট নয়। কথাগুলি বলে দীনের বড় দুঃখ হল। কোনোক্রমে যদি এই মুহূর্তে ইমার্জেন্সি শেষ হয়ে যায়। এই মুহূর্তে যদি গাঁ থেকে সিপাইগুলো ফিরে আসে, আর তাদের মধ্য থেকে একটা সিপাই যদি তাকে মাত্র এক ঘণ্টার জন্য রেহাই দেয়।

সেগুলোর কোনোটা ঘটারই আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই, লাভের মধ্যে তার হাতে যেটুকু সময় আছে, তাও পার হয়ে যাবে। তাই সে যা করবে বলে ঠিক করেছে, সেগুলো করে নেওয়াই ভাল।

"তোদের খিদে পায় নি?"—অল্প একটু এগিয়ে দীন জিজ্ঞেস করে। লখিমীর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে সে মাথা নীচু করে আছে। সরুমাও কোনো উত্তর দিল না।

"তাহলে চল—" বলে হোটেলের কথাটা বলতে গিয়েও সে থেমে গেল। দূরে একটা ভীড় জমেছে, সেখান তেকে গণ্ডগোলও একটা ভেসে আসছে।

"তোরা একটা কাজ কর না" দীন ব্যস্ত হয়ে উঠল, "বলছি তোরা এই পূজা মণ্ডপে গিয়ে একটু ঠাকুর দেখ্, একটু বসাও হবে। আমি চট্ করে ওখানে কি হচ্ছে গিয়ে দেখে আসি।"

পূজার চালাঘরের ভিতরে সরুমা ও লখিমীকে ঢুকিয়ে দীন পুলিশী পদক্ষেপে ভীড়টার দিকে এগুলো।

গণ্ডগোল বিশেষ কিছু নয়। একজন ব্যাপারী দু'টাকা করে ছুরি কাটারি বিক্রী করছিল, হঠাৎ দাম কমিয়ে আট আনা করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। ফলে গ্রাহকদের ভীড় উপচে পড়ল আর তার সুযোগে কে যেন কোনো পয়সা না দিয়েই চারখানা ছুরি হাতিয়ে নিল। কে নিয়েছে জানা নেই, কিন্তু উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজনের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করায় সে ছুরি দিয়ে ব্যাপারীর পেট ফাঁসিয়ে দেবে বলে ঘোষণা করেছে। এমনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দীন গিয়ে তাদের মাঝখানে পড়ল। বেশি বাছবিচার করার ধৈর্য তখন দীনের ছিল না। সরকারী রাস্তার উপর দোকান খোলার অপরাধে ব্যাপারীটির মাথার উপর দিয়ে সে দু'বার লাঠি ঘোরাল, তারপর ছুরি কাটারি একটা পোটলায় বেঁধে রাস্তার পাশের একটা বারান্দায় ফেলে দিয়ে সে আবার পূজামণ্ডপে ফিরে এল।

মণ্ডপে লখিমী আর সরুমা প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের কাছে একটা বেঞ্চ রয়েছে, কিন্তু তারা বেঞ্চে বসে নি। কে জানে কার বেঞ্চ, কে বা বসার জন্য এনেছে। দূর থেকে তাদের দেখে দীনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাদের মুখ বড় মলিন দেখাচ্ছে। দেখে মনে হল তাদের অস্বস্তি হচ্ছে, ভয় হচ্ছে। চারদিকের মানুষ কেউ বা সোজাসুজি, কেউ বা আড়চোখে তাদের দেখছে। দীনের নিজেকে অপরাধী মনে হল। না, এখন থেকে সে তাদের কাছাকাছি থাকবে।

কিন্তু তা হল না। বেলা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা শহরটির সমস্ত মানুষেরই নিজ নিজ কাজকর্ম যেন সব শেষ হয়ে গেল। নবমী পূজার বিকালটিকে জীবন্ত করার বাইরে কারো যেন আর অন্য কোনো দায়িত্ব নেই। দোকানপাট, রাস্তাঘাট সব ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মানুষের প্রাণ-প্রাচুর্যের যেন আর শেষ নেই।

একবার দীন লখিমীদের রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে আগেকার মনে মনে ঠিক করে রাখা সেই চায়ের দোকানটির পর্দা দেওয়া কেবিনগুলোতে উঁকি মেরে এল। একটা কেবিনও খালি নেই। প্রত্যেকটিতে পুরুষ মানুষ বসে রয়েছে। অল্প পরে আবার দেখবে বলে ঠিক করে সে লখিমীদের মাংসের দোকান পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনল। লখিমীদের পায়ের গতি মন্থর হয়ে এসেছে। ফলে পরের বার যখন চায়ের দোকানটির কেবিনগুলো খালি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখল না, তখন দীন সাহস

করে বাইরের খোলা জায়গায় একটি টেবিলেই সরুমা আর লখিমীকে বসিয়ে দিল। সেও বসল মুখোমুখি। বসেই সঙ্কোচভরা দৃষ্টিতে সে একবার চারদিকে তাকাল। প্রায় প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে তার চোখাচোকি হল। ঘুপটি ঘরে বাতাস চলাচল প্রায় ছিলই না, তার মধ্যে খাকি কাপড়ের ভারে সে ঘেমে উঠল।

"তোদের পা ব্যথা করছে নাকি?" নিজের দোষী মন দিয়ে সে ওদের তোষামোদ করার চেষ্টা করল। সরুমা নীচু গলায় জানাল যে ব্যথা করছে না। লখিমীর মুখখানি লালচে হয়ে আছে। তার চোখে চোখ পড়তেই দীনের মন একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। এত কাছাকাছি, এমন মুখোমুখি লখিমীকে নিয়ে সে কখনও বসে নি, এমন করে কখনও লখিমীকে দেখেও নি। ডিউটির বেদনা আর লখিমীর সান্নিধ্যের মধ্যে পড়ে তার কথাগুলো অসংলগ্ন হয়ে যেতে লাগল। চা টেবিলে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে সে শহরের পূজা, সিপাই-এর দায়িত্ব, কিছুদিন পরেই যে ছোট্ট নিজস্ব ঘর পাবে, এখন যে কোনোক্রমে অন্য লোকের সঙ্গে রয়েছে, এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশৃঙ্খল ভাবে বহু কথা বলে চলল।

মিষ্টি খেয়ে দীন সিঙ্গাড়াটিতে কামড় বসিয়েছে, এমন সময় বাইরে অল্প দূরে মোটর গাড়ির হঠাৎ জোর ব্রেক টানার কর্কশ একটা শব্দ শোনা গেল। সিঙ্গাড়ার অবশিষ্ট অংশ হাতে নিয়ে সে কান খাড়া করল। একবার ভাবল থাকুক, যা হবার হোক, কিন্তু পরের মুহূর্তে তার অস্বস্তি হল, আর একটু পরেই তার অস্বস্তিটা একটা দৃঢ় কর্তব্যবোধে পরিণত হল।—"তোরা খেতে থাক, আমি এখনি আসছি", বলে সে বেরিয়ে গেল।

দীন পৌঁছে দেখতে পেল চৌমাথায় একটা ট্রাক এবং একটা জীপ একে অন্যের গায়ে গায়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এবং ড্রাইভার দুজন মেইন রাস্তা কোন্‌টা তা নিয়ে তর্ক জুড়েছে। জীপের ড্রাইভারের চোখ লাল, আর ট্রাকের ড্রাইভারের চোখ দেখার উপায় নেই, কারণ সে ভাল করে চোখ খুলতেই পারছে না। অন্য দিন হলে এদের দুটোকে থানায় টেনে নিয়ে যেতে অন্য কোনো যুক্তিরই প্রায়োজন পড়ত না। আজ কিন্তু দীন কাজ বাড়াল না। গাড়ী দুটোর নাম্বার নিচ্ছে এমন একটা ভাব করে গাড়ি দুখানাকে সে দুদিকে পাঠিয়ে দিল।

লখিমীরা চা খাওয়া শেষ করে মাথা নীচু করে বসে রয়েছে। দীন আগের চেয়ারটাতে গিয়ে বসল। অবশিষ্ট চা মিষ্টি খেতে তার আর মন করল না। সরুমা জিজ্ঞেস করল, "কি, বাকিটুকু খাবি না।"

"না, যেতে দে"—বিরক্তি চেপে দীন বলল।

"তাহলে চল, বেরিয়ে যাই" সরুমা উঠে পড়ে।

"কেন? একটু সময় এখানে বসে যা। হেঁটে হেঁটে তোদের খারাপ লাগছে না?"

"লাগলেও এখানে বসতে ভাল লাগছে না। চল্।"

একটু অবাক হয়ে দীন ধীরে ধীরে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় এসে আবার সরুমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে বলতো?"

সরুমা লজ্জা পাচ্ছে, তবু চাপা ক্ষোভের সুরে বলল, "লোকগুলো বড় বাজে, গুণ্ডা ধরনের।" কথাগুলো বলে সে লখিমীর দিকে তাকাল, লখিমী লজ্জা আর ভয়ে মাথা নীচু করে রয়েছে।

দীনের মগজে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। ইচ্ছা হল দোকানটাতে ঢুকে সবগুলো লোককে লাঠিপেটা করে বাইরে বের করে আনে। কিন্তু সে এসব কিছুই করতে পারল না। বরঞ্চ তাড়াতাড়ি লোকগুলোর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়াই উচিত মনে করে সে লখিমীদের নিয়ে সরে গেল। তার ভিতরে অনবরত একটা যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে।

কিন্তু যন্ত্রণায় সে সত্যিই বোবা হয়ে গেল সন্ধ্যার সময়টাতে। সরুমারা তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা দোকান থেকে চুড়ি আর ক্লিপ কিনছিল। দীন হঠাৎ লক্ষ্য করল যে তেওয়ারী একটা সাইকেল চালিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে আসছে। সরুমার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে দীন তেওয়ারীর দিকে এগিয়ে গেল। তেওয়ারী প্রথমে খবর নিল কোথাও কোনো বড় ঘটনা ঘটেছে কিনা। তারপর সে খবর দিল যে কয়েকটা গাঁ এবং শহরের মধ্যেও কয়েকটা মারপিট হয়েছে। কাল যে গ্রামটাতে হাঙ্গামা হয়েছিল সেখান থেকে কিছু লোককে ধরে থানায় আনা হয়েছে। দুটো মটর এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। গ্রামে আরো দু'জন সিপাই পাঠাতে হয়েছে। ফলে পাহারা দেওয়ার ডিউটি শেষ হলে দীনকে থানার সামনে একটি ট্রাকে রেডি পার্টি হয়ে বসে থাকতে হবে। ইমার্জেন্সি ডিউটি।

দীন স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তেওয়ারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর থেকে একটা কান্না ভেসে আসছে। সরুমা, লখিমী আর সে তিনজন মিলে তেওয়ারীর পায়ে পড়ে কাকুতি মিনতি করলে কেমন হয়—একথাও তার মনে হল। কিন্তু এবারেও একটি কথাও সে বলতে পারল না। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তেওয়ারী দূরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লখিমী আর সরুমার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল, কিন্তু তাদের দুজনের কথা বলতেও তার ইচ্ছা হল না। তেওয়ারী লখিমী সরুমার দিকে তাকাতে তাকাতে আবার সাইকেল চালিয়ে ফিরে গেল। দীন বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সরুমার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে বলল, "কি, তুই যাবি না?"

অন্য দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমার ডিউটি শেষ হল না রে।"

সরুমা অস্থির হয়ে উঠল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। তীর্যক চোখ দিয়ে প্রত্যেকটা লোকই তাদের দেখছে। চায়ের দোকানের সেই বদমাস লোকগুলো এখনও আশে-

পাশে ঘুরঘুর করছে। তাদের গাঁয়ের রাস্তার দু'পাশে বাগানগুলোতে পূজার নবমীতে মানুষগুলো রাতে কিরকম উন্মত্ত হয়ে যায়, সে গল্প প্রত্যেক বছরই শুনে শুনে বাড়ির ভেতরেই তারা ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। এবারে এইরাতে একা একা কোনোমতেই তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না।

"তাহলে কি করবি? আর ডিউটি তো শেষ নাও হতে পারে।"—দীন অসহায় সুরে বলে।

সরুমা অবুঝ মেয়ের মতো বলে—"আমরা তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তোর ডিউটি যখন শেষ হবে, তখন আমাদের রেখে আসবি।"

—"সমস্ত রাতই যদি—"

দীনের কথা শেষ হওয়ার আগেই সরুমা প্রশ্ন করে—"তুই রাত্রে কোথায় থাকবি?"

—"থানায়।"

—"আমাদেরও থানায় বসিয়ে রাখবি। আমরা সারা রাতই ওখানে থাকব, তুই শুধু কাছে থাকবি।"—একটা অজানা ভয়ে সরুমার দেহ যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। লখিমীর চোখ ছলছল করছে। দুটো মোটাসোটা যুবক তাদের একেবারে পাশ দিয়ে চলে গেল। সরুমা লখিমীর আরো কাছে চলে এল।

দীনেরও ভয় হচ্ছিল। নবমীর সন্ধ্যা, বাধাহীন আনন্দ আর উত্তেজনা একেবারে মাতাল রূপ নিয়েছে। সরাবভাটির কাছে উন্মত্ত মানুষের ভীড়, মাংসের দোকানে চামড়া কখানা ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সরাবভাটির কাছে নূতন একখানা রাঁধা মাংসের দোকান বসেছে। দেবীর কাছে দুপুরবেলা যে পাঁঠাগুলো বলি দেওয়া হয়েছিল, তারই মাংস সম্ভবতঃ এখানে এসেছে। ভীড়ের ফাঁক দিয়ে লখিমী আর সরুমাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে দীনের বড় কষ্ট হচ্ছে। সোজা রাস্তায় সোজা চলা যেন লোকগুলো ভুলেই গেছে। দুখানা হাত নায়ের বৈঠা মারার ঢঙ-এ দুদিকে না চালিয়ে তারা যেন এগুতেই পারে না। লখিমী বার বার ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে, সরুমা প্রাণপনে দীনের কাছ ঘেঁসে রয়েছে, আর একটা বিক্ষোভের যন্ত্রণা নিরন্তর দীনকে কুরে কাচ্ছে।

ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দীন সেই রাস্তাটি থেকে সরে এল। বাসস্ট্যাণ্ডের এদিকে ওদিকে দীন গ্রামের একটা বিশ্বাসী লোক খুঁজল, পেল না। বাসে চেপে ফিরে যাওয়ার মতো প্রত্যেকটি লোকই যেন শহরের শেষ কর্তব্য হিসাবে একবার সরাবভাটিতে হাজিরা দিয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত একটা বাসের ড্রাইভারকে দীন অনুরোধ করল সে যেন তাদের বাড়িতে খবর দেয় যে সরুমা-রা আজ রাতে নাও ফিরতে পারে। যদি ফিরতে না পারে তবে তারা বড় দারোগার স্ত্রীর কাছে থাকবে।

ডাহা মিথ্যা কথা অবশ্য। বড় দারোগার স্ত্রীকে আজ পর্যন্ত দীন দেখেই নি।

একটা আধো অন্ধকার রাস্তা দিয়ে দীনরা এগুচ্ছিল। আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় কাতর তার মুখখানাকে আঁধারে লুকিয়ে ফেলার সুযোগ পেয়ে দীনের বড় ভাল লাগল। সরুমা হঠাৎ বলল, "তুই যেখানে থাকিস সেখানে একবার নিয়ে চল্ তো। সেখানে যে রাতে থাকা যাবে না তা অবশ্য জানি।"

থাকা যাবে। যদি বংশীরাম বুড়ার ডিউটি না থাকে, আর যদি বুড়া ছাড়া অন্য সবগুলোর রাতে ডিউটি থাকে, তবে ওরা দুজন রাতটা তাদের ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারবে। বংশীরাম বয়স্ক মানুষ, খুব ভাল লোক, সবাই তাকে বুড়ো বলে ডাকে। প্রতিটি যুবক সিপাইকে সে জামাই করবে বলে, আর তাদের কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে খায়।

দীন তার ঘরটির দিকে এদের নিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু একেবারে কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। ভেতর থেকে কাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সরুমাদের বাইরে রেখে দীন ভেতরে গেল। তাদের দলের সবচাইতে বদমাস সিপাই চারটি দুখানা খাট জুড়ে দিয়ে তার উপর মৌজ করে বসে রয়েছে। মধ্যে একটি খবরের কাগজের উপর ভাজা ছোলা কিছু ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে উৎকট গন্ধ।

দীন একটু কড়া সুরে বলল, "তোদের ডিউটি নেই?"

—দূর দূর, আজ পূজার শেষ বেলায় কে ডিউটি করে।"

যার যত শয়তানী বুদ্ধি, সে ততই ডিউটি থেকে রেহাই পায়, একথাটা দীন আগে থেকেই জানে। কিন্তু আজ এদের চারটিকে সে এগেবারেই সহ্য করতে পারছিল না। গলা আরো কড়া করে বলল, "আর তাই তোরা এখানে বসে এই সব করছিস্।"

প্যারেলাল কনেস্টেবল বলল, "আরে আমরা তো সে তুলনায় কিছুই করছি না। বড় দারোগার ঘরে গিয়ে দেখে এসো। আমি নিজে দোকান থেকে এনে ইয়া বড় বড় দুটো বিলাতী দিয়ে এসেছি।" সে দুহাতের আঙুল দিয়ে বোতলের মাপটা দেখাল।

দীন বেরিয়ে এল। সরুমা আর লখিমীকে দুহাতে আগলে ধরতে তার ইচ্ছা হল। মাথায় আগুন জ্বলছে। লাঠিটাকে জোরে আঁকড়ে ধরে সে হাঁটতে থাকে। লখিমীদের একটা হোটেলে সে ভাত খাওয়াল। তারপর সে থানার বারান্দায় ওদের নিয়ে এল।

বারান্দায় পাঁচটা পুরুষ আর তিনটা মেয়েমানুষ বসে রয়েছে। এরা চা বাগানের লোক, মদ খেয়ে মাতলামি করছিল। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একজন কাতর দৃষ্টিতে দীনের দিকে তাকাল।

দীন এবারে সোজাসুজি থানার সবচাইতে উপরওয়ালার সামনে গিয়ে হাজির

হল। নির্ভীক কণ্ঠে সে বলল, "স্যার, আমার দুটি বোন গাঁ থেকে পূজা দেখতে এসেছিল। রাতে বুঝি আমাকে ডিউটি করতে হবে, তাই তাদের দুজনকে আমি এখানেই রাখব।"

উপরওয়ালা কিছুই বললেন না, দীন স্যালুট একটা ঠুকে বেরিয়ে এল। পিছনের বারান্দায় বেঞ্চি একটায় সে লখিমী আর সরুমাকে বসাল। সে নিজে আশেপাশেই রইল।

থানার বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোয় লখিমী আর সরুমার চেহারা উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে।

থানার প্রত্যেকটি মানুষ একবার, দুবার, তিনবার কেউ কেউ বহুবার লখিমী আর সরুমাকে এসে দেখে গেল। দীনের মগজটা বিকৃত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের দৃষ্টি বীভৎস, কুৎসিত। দীনের ভেতরকার আসল পুলিশী মগজটা এবারে বেরিয়ে এলো। প্রত্যেকটি মানুষই বদমাস, প্রত্যেকটি মানুষই গুণ্ডা। কাকেও বিশ্বাস নেই। সমস্ত পৃথিবীই মাতাল।

সেও আবার পুলিশ!

কিন্তু—কিন্তু—। দীন বাঁ হাত দিয়ে তার কপালটা চেপে ধরল। সে কত অসহায়। সে যে একজন একান্ত অসহায় পুলিশ।

একসময় সে লখিমী-সরুমার কাছে কিছুক্ষণের জন্য বসে রইল। তার কাছে একবার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা হল। কিন্তু সে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না।

অল্প দূরে বাগিচার সেই লোকগুলো ঢুলছিল। মদের নেশা তাদের কখনই টুটে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পূজার রং-ও তাদের মন থেকে উবে গেছে। তাদের মধ্যেকার মেয়েগুলো খুবই আগ্রহ নিয়ে, বিস্ময় ভরে একবার লখিমীর দিকে আর একবার সরুমার দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের একজন একবার দীনকে কাতর সুরে বলল, "পুলিশবাবু, আমাদের যেতে দেওয়া হবে না?"

"—না, হবে না।"

—"রাতে আমাদের কোথায় রাখবেন?"

"লক্ আপে।"—দীন বারান্দার ওপাশের বিশেষ ধরনের তৈরী ঘর দুটো দেখিয়ে দিল।

অনুতপ্ত নিস্তেজ লোকগুলো আরো ম্রিয়মান হয় পড়ল।

একটু পরে বারন্দার ওমাথায় থানার সবচাইতে উপরওয়ালাকে দেখা গেল। দীন উঠে দাঁড়াল। উপরওয়ালা এক দৃষ্টিতে লখিমী আর সরুমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লাঠিটা জোর করে ধরে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকটা মানুষ বদমাস, প্রত্যেকটি মানুষ গুণ্ডা। কারো উপর বিশ্বাস নেই।

উপরওয়ালা এগিয়ে এলেন। দীনের কাছে এসে বললেন, "মেয়ে বলে কথা, কত সুবিধা অসুবিধার ব্যাপার আছে। ওদের এভাবে বারান্দায় বসিয়ে রাখা ঠিক নয়। কোথায় রাখবে কিছু ভেবে দেখেছো নাকি?"

"ভেবেছি স্যার।" দীন চাপা গলায় বলে।

"কি ভেবেছো? কোথায় রাখবে?" উপরওয়ালার কণ্ঠে আগ্রহ।

"—লক্ আপে রাখব, স্যার।" কথা বলে দীন অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ❐

**সৌরভকুমার চালিহা**

জন্ম দরং, শিক্ষা গুয়াহাটি, জীবিকা অধ্যাপনা। সৌরভ কুমার চালিহা চদ্মনাম, মূল নাম এবং বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক এই লেখক 'অশান্ত ইলেকট্রন' নামক একটি অভিনব গল্প লিখে পাঠক সমাজের চমকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গল্প সংকলন—'অশান্ত ইলেকট্রন' এবং 'দুপরীয়া'।

# বীণা কুটির

বিসদৃশ উঁচু উঁচু অট্টালিকার সারি। তার মধ্যে চেপ্টে রয়েছে একটা পুরানো আসাম টাইপ একমহলা বাড়ি। দরজা জানালা সব বন্ধ, বেখাপ্পাভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অট্টালিকাগুলোর মতো এদিকে সেদিকে বাঁকাচোরা লোহার কঠিন শিক্ দিয়ে দৃশ্যপট সব বন্ধ করে স্যানিটারি পাইপ-কার্নিশ বারান্দাকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসার বুদ্ধিও তার নেই, আবার নির্বোধের মতো একটা লনও বাঁচিয়ে রেখেছে পুরানো গেটখানার ভেতরে (আজকাল তার আর কি দরকার?)। অবশ্য কাঠ ভেঙ্গেছে, ঘুণে ধরেছে। গেটের লোহার কপাট মরচে পড়া, যেন ধাক্কা দিলেই ভেঙ্গে পড়বে। লনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছেঁড়া কাগজ, আবর্জনা, ভাঙ্গা ধামা, একটা পরিত্যক্ত সাইকেল, পুরানো কাঠের বাক্সের অবশিষ্ট ইত্যাদি। ঘাসও লালচে ভাব ধরেছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। ঘরটির দরজা জানালায়ও ঘুণ ধরেছে, এখানে ওখানে ছোট বড় ছিদ্র, কাঁচগুলোও ভাঙ্গাচোরা, দেওয়ালের আস্তরণ খসে পড়ছে, ইকড়ার বেড়া দেখা যায়। একটা বেড়া প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। সামনের বারান্দায় ধূলির আস্তরণ, তার রেলিঙে মাকড়শার জাল, ছাদে রেলিঙে পায়রা আর চড়াই অবাধ বিচরণ করছে। তাদের দৌরাত্ম্যে রেলিঙের, টিনের এক কালের লাল রং সাদা হয়ে গেছে। জীর্ণ বিবর্ণ টিনের উপর পুরানো দিনের টানা বিদ্যুতের সংযোগ (চারদিকের আর.সি.সি বিল্ডিং-এর সংযোগের মতো নয়)। আজকাল বিরল দর্শন কিছু বীণা ফুলের গাছ বারান্দার বাঁশের জাল বেয়ে উপরে উঠেছে, অনেক দূর থেকেও চোখে পড়ে তার পাতাগুলো। সেগুলোও অবশ্য পোকায় ধরা, একটাও ফুল নেই, পাতার উপর চাপ চাপা ধূলা।

কোনো নামের ফলক চোখে পড়ে না, কিন্তু বীণা কুটির ছাড়া তার আর কি নাম হতে পারে?

সাইকেলটার উপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাড়িটা নিরীক্ষণ করলাম। প্রায় দুই কাঠা বাড়ির চৌহদ্দি। এল্ প্যাটার্নের ঘর, ছেলে মেয়ে পাঁচ-ছ জনের বেশি হলে হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারবে না নিশ্চয়ই। কটা রুম হবে? তিনটা বড় আর দুটো ছোট—রান্নাঘর বা তার মতোই কিছু একটা। পেছন দিকেও সম্ভবতঃ খোলা জায়গা রয়েছে (আগের দিনের বাড়ি)। কিন্তু এখন চারদিকে উঁচু উঁচু

অট্টালিকা, বাড়িটাতে রোদ বাতাস ঢুকতে পায় না। বীণা কুটির আজকাল নিঃশ্বাস নিতে পারে কি?

কিছুদিন হলো চারদিক থেকে তার উপর চাপ এসে পড়ছে। অনতিদূরে 'হরলালকা ট্রাঙ্ক এণ্ড বাকেট্ ওয়ার্কস্' আর 'সিংহ কোম্পানী প্রাইভেট্ লিমিটেড্'-এর গুদাম সহ বাসভবন, অন্য দিকে একটা অর্ধসম্পূর্ণ বাঁশের স্ক্যাফল্ডিং পার হয়ে নানা ধরনের দোকান ঘর সম্বলিত আরেকটা বিল্ডিং যার নীচের তলার পূর্ণ মহলা জুড়ে "স্পীডওয়েল রোড ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশন'-এর বস্তা আর প্যাকিং বাক্সের স্তূপ, আর ওজন করা তুলার প্ল্যাটফর্ম, সামনে ডিজেল ট্রাক, রিক্সা আর ঠেলাগাড়ির হল্লা, চারদিকের ছাদে থেমে থেমে ট্যাঙ্কে জল তোলার পাম্পের ঘট্‌ঘট্ আওয়াজ—বীণা কুটির আজ নিঃশব্দে নীরবে কিছু ভাবার সুযোগ পায় কি?

তবুও থাকার জন্য খারাপ হবে না বোধ হয়। আমার মা, আর কলেজে পড়া ভাই, কাজের ছোট ছেলেটি পরে হোস্টেল থেকে বোনকেও নিয়ে আসতে পারব—যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। লনটা পরিষ্কার করে ফেললে রাতে (বস্তুতঃ দিনেও) বারন্দায় বসতে ভাল লাগবে। বীণা গাছের ডালগুলোতে হয়তো আবার ফুল ধরবে, পাতার ধূলা পরিষ্কার করে দিলে আবার সবুজ সজীব হবে—নয়তো গাছগুলো কেটে ফেলা যাবে। আমার অফিস থেকে সাইকেলে খুব দূর নয়, বেশ সুবিধা হবে। একঘেয়ে, ব্যক্তিত্বহীন, নিবিড়তাশূণ্য আর.সি.সি. বিল্ডিং-এর খুপরী কতকগুলোর চাইতে বীণা কুটির বহুগুণে কাম্য, ভাড়া লাগে, পঞ্চাশ টাকা বেশি লাগুক, চাই কি একশ টাকাই বেশি হোক—।

শীত শেষ হয়ে গরমের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিপাসা লেগেছে। সামনে এগিয়ে গেলাম। বীণা কুটিরের ডান দিকের বিল্ডি-টার দোকানগুলোর সাইন বোর্ডের দিকে একবার তাকালাম অলসভাবে (পি.কে.রায় ডাইস্ মেকার্স, অন্নপূর্ণা ব্রেড, খুবচান্দানী রেডিও ডিষ্ট্রিবিউটার্স), দু'মহলার একাংশের জানালায় কাটা পর্দা, দেয়ালে শাড়ি ঝুলছে, তার উপরের তলায় দড়িতে গামছা ঝুলছে, বাড়ির মালিক সম্ভবতঃ স্থানীয় লোক। নীচের দিকে আবার তাকালাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। হ্যা, এই যে। একেবারে রাস্তার পাশে যেখানে বিল্ডিং-টির গ্যারেজ হওয়ার কথা ছিল, তেমনি একটা খুপরি ঘরের সামনে লাল একটা গোল ফলকে লেখা, "কোকাকোলা খান।" মণিহারী দোকান।

সাইকেলটা বাইরে রেখে ভেতরে গেলাম। কাউণ্টারের পেছনে সজ্জিত দ্রব্য-সামগ্রীর ভীড়ের মধ্যে সাতাশ-আঠাশ বছরের একজন যুবক। চেককাটা হাফসার্ট পরণে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির আভাস। সে টিউব লাইটের নীচে মাথা নুইয়ে একটা বই পড়ছিল (দোকান নির্জন), আমার দিকে তাকিয়ে বইখানা রাখল (লক্ষ্য

করলাম একখানা ইকনমিক্‌সের নোট) আর লাল রঙের বরফ বাক্স থেকে একটা কোকাকোলা বের করে ছিপি খুলে একটা স্ট্র ঢুকিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল। একটা চুমুক দিলাম আর এমনি কথা জমাবার জন্য (ছেলেটির ভাবভঙ্গি আমার পছন্দ হয়েছে) জিজ্ঞেস করলাম যে তারা একটা রেফ্রিজারেটার রাখে না কেন? "রেফ্রিজারেটার?" "হ্যা, আপনাদের দোকানটির লোকেশন বেশ ভাল, গরম এসে পড়ল, অনেক বেশি কোকাকোলার দরকার হবে, বড় একটা ফ্রিজ থাকলে" ইত্যাদি ইত্যাদি। সে বলল দোকান তো তার নয়, সে সেলস্‌ম্যান মাত্র। এরিয়াটা বেশ বিজি সত্যি, দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই কোকাকোলার ডিমাণ্ড খুব বেড়ে যাবে, তারা ডিমাণ্ড মিট করতে পারবে না। কিন্তু বড় ফ্রিজ একটা আনার কথা মালিক এখনও ভাবেন নি, এই ছোট্ট ঘর, তারই ভাড়া দু'শো টাকা, তাদের মতো ছোট দোকানের রানিং এক্সপেন্স মিট করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

"যেতে দিন", আমি বললাম, তার পর নীরবে দু'ইঞ্চির মতো কোকোকোলা টেনে আবার শুরু করলাম যে আমি এখানে নূতন এসেছি। বন্ধু একজনের বাড়িতে থাকি, একটা বাড়ি খুঁজছি, তিনি কি বাইচান্স কোনো খবর দিতে পারেন—? সে বলল, "ভাড়াঘর? ভাড়াঘর এখানে রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে পাওয়া কঠিন। আচ্ছা আপনার ফেমিলি মেম্বার ক'জন? আই মিন" (সে বলল), তার পরিচিত একজন লোকের একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, কিন্তু এখানে নয়, একেবারে ফাটাশিল পার হয়ে—।

"হবে না।" আমি বলি, "এত দূর হলে হবে না— আচ্ছা—এই যে এখানে বীণা কুটির—"

"বীণা কুটির? বীণা কুটির?"

মৃদু হেসে বললাম,—"সেই যে বীণা ফুলের গাছ রয়েছে সামনে—আসাম টাইফ বাড়িটা—"

"অ—সেটা?" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকায়। —"জানেন, ঐ বাড়ি ভাড়া হওয়ার কোনো লক্ষণ কখনও দেখি নি। বহুদিন ধরেই এমনি খালি পড়ে রয়েছে। আমাদের দোকান স্টার্ট দেওয়ার তো প্রায় ন'মাস হল, সেই একই অবস্থায় দেখছি বাড়িটা, মানুষজন কখনও—"

"জানেন", যুবকটি লজ্জিত হেসে বলল, "আজ পর্যন্ত কথাটা খেয়ালই হয়নি, কাউকে জিজ্ঞেসই করা হয় নি। আমি নিজে পঞ্চশটা ধান্দা নিয়ে থাকি—"

কথায় কথায় জানা গেল যে সে নিজে এবার প্রাইভেটে বি.এ. দেবে ভাবছে, গত বছর অ্যাপিয়ার করতে পারে নি, সংসারটা তাকেই চালাতে হয়। অনেক ঝামেলা, দোকানে সময় পেলে নোটবইগুলোর দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়।

"অ", আমি বলি, "কার বাড়ি কি জানি?" তারপর ছুক শব্দ করে স্ট্র দিয়ে কোকাকোলার শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত টেনে নিয়ে শূন্য বোতলটি এগিয়ে দিয়ে বলি, "আরেকটা কোকাকোলা দেবেন।"

সে আরেকটা বোতল বের করে দিয়ে জানাল যে এই এরিয়ার কথা সে খুব ভাল জানে না। 'আমি থাকি কুমারপাড়ায়। অনেক দিন আগে একবার আমাদের স্কুলটা মিলিটারি নিয়ে নিয়েছিল, তখন এদিককার বিষ্ণুরাম হাইস্কুলে সকাল বেলা তাদের ক্লাস হত, তখন পায়ে হেঁটে এদিকে যাওয়া আসা করেছে। ছোটবেলার কথা, ভাল মনে নেই—তখন এই বিল্ডিংগুলো ছিল না,—আমাদের এ বিল্ডিং-এর জায়গায় বীণা কুটিরের মতোই আসাম টাইপ বাড়ি ছিল একটা, একজন পি ডব্লিউ-ডি-র ওভারশিয়ারের, নাম ব্রজেন করিলা—তিনিই এখন এই বিল্ডিংটি উঠিয়েছেন—এত বড়বড় বাড়ি যারা করে তাদের যে কত টাকা! সামনের লনটা পর্যন্ত রাখেনি, ন্যাচারেলি, কারণ এখন এটা সম্পূর্ণ কমার্শিয়েল এরিয়া হয়ে গেছে, প্রত্যেক স্কোয়ার ফুট মেপে যতখানি ইউটিলাইজ্ করা যায়, ততখানিই লাভ। কেউ আর এখন সখের জন্য লন রেখে নষ্ট করে না।'

'ও', বলে 'স্ট্র'টা ঠিক জায়গায় বসিয়ে ধৈর্য সহকারে আবার প্রশ্ন করি, "বলছিলাম বাড়িটা কার?"

"অ্যাঁ"—একটু হোঁচট খেয়ে ছেলেটি বলে, "আপনি যাকে বীণা কুটির বলছেন, ঠিক বলতে পারছি না, আমি নিজের কথাতেই বিজি হয়ে রয়েছি। স্কুলের দেরী হবে বা বাড়ি ফিরতে দেরি হবে বলে তখন আমরা এই বাড়িগুলো খুব তাড়াতাড়ি পাস করে যেতাম। তখন এগুলো সবই রেসিডেন্সিয়েল বাড়ি ছিল—কোনটা কার বাড়ি সে বয়সে আর কেইবা খবর নিত। এনি ওয়ে, বিষ্ণুরাম হাইস্কুলের মাস্টার একজনের বাড়ি বলে শুনেছিলাম—পরে হেডমাস্টারও হয়েছিলেন ভদ্রলোক" সে এবার ভ্রূ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল, "ভূধর গোস্বামী—ভূধর শর্মা গোছের কিছু একটা নাম। সংস্কৃতের মাস্টার, খুব বড় স্কলার ছিলেন বলে শুনেছি। কাশী থেকে কি যেন উপাধিও পেয়েছিলেন। গেটে একটা সাইন বোর্ড ছিল "সঞ্জীবন সমাজ"। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বোধহয়, প্রেসিডেন্ট না কি যেন ছিলেন। মাঝে মাঝে সভ্য ভব্য পক্ককেশ দাড়ি বুড়ো বুড়ো কিছু মানুষ বারন্দায় বসে কি যেন আলোচনা করতেন দেখেছি—আর্টিকল্ টার্টিকল্ লিখতেন মাঝে মাঝে—'বৈদিক যুগের ছাত্রদের কি হত'—এই জাতীয় কি সমস্ত বিষয় নিয়ে—"

"তিনি এখন কোথায় থাকেন?"

"এখন? কি জানেন—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর এ্যাকচুয়েলি বহুদিন আমি এই শহরে ছিলাম না—"। ছেলেটি একটু ইতঃস্তত করে থেমে গেল (তাই আমিও কিছু জিজ্ঞেস করলাম না)—"ইতিমধ্যে অনেক চেঞ্জ হল, ফিরে এসে দেখছি এখানে

আমাদের আগের মানুষগুলো উধাওই হয়ে গেছে—সব পাঞ্জাবী মাড়োয়ারী বিজনেস্‌মেনের ফ্যামিলি—অ, ভূধর গোস্বামী মারাই গেছেন বোধহয় এতদিনে।"

"অ। তাহলে এখন কে—"

"দু'টো ছেলে ছিল। আমাদের চাইতে বড়, তখনই আমাদের চাইতে অনেক বড়। এখন বোধহয় বাবার মতই হয়েছে, মানে লেখাপড়া নিয়ে থাকে—কোথাকার যেন প্রোফেসর। ধূতি চাদর পরা প্রোফেসর, সেই সময়ই কখনও কখনও কি যেন ভেবে ভেবে লনে পায়চারি করে বেড়াতেন। আরেক জন, ছোট ছেলে, ডিব্রুগড়ে ডাক্তারি পড়ত বুঝি—আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে মাঝে মাঝে এই সমস্ত খবর দিত, এই রাস্তার মোড়েই থাকত সে, এখন অবশ্য থাকে না। ছোটজনকে আমি দেখিনি, বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন নাকি—। এনি ওয়ে, কোথাকার মানুষ কোথায় যায়, কেই বা তার খবর রাখে—"

কোকাকোলায় আরেকটা চুমুক দিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে বলি, "আর মেয়ে?"

"না—মানে একদিন না দুদিন যেন একটি মেয়েকে দেখেছিলাম, বয়স্কা কোনো মহিলাকে দেখিনি। একদিন সিনেমার পোস্টার নিয়ে ব্যাণ্ডপার্টি একটা ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছিল (রিক্সা আসার পর সেই ঘোড়ার গাড়িগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মাইকের আগমনে ব্যাণ্ডপার্টিও আর বাজে না)। সেটা দেখার জন্য একটি মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, পাতলা সুন্দর চেহারা—আমি তাকিয়ে আছি দেখে ভেতরে চলে গেল। মাঝে মধ্যে লনের মধ্যে লাল রঙের ফোর্ড গাড়ি একটা থাকত, বেশ হেল্‌দি একজন ভদ্রলোক চালাতেন। মেয়েটির সঙ্গে ভাবভালবাসা ছিল বোধহয়, পরে বিয়েও হয়েছিল। মানে বাড়ির জামাই। আমাদের ক্লাস তো বিষ্ণুরাম স্কুলে মাত্র দু'মাসের মতো হয়েছিল, তারপর তো এদিকে আসাই প্রায় বন্ধ—না, নেই—অন্য মেয়ে কেউ থাকলে—" সে বিব্রত ভাবে একটা মৃদু হাসি মিশিয়ে বলল—"আমার চোখে ন্যাচারেলি পড়ত।" ছেলেটি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টায়—"এমন ভ্যালুয়েবল একটা প্রোপার্টি, এই এরিয়াতে। কেন যে এমন ভাবে রুইণ্ড্‌ হতে দিচ্ছে। কি জানি, সেই ফোর্ড গাড়িওয়ালা জামাই-ই সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছে কিনা—আই মিন—আফটার অল তার নিজের বাড়ি তো নয়। ঘরের মানুষের হাতে থাকলে এমন করে নষ্ট হতে দিত না কেউ। একটু ইমপ্রুভ করে নিলেই এই এরিয়াতে কমসে কম এইট হাণ্ড্রেড্‌—"

দোকানে মানুষ ঢুকছে। দুজন পাঞ্জাবী কোকাকোলা চাইছে, একটা ছেলের টুথপেস্ট দরকার, আর গ্ল্যাক্সোর এ মাসের চালানটা এসেছে কিনা, তা জানতে এক দম্পতি এসেছে। একটা কোণায় নীরবে দাঁড়িয়ে কোকাকোলা টানতে লাগলাম স্ট্র দিয়ে। আমার নাকে কোকাকোলার অনির্ণেয় স্বাদের ঝাঁজ। ছোট্ট দোকানের দ্রব্য-সম্ভাবের সঙ্গে উজ্জ্বল টিউব লাইটের আলোয় যেন এক ধরনের অন্তরঙ্গতা

অনুভব করলাম—একটা পরিচিত কাফের অভ্যস্ত আন্তরিকতার মতো একটা উষ্ণ আমেজ...বোতলের অবশিষ্ট তলানির দিকে তাকালাম—রঙিন তরল পদার্থের মধ্যে যেন প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে ছোট এল আকৃতির একটা বাড়ি—বীণা কুটির। অজস্র বীণা ফুল লনের উপর ঝরে পড়েছে, একটি মেয়ে কোমরে আঁচল গুঁজে বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে—একটা গাড়ির হর্ন যেন শুনলাম—একটা সাদা ফোর্ড গাড়ি গেটের ভেতরে ঢুকছে, মেয়েটি তাড়াতাড়ি আঁচল ঠিক করে নিল, চুলে একটু হাত বোলাল, চকিত দৃষ্টিতে গাড়িটার দিকে একবার তাকাল। গাড়ির পেছনের কাঁচ দিয়ে দেখা যায় দুটো বলিষ্ঠ হাত স্টিয়ারিং-এর উপর রাখা—প্রশস্ত কাঁধ—মেয়েটির মুখটি অস্পষ্ট—কিন্তু তরুণী বলে বোঝা যায়, তন্বী—অকস্মাৎ কিসের প্রত্যাশায় যেন সম্প্রতিভ...। দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল...নূতন দৃশ্য...বারান্দার দরজা খোলা, ভেতরে মেয়েটি একটি বড় গোল টেবিলের উপরে রাখা বইপত্রের ধূলা ঝাড়ছে, টেবিলের উপর শুকিয়ে যাওয়া গাঁদা ফুলের মালা পরানো একটা ফটো—সাদা গোঁফ—টাকের চারদিকে সাদা চুল, গোল ফ্রেমের চশমা, চোখের দৃষ্টি ঈষৎ ক্রুদ্ধ ঃ ⁄ভূধর গোস্বামী (কিংবা শর্মা—আর কিই বা হতে পারে), তার উপরে কাদের দেওয়া একটা মানপত্র বাঁধানো। পুরানো কাঠের চেয়ারে ধুতি চাদর পরা একজন মানুষ বসে রয়েছেন, ধীরে ধীরে কি যেন বলছেন। তাঁরও চোখে চশমা (কিন্তু চৌকোণা), একটা পা পাম্প্‌সু'র ভেতরে, আরেকটা বাইরে, আঙ্গুলগুলো নড়াচড়া করছে—সেইটুকুই মাত্র মানুষটির মধ্যেকার চাঞ্চল্যের চিহ্ন, তাঁর মুখ, তাঁর ভঙ্গি, তাঁর কথা, বাকি সবই প্রশান্ত। নিঃসন্দেহে সেই প্রোফেসর ছেলে, তাঁর নাম,—ভূধর গোস্বামীর ছেলের নাম কি হতে পারে? প্রেমধর? পরমেশ? ধরা যাক পরমেশ। পরমেশ গোস্বামী শুনতে খারাপ লাগে না। তিনি কি বলছেন? তাঁর সামনের শ্রোতা—আর্দির পাঞ্জাবী পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক—তাঁর কি পরিচয়? প্রোফেসর বলছেন (সত্যিই যেন আমি তাঁর গলা শুনতে পেলাম)—"তাই বলছি গণেশদা, আপনি খারাপ পাবেন না। এই বাড়িটার সঙ্গে একটা স্কলারলি এ্যাট্‌মোস্ফিয়ার জড়িত। এখানে যদি আমি লোহালক্কর সিমেন্ট বালি টাকা আনা পয়সার হিসাব মেলানোর জন্য ছেড়ে দিই, তবে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না—বাবা আমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আপনি আমাকে ছোট থেকে দেখে আসছেন, এখন এই পৈতৃক বাড়িটা আমার হাতে পড়েছে, আপনি ঘরটি ভাড়া চাইছেন, আপনার কণ্ট্র্যাক্টের কাজ দিনকে দিন বাড়ছে, আপনাকে বাড়িটা দিতে পারলে আমি খুশি হতাম কি না, আপনিই বলুন? কিন্তু বাবার লাইফ্ লঙ ওয়ার্কের স্মৃতি রক্ষা করাটাও আমার কর্তব্য। এটা ফিলিয়েল ডিউটি, আমি নিজে এখানে বাস না করলেও এই বাড়িটার পরিবেশ আমাকে বজায় রাখতেই হবে। পারলে বাবার নামে এই বাড়িতে একটা লাইব্রেরী টাইব্রেরী কিছু একটা করে দিতে হবে। আপনিও

তো বাবাকে সব সময়ই ভক্তি শ্রদ্ধা করে এসেছেন। আপনিও তো দেখেছেন এই টেবিলে (তিনি টেবিলের দিকে হাত দেখালেন, সিনেমার ক্লোজ আপ ছবির মতো টেবিলটা স্বচ্ছ পর্দার সামনে চলে এল ঃ অসংখ্য বই পত্রিকা আলোচনী, পুরানো পুঁথি, একটা রঙিন ফিতায় বাঁধা ফাইলের উপর রঙিন কালি দিয়ে লেখা "বৈদিক যুগের (অস্পষ্ট) আধ্যাত্মিক দিক", দোয়াত কলম, আঠার শিশি, ব্লটার আর পানদান, চশমার খাপ)...বাবা শেষ বয়স পর্যন্ত দিন রাত মাথা গুঁজে পড়াশোনা করতেন, খাওয়া পরার কথা মনে থাকত না, আপনি কাছে এসে বসেছেন, গলা খাঁকারি না দেওয়া পর্যন্ত বাবা বুঝতেনই না যে কেউ এসেছে—এই যে সাধনা, এটা তো কোনো আর্থিক লাভ, মান যশের কথা ভেবে করতেন না—এটা হল জ্ঞানের সন্ধান—একটা Disinterested quest for knowledge, এই যে ঘরময় দেখছেন বাবার অসংখ্য অসমাপ্ত কাজ, আধলেখা প্রবন্ধ আলোচনা—সেগুলো পারলে এখনই আমার প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত—এই পরিবেশকে কি আমি কমর্শিয়েলিজমের খপ্পরে ফেলে নষ্ট করে দিতে পারি। আপনিই বলুন গণেশদা? থাকার জন্য বাড়িটা আমার লাগে না সত্যি, ঘরটা এখন আমার সম্পত্তি, আমি এ থেকে দু'পয়সা উপার্জন করে নিতে পারি সত্যি, কিন্তু তাই বলে কি বাবার এত দিনের অধ্যবসায়ের সমস্ত চিহ্ন...।

ঠক্।

তাঁর কথা বন্ধ হল আর আমি বুঝতে পেলাম পাঞ্জাবী দু'জন তাদের কথাবার্তা শেষ করে কোকাকোলার বোতল দুটো ঠক্ করে নামিয়ে রাখল। আমার বোতলের মধ্যে থেকেও ছবিগুলো মিলিয়ে গেল, আমিও চুপ্ করে শেষ বিন্দু টেনে নিয়ে বোতলটা কাউণ্টারে নামিয়ে রাখলাম। একটি নোট এগিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম যে দোকানটা রাতে কত সময় পর্যন্ত খোলা থাকে। ঘরটি ভাড়া দেবে কিনা সে কি একবার খবর করবে? কাল পরশুর মধ্যে আমি আবার আসব। কাল সে থাকবে না? তাহলে পরশু? হবে, পরশু হলেও হবে...।

বাইরে এসে সাইকেলের তালা খুললাম। স্পীডওয়েল ট্রান্সপোর্টের সামনে তীব্র আলো জ্বালিয়ে লরি থেকে মাল উঠানো নামানো হচ্ছে—কে যেন উচ্চঃস্বরে নির্দেশ দিচ্ছে আর সব কিছু ছাপিয়ে একটা ট্রাক প্রচুর কালো ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে। সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলাম। বীণা কুটির অন্ধকার। শুধুমাত্র পাশের দালানের আলো পড়ে বাঁ পাশের জানালাগুলোর উপর আলো আঁধারের বিচিত্র নক্সা তৈরী হয়েছে। দালানটির আলোকিত জানালা দিয়ে রেডিয়োর শব্দ ভেসে আসছে, কোন একটা অফিসে টাইপ রাইটারের খট্‌খট্ শব্দ, নিশ্চয়ই ঘরে ঘরে কথাবার্তা, খাওয়া দাওয়া চলছে। বাণিজ্য আর ঘর সংসার, তৃপ্তি, আনন্দ, ক্ষোভ, বেদনা, কামনা-লালসা, প্রেম, বিরহ—বিভিন্ন টুকরো টুকরো

নাটকের—সংলাপ যে ধরনের নাটিকার অভিনয় বীণা কুটিরের মঞ্চে এখন আর হয় না। তার প্রাণশক্তি আর বাকশক্তি সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

একেবারেই কি শেষ হয়ে গেছে?...রাতে বীণা কুটিরের কথা ভেবে ভেবে ঘুমাতে গেলাম আর সকালে উঠে চোখ মুছতে মুছতে আশ্চর্য হয়ে মনে পড়ল যে রাতে একবারও বীণা কুটিরের স্বপ্ন দেখিনি—বোধহয় কোনো স্বপ্নই দেখি নি। খুব ক্লান্ত ছিলাম বলেই হয়তো...।

দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বীণা কুটিরের কথা হয়তো অস্পষ্ট ভাবে কখনও কখনও মনে হয়েছে, আবার ভুলে গেছি। বিকালে আবার সাইকেল নিয়ে ভাড়া-বাড়ির সন্ধানে গেলাম, কিন্তু কোনো সুবিধা হল না। সাইকেলে উঠলাম—কি একটা যেন মনে করার চেষ্টা করে অন্যমনস্ক ভাবে পেডেল চালাতে লাগলাম, অকস্মাৎ দেখি বীণা কুটির পার হয়ে যাচ্ছি—সেই একই জীর্ণ পরিত্যক্ত রূপ, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোছায়ায় শীর্ণ বীণা ফুলের ঝোপ মৃদু মৃদু কাঁপছে। বোধহয় কোনোদিক থেকে হাওয়া আসছে। সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালাম, কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করলাম, কানে এল বিভিন্ন বাণিজ্য বিপণির সংমিশ্রিত অনির্ণেয় রূপ আর কোথায় যেন একটা টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করছে, আর বীণা কুটিরের চালে পুরানো কাঠ একটা বোধহয় টিনের সংস্পর্শে এসে খট্‌খট্ শব্দ করছে, পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে...। কোকাকোলার দোকানটিতে ছেলেটি নেই, তার জায়গায় হাওয়াই শার্ট পরা পুষ্ট মুখ একজন আধবয়সী লোক বসে রয়েছেন। সাইকেলটি বাইরে রেখে ঢুকে পড়লাম। কাউণ্টারে গিয়ে একটা কোকাকোলা চাইলাম।

দোকানে আজ বেশ ভীড়, জোর বিক্রী চলছে। নূতন লোকটির মুখভঙ্গি বড় সুবিধাজনক বলে মনে হল না, তাই তার সঙ্গে কথা পাতানোর কোনো চেষ্টা করলাম না। এক কোণে দাঁড়িয়ে কোকাকোলা টানছি। আঃ! নাকে পরিচিত ঝাঁঝটা এসে লাগল। কাউণ্টারের উপরে বোতলটি বাঁকা করে ধরে স্ট্রর উপর ডানহাতের তর্জনীটি রেখে ভেতরের তরল পদার্থের দিকে তাকালাম।...তরল পদার্থটুকু কাঁপছে আর তার মধ্যে অন্য একটা ছবি ফুটে উঠেছে...জোর বাতাস বইছে, বীণা গাছের পাতাগুলো কাঁপছে, রাত হয়েছে, বীণা কুটিরের বারান্দাটা অস্পষ্ট...মোটরের হেড লাইটের আলোয় বীণা গাছের ঝোপ আলোকিত হল, দু'বার জোর শব্দ করে ফোর্ড গাড়িটির ইঞ্জিন বন্ধ হল, লাইট নিভল, গাড়ির দরজা খোলার শব্দ, স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে এল সেদিনের সেই প্রশস্ত বক্ষ যুবক, তার সুগঠিত মস্তক (নিশ্চয়ই গোঁফ রয়েছে), গ্রীবা আর প্রশস্ত কাঁধ পেছন থেকেও উপলব্ধি করা যায়। ঘরের নূতন জামাই ভবেশ? ভবানন্দ। বেশ, ভবানন্দই। সে গাড়ির বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিল আর তার হাত ধরে নেমে এল সেই মেয়েটি ; বীণা (আর কি নাম

হতে পারে?)। অস্পষ্ট আলোয়ও বোঝা যায় তার মুখখানা ঝলমল করছে, চোখে কি যেন একটা মদির আবেশ, তার দেহভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে একটা খচমচ শব্দ, হয়তো বা মুগার নূতন মেখলা চাদরের, নতুবা বেনারসীর, আর আঁধার ভেদ করেও দেখা যাচ্ছে গহনার ঝিলিক—ভবানন্দের হাত এড়িয়ে সিড়ি ডিঙিয়ে সে বারান্দায় উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভবানন্দের হাত দুখানা পেছন থেকে তার সরু কোমরটি সাপটে ধরল—

"ইস্ কি যে কর—বাবা বেরিয়ে এলে কি ভাববেন—"

"হ্যাঁ, বাবা আসছেন রাত দুপুরে আমাকে পাহারা দিতে..." চাপা হেসে ভবানন্দ বীণাকে ধরে বারান্দায় উঠল।

"গাড়ির যা শব্দ করে ঢুকেছ—ধেৎ, এখানে নয়—আ,ছাড় না,—ইস্। দাদা একজন রয়েছে না, যদি বেরিয়ে আসে—।"

ভবানন্দ অস্ফুট কণ্ঠে বলে—"বড়দা এত বেরসিক নন যে নূতন বরকনে বেড়িয়ে রাতে বাড়ি ফিরলে তিনি অভদ্রের মতো...দেখো।"

বারান্দার বেড়ার আলোআঁধারি ছায়া পড়ে তার সঙ্গে মিশে গেছে বীণা আর ভবানন্দের ছায়া। কতক্ষণ যে তার বাহুবন্ধনে বাঁধা ছিল বলতে পারি না, তাদের চুলের উপর মাতাল বাতাসের দোল লাগছে, বাতাসে কোন অজানা ফুলের গন্ধ, আকাশে রাশি রাশি তারা, হয় তো ফাল্গুণ মাস—

অনেকক্ষণের নীরবতার পর ভবানন্দ বলল, "বীণা, আগে যখন বিকালে তোমার সঙ্গে বারান্দায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম, বড় ইচ্ছা হত এই বীণা ঝোপের তলায় তোমাকে জড়িয়ে ধরতে, আদর করতে, বড় ইচ্ছা হত, টের পেয়েছ কখনও—"

বীণা কোনো উত্তর দিল না, অন্ধকারে ভবানন্দের বুকে মুখটা আরো জোরে চেপে ধরল।—"আর আজ—দাদা যখন কলেজে যাওয়ার সময় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেই আগের মতোই তোমাকে নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। তুমি টের পেয়েছিলে?"

বীণা এবারও কোনো উত্তর দিল না।

"বীণা?"

অন্ধকারে ভবানন্দের বুকের মধ্যে বীণা অস্পষ্ট হাসল ঃ "তুমি কি তাও বুঝতে পার না—আজ যখন বারান্দায় তোমার হতভম্ব মূর্তিটা দেখছিলাম, তখন আমার বেজায় হাসি পাচ্ছিল—চার বছর লাজ মানের মাথা খেয়ে এখানে আমাকে নিয়ে কত দাঁড়ালে, আর আজ সব লজ্জা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, কাছেই এলে না একবার, বাবার সঙ্গে কথাই শেষ হল না—"

ভবানন্দ লজ্জা পেল, বলল—'চল, ভেতরে যাই এখন।"

"আঃ", বীণা বলল, সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, "ইস্, ভেতরে ঢুকতে

আমার ইচ্ছাই করছে না, এতদিন পর আমাদের এই নিজস্ব কোণাটায় দাঁড়াতে পেরে কি ভাল যে লাগছে, আর কবে যে তোমাকে এখানে এমন করে পাব...।" বীণার কণ্ঠ বিষণ্ণ হয়ে এল ; "আর দুদিন পর আমিও যাব, আর তুমিও এমন একটা চাকুরীতে ঢুকলে যে সব সময়ই হিল্লী-দিল্লী করে বেড়াতে হবে—আজ আইজল, কাল পাশিঘাট। বাবা আজ তোমাকে যেভাবে কথাগুলো বলছিলেন, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল ঃ 'আমার আর কদিন, আমি মরলে এ বাড়িটা তোমাদেরই দেখতে হবে, তোমাদের নামেই বাড়িটা লিখে দেবো'— কিন্তু বাবা কেন এমন কথা বললেন?"

অল্প নীরব থেকে ভবানন্দ বলে—"বড়দা তো এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা একেবারে ঠিকই করে ফেলেছেন, বাড়িঘর দেখার মানুষ তিনি নন, আর ছোড়দা তো বাড়ি থেকে বেরিয়েই গেছে, তাই বোধহয় বাবা ভাবছেন..."

বীণা বলল ঃ "বাবা যে বলেছেন, 'তোমরা নিজেরা থাকো, ভাড়া দাও, যা করার করো।'—এত খারাপ লাগে, আমি কত দূরে দূরে থাকব, আমরা কেউ না থাকলে বাড়িটার অবস্থা কি হবে, কোথাকার কোন মানুষ এসে এখানে থাকবে, সবই অন্য রকম হয়ে যাবে, এই বীণা গাছের কুঞ্জই বা এমনি কতদিন থাকবে...।

ভবানন্দের হাত দু'খানি ধীরে ধীরে বীণাকে বেষ্টন করে চেপে ধরল, বীণার গালে গাল রেখে ভবানন্দ আস্তে বলল, "বীণা, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, তুমি এখানে দাঁড়িয়েছিলে, রাস্তায় ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, একটা ঘোড়ার গাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে—আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, এখনও ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাই—এই বারান্দা, এই বীণা গাছ আমার জীবনের একটা অংশ—এই ঘরের প্রতিটি চেয়ার টেবিল ফটো কাপ প্লেট প্রতি জোড়া সব তোমার হাতের স্পর্শে নিজস্ব হয়ে গেছে, প্রতিটিতে তোমার যত্নের ছাপ রয়েছে—ঠিক আছে, এই বাড়ি যদি কোনো দিন আমাকেই দেখতে হয়, এর কোনো কিছুই নষ্ট হতে দেব না, কোনো অচেনা মানুষকে কোনোদিনই এই বারান্দার কোনো কিছু পাল্টাতে দেব না, আমি যতখানি পারি চেষ্টা করে যাব...।"

...এই আলো আঁধার, পায়রার ডানা ঝাপটানির এই সরসর শব্দ, মদির বাতাসে ভেসে আসা ফুলের রেণু, আকাশের এই রাশি রাশি তারা—আমি মনে মনে ভাবলাম। হঠাৎ দোকানের গোলমাল থেমে গেল, আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, দোকান খালি হয়ে গেছে, দোকানী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কোকাকোলার বোতলে কোনো ছবি নেই। বাকীটুকু একটানে শেষ করে বোতলটি নামিয়ে রাখলাম, নিজের মনে বিড়বিড় করে বললাম, "বাড়ি একটা খালি পড়ে আছে, তবু ভাড়া দেওয়ার কথা ভাবে না, এমন মানুষ এখনও আছে। বীণা আছে, ভবানন্দ আছে—"

"কি হয়েছে?" দোকানী একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, "ফিফটি ফাইভ পয়সা।"

উৎফুল্লচিত্তে সাইকেল চেপে ঘরে ফিরলাম। রাতে খুব ভাল ঘুম হল! কি শান্তি...বাণিজ্য আর অর্থাগমের চিন্তায় যখন প্রতি বর্গফুট জমি আর প্রতি ঘনফুট বায়ু দালানী কৃত। ডিজেলের ধোঁয়া, কলকজার ঘরঘর, লাভ লোকসানের চক্রজাল আর ব্যয় সংকুচিত ফ্লুরোসেণ্ট ঔজ্বল্যের তলায় ধূলা কদর্যতা আর দুর্গন্ধ আবর্জনায় বায়ুমণ্ডল দূষিত। সেই অবস্থায় পৃথিবীতে আজও একজন পরমেশ, এক জোড়া ভবানন্দ-বীণা—রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিট যাকে প্রভাবিত করে না, রুচি বিবর্জিত আকাশচুম্বী ঔদ্ধত্য যায় সম্বল নয়, যার ভাড়াটিয়া লাগে না, মাসে তিনশ টাকা অতিরিক্ত আয়ের যার প্রয়োজন নেই—বা হয়তো প্রয়োজন রয়েছে (কার নেই?), কিন্তু যারা এখনও উপলব্ধি করে যে তার চাইতেও বরণীয় ব্যাপার হচ্ছে একটা শ্রদ্ধেয় স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, তার চাইতে বড় কথা আত্মার নিঃশ্বাসের জন্য একটুকরা খোলা আকাশ, প্রাণের স্পন্দনের জন্য একটু মুক্ত বাতাস, চোখের প্রাপ্তির জন্য একটু সবুজ ঘাসের লন্, এক ঝাক বীণা গাছ যেখানে মন মুকুলিত হবে, নিস্তব্ধ রাত আর অলস মধ্যাহ্নে—একটা বারান্দা—একটা পুরানো গুঞ্জন ধ্বনি—একটা বিলীয়মান প্রিয় পরিবেশ—

পরদিন অফিসে টিফিনের সময়ে একজন যখন প্রস্তাব দিল যে আজ চায়ের বদলে কোকাকোলা খাওয়া যাক, আমি তখন রাজী হলাম না। কোকাকোলার আসল ঝাঁঝ আমি পাই বিকালে, সেই মনোহারি দোকানটিতে... সেদিন বাড়ির খোঁজে আর গেলাম না, যদিও অফিসের সুপারইনটেনডেণ্ট খবর একটা দিয়েছিলেন। বিকালের পড়ন্ত আলোয় বীণা কুটিরের সামনে সাইকেল থেকে নামলাম, চোখে পড়ল বারান্দার খুঁটিতে একটা চিঠির বাক্স (কেন যে আগে চোখের পড়েনি), আর বারন্দার উপর একটা নোংরা কাপড়ের পুঁটলি পড়ে রয়েছে। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, অনুমান করলাম কোনো ভিখারী জাতীয় মানুষ বোধহয় সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল আর বেওয়ারিশ বাড়ি দেখে হয়তো এখন থেকে সেখানেই বসবাস শুরু করে দেবে।...সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে দোকানঘরের সামনে দাঁড় করালাম—আচ্ছা, ছেলেটি আজ এসেছে (আজ দাড়ি কামিয়েছে কিন্তু পরনে সেই শার্টটাই), কিন্তু আজ সে বড় ব্যস্ত। এই গরমেই স্যুটটাই পরা একজন মাঝবয়রী ভদ্রলোক কাউণ্টারের উপর একটা নোটবই-এ পেন্সিল দিয়ে কি যেন লেখালেখি করছেন, বুঝলাম কোনো একটা কোম্পানীর রিপ্রেজেণ্টেটিভ। ছেলেটি আমার দিকে মুখ তুলে একটু হাসল, আর দাঁড়ানো ভদ্রলোককে 'এক মিনিট' বলে আমার দিকে এগিয়ে এল আর মাথা নাড়ল—"না, হবে না"।

তা অবশ্য আমিও জানি। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে হাসলাম। বাড়িটা ভাড়া হবে না বলেই আমি আশা করেছিলাম।

"কোকাকোলা দেব?"

"দিন।"

স্ট্র একটা প্যাকেট থেকে বের করে ছেলেটি বলল, "আমার প্রোপ্রাইটারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি লোক্যাল লোক, এই পাড়ারই, বাড়িটার পুরো হিস্ট্রিই জানেন। আমি আপনাকে সেদিন ঠিকই বলেছিলাম, বড় ছেলে প্রোফেসর, খুব ক্যাপেব্‌ল্ মানুষ, ছোট ছেলে ডাক্তার, বউ পাঞ্জাবী না কি যেন—শেষ দিকে বাড়ির সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় একটা—মানে বাবা তাকে বাড়ি থেকে এক রকম বের করে..." কোম্পানী প্রতিনিধিটির দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলল, "আচ্ছা, আপনি কোকাকোলাটা খেয়ে নিন, আমি এঁকে ওয়েট করিয়ে রেখেছি...।"

ছেলেটি তার কাছে গেল। স্ট্র দিয়ে একটা চুমুক দিয়ে বোতলটা কাউণ্টারে বাঁকা করে দাঁড় করিয়ে তার ভেতরের তরল পদার্থটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বীণা কুটিরের পেছনের উঠানে বিকালের পড়ন্ত রোদ পড়েছে, একটা পুরানো বেঞ্চ শূন্য রয়েছে, তুলসীতলায় একটা শিখাহীন প্রদীপ, একটা পুরানো পেঁপে গাছ, অস্থির ভাবে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের দীর্ঘকায় একজন মানুষ পায়াচারি করছেন, তাঁর মাথাটা মাঝে মাঝে উঠানের কাপড় টাঙ্গানো দড়িতে ঠেকছে, তিনি বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে দড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন আর চোখ কুঁচকে ক্রুদ্ধভাবে সিগারেট টানছেন। তাঁর টুইড কোটের পকেট থেকে স্টেথোস্কোপের একটি অংশ উঁকি দিচ্ছে। বেঞ্চটিতে বসে মাথায় বড় খোঁপা বাঁধা চুড়িদার কুর্তা পরা একটি মেয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তার মুখচ্ছবি অস্পষ্ট কিন্তু রক্তাভ, হাল্কা দোপাট্টার নীচে তার সুডৌল গোলাপি বাহু দেখা যাচ্ছে... হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করে একটা ক্রুদ্ধ টান মেরে সিগারেটটা ফেলে ডাক্তার বেঞ্চটির কাছে এলেন আর তীক্ষ্ণ মনোযোগ নিয়ে নীচের দিকে তাকালেন। ডাক্তারের সুদৃঢ় ওষ্ঠ আর চৌকোণা বেপরোয়া চিবুকের নীচে মেয়েটির যৌবনোচ্ছল গোলাকার মুখের উৎকণ্ঠিত লাবণ্য, বিস্ফারিত দুটি আয়ত চক্ষু (ঠিক যেমনি একটি ক্লোজআপ শট্ কদিন আগে একটি হিন্দী ছবিতে দেখেছি), ডাক্তার কথা বলছেন (তাঁর কণ্ঠস্বর কোম্পানীর প্রতিনিধির কণ্ঠস্বরের মতোই), তিনি বলছেন ঃ "আমি বাবার ত্যজ্যপুত্র, রেহানা, আমি ত্যজ্যপুত্র হয়েই থাকব। আমি তো দাদার মতো নই, আমার সব ব্যাপারে ডিসিশন সব সময় আমি নিজেই নিয়েছি, কারো কথা গ্রাহ্য করিনি, বাবা বললেও আমার অপছন্দের কাজ আমাকে দিয়ে করানো যায় নি। বাবার অমতেই আমি মেডিকেল পড়তে গিয়েছি, শুধু মাত্র বীণাই আমাকে যেটুকু সমর্থন করেছিল। বাবা পয়সা কড়ি দিতে চান নি, তবু আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে এ্যাডমিশন নিয়েছি, আমাকে এ্যাডামেণ্ট দেখে বাবা শেষ পর্যন্ত আমার ডিসিশন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর আমার জীবনে তুমি এলে, তোমার সঙ্গে দিনে দিনে আমি ইনভল্‌বড্ হয়ে পড়লাম, কথাবার্তা কত শুনলাম, কিন্তু সব আমি উড়িয়ে দিলাম।

তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ড, তোমার আগেকার হিস্ট্রি, সব আমি ইগ্‌নোর করলাম, তোমাকে বিয়ে করব বলে ঘোষণা করলাম। সবার কি আপত্তি, কি কথা কাটাকাটি, কি পর্যন্ত রাগারাগি, তুমি তো সব জান। বাবা বলে দিলেন যে তাঁর অমতে যদি এখানেই বিয়ে করি, তবে আমাকে একটা কানাকড়ি দিয়েও সাহায্য করবেন না। আমিও বলে ফেললাম, ঠিক আছে, আমি আর কখনও আপনার থেকে একটা কানাকড়িও নেব না।—তারপর কত দুর্দিন গেছে, কত কষ্ট করে ধার কর্জ করে বৃত্তিটৃত্তির ব্যবস্থা করে মেডিকেল পড়া শেষ করলাম, তুমি তো সব জান। আত্মীয়স্বজন সব আমাকে ছেড়েছে (শুধু বীণাই দূর থেকে আমাকে সাপোর্ট দিয়ে গেছে)— আর এখন সব সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পর বাবা মরার সময়ে আমাকে এ কি সমস্যায় ফেলে গেলেন—কেন এমন একটা উইল করলেন—কেন মরার সময়ে এই বাড়িটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন! আমি এই সম্পত্তি নিয়ে কি করব, এ বাড়ি থেকে তো আমি বেরিয়ে গেছি, (ডাক্তার মেয়েটির কাঁধে একটি হাত রাখলেন, ভঙ্গিটি ছবি থেকে তার মুখের অর্ধেকটা কেটে দিল)— রেহানা, রেহানা তোমার জন্যই আমি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, এই উঠানের কিছু আজ আমার পরিচিত মনে হচ্ছে না—তুমি অন্ততঃ এই বাড়িতে আমাকে বসবাস করতে বলবে না, এবাড়ি ভাড়া দিয়ে তা থেকে টাকা উপার্জন করতে বলবে না—আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যে বলেছি এখান থেকে একটা কানাকড়িও আমি নেব না—ঠিক আছে, ঘরটা আমি মেণ্টেইন করব। যত ট্যাক্স লাগে দেব, আমার নিজের পকেটের পয়সা যাবে, যদি তাই ভাগ্যে থেকে থাকে হবে—সে কথা বলল—"কালকেই আমি আমাদের ক্যালকাটা অফিসে মিষ্টার মেহতাকে ট্রাঙ্ককল করছি, সোমবার নাগাদ আপনি পুরো কনসাইনম্যাণ্টটা পেয়ে যাবেন, আমি খবর দেওয়ার—রেষ্ট এশিওর্ড, আমি তাহলে—নমস্কার—"

শেষের কথাগুলো কোম্পানীর প্রতিনিধি ভদ্রলোকের। বোতলের রাঙা তরল পদার্থের উপর টিউব বাতির আলো ঝিলিক দিচ্ছে, ছবি অন্তর্হিত। প্রতিনিধিটি বেরিয়ে গেলেন।

আমি মনে মনে বললাম যে সম্পত্তির চাইতে প্রতিজ্ঞাকে বেশি মূল্য দেয় এমন লোক কি এখনও পৃথিবীতে রয়েছে। টাকাই কি সব?

ছেলেটি এগিয়ে এল। (যাই হোক, কথা হচ্ছে, ভাড়া হবে না। অন্তত আরো বহুদিন পর্যন্ত। বাড়িটার মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা চলছে, বাড়িটা তাই এমনি পড়ে রয়েছে। কে পাবে কেস শেষ না হলে বোঝা যাবে না। বহুদিন লাগবে, আপনি এই বাড়ির আশা ছাড়ুন। বড় ভাই—প্রোফেসর—আজকাল নোট লিখে অনেক টাকা করেছেন—আজকাল ধামধূম টেক্সট্ বুক আর নোট লেখেন— তিনি বাড়িটাতে নিজের প্রেস করতে চান, নিজে পাব্লিশ করলে লাভ বেশি। ছোট

ছেলে, মানে ডাক্তারের একটা আর.সি.সি. তুলে ভাড়াটাড়া দেওয়ার ইচ্ছা, নিজের চেম্বার করবে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। এনিওয়ে আপনার যদি ইমিডিয়েটলি লাগে, আমি লাচিত নগরে একটা বাড়ির খবর পেয়েছি—")

চু-ক্ শব্দ করে কোকাকোলার অবশিষ্টটুকু টেনে নিলাম, বোতলটা ঠক্ করে কাউণ্টারে নামিয়ে রাখলাম, আর বোতলের ভেতরের শূন্য গহ্বরটার দিকে অনেকক্ষণ নিরুত্তর হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ❐

# রাঙা ফুল আর ধবল পাখীর গল্প

**মেদিনী চৌধুরী**

জন্ম কামরূপের গোরেশ্বরে। আসাম সিভিল সার্ভিসের সভ্য। গল্পগুলি পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে।

আজ সে ইচ্ছা করেই অনেক দেরি করল। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ ম্লান হয়ে পড়েছে। শেষ রাতের হিমহিম অবসাদও পূর্ব আকাশের রঙ ঘোলা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি কমে গেছে।

পথে বলদ দুটো যেন তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই গতিবেগ কমিয়ে দিল। মাঝে মাঝে বলদজোড়া কেন যে এমন গড়িমসি করে।

অন্যদিন বিড়িটা ধরিয়ে লাঙ্গলটাতে হাত দিলে তার মনে কেমন যেন একটা উৎসাহ জাগে। তার জমিটা পাহাড়ের আড়ালে পড়েনি, তাই সূর্য উঠলেই আলো সেখানে আছড়ে পড়ে। বলদজোড়াও গ্রামের অন্য বলদগুলোর চাইতে সমর্থ, তার জমির ফসল দেখলে গাঁয়ের সবার চোখ টাটায়।

আর তার নিজেরই ভাল লাগছে না, কিছু করতে মন সরছে না। কার জন্য মিছামিছি সে এত কষ্ট করবে? বাড়ীতে শুধু সে আর তার মা। মা বুড়ি। আর কদিনই বা বাঁচবেন? তারপর শুধুই সে। একা। দায়দায়িত্ব কিছু নেই।

মা মারা গেলে সে আর কাজকর্ম করবে না। তার বেশ বড় একফালি জমি রয়েছে। সেগুলো সে আধিতে দিয়ে দেবে। তার একার জন্য আধা ফসলই ঢের। তাছাড়া তার আরেকটা সুবিধা রয়েছে। সে তো আর অন্যদের মত মদ খায় না। মদ সে মুখেই দেয় না। বুকে জ্বালা ধরানো ঐ তরল পদার্থটি মানুষ কি সুখে যে খায় সে ভেবেই পায় না। তার বাবা ছিলেন মদ খাওয়ার যম। একবার তো মদ খেয়ে তিন দিন রক্তবমি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মদ খেয়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

বাবার দিনের মদের সেই সরঞ্জামগুলো এখনও রয়েছে। দিনে দিনে সেগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু সে রেখে দিয়েছে। রেখে দেওয়া ঠিক নয়, ফেলে দেয় নি আর কি। বাবাকে তার আবছা আবছা একটু একটু মনে পড়ে। তাই নলটলগুলো ফেলে দিতে তার মন চায়নি।

বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর কাজ করে অনেক আনন্দ হত। বাবা এতদিনে হয়তো বুড়িয়ে যেতেন। মাঝে মধ্যে হয়তো তার জলখাবার ক্ষেতে বয়ে নিয়ে আসতেন। মদ খেয়ে মাতাল হলে তার কথা বুক চাপড়ে দশজনের কাছে বলে বেড়াতেন।

এ সমস্ত কল্পনা করতে তার বড় ভাল লাগে। আবার তার ফলেই হঠাৎ করে কাজকর্মে তার বিতৃষ্ণা এসে যায়। কার জন্য সে পরিশ্রম করবে? সব নিরর্থক।

সূর্য ততক্ষণে পুরো উঠে গেছে। চিন্তার তন্ময়তায় তার খেয়ালই নেই।

পেছনে নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনে সে চমকে উঠে। সে ঘুরে তাকায়। তারপর বিরক্তিতে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বদলদুটোকে জোরে তাড়া দেয়।

দেখো পাগলির কাণ্ড। লাজলজ্জা কিছু নেই। এদিকে ডাগর হয়ে উঠেছে তিন চার বছর হল।

"এত পরিশ্রম কার জন্য করছ?" কথাগুলো বলেই আবার সেই খিলখিল হাসি।

"তোর জন্যই করছি, যা, নিলাজ কোথাকার।" রাগে সে ধমক দিয়ে ওঠে। সে জমিতে পরিশ্রম করছে, ওর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?

—"এই, তুমি খারাপ পেয়েছো?" পাগলিটি আহত মনে কথাগুলো বলে আপনমনে চলে যায়। এবার সে ভাল করে ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। নমলের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ময়লা মেখলাটির রঙ অনুজ্বল হয়ে পড়েছে। কালো ফুলগুলির উপর কাদার ছিটে লেগে আছে। বড় খোঁপাটি ফর্সা পিঠের উপর হেলে পড়েছে।

দেখতে দেখতেই মেয়েটি বড় হয়ে গেল। মা বাবা না থাকলে মেয়ের এই দশাই হয়। নমলের বাড়ীতে বাঁদী খাটছে। নিজের পিসিটি বেঁচে থাকলে কথা ছিল না। পিসি মারা যাওয়ার পর নমল আরেকজনকে ঘরে নিয়ে এল। সে অবশ্য একা এল না, এল তার আগের স্বামীর দিকের ছেলেমেয়ে একপাল নিয়েই। ছেলেমেয়ের মা হলে কি হবে এদিকে একেবারে ভ্যাবলাকান্ত। কাজেই ঘরের পর্বতপ্রমাণ কাজের দায় রহনীর।

রহনী খাবার দিয়ে ঘুরে এল। তার চোখে চোখ পড়ল হঠাৎ। মেয়েটি এবার গম্ভীর হয়ে মাথা নোয়াল। তার দিকে তাকাতে তাকাতেই নিজেদের গাঁয়ের দিকে চোখ পড়ল তার। বিলের ওপারে নীচু পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীচে রাঙা রাঙা ফুল, আর উপরে ঝাঁক ঝাঁক সাদা বক। সেই মুহূর্তে নিজের গ্রামটির জন্য তার বড় মোহ জন্মে। তার মাটি যেন সোনার টুকরা। বিলের আর্দ্র স্নেহে তার মাটি বড় কোমল, লাঙ্গলের ফালে আটকানো আঠালো মাটির ঝুরি সে অভ্যাসজনিত ক্ষিপ্রতায়ই পরিষ্কার করে। লাঙ্গলের টানে মাটি সরে যায়, তার পায়ের উপর ছোট-বড় কেঁচোর বাহিনী হেঁটে যায়।

লাল লাল ফুল আর সাদা সাদা বকের মতই চিরদিনের তাদের এই ধান ক্ষেতের মাঠ—তাদের গ্রাম, বিল আর সরল বিশ্বাসগুলোও তাই। বিলে রাজহাঁসের দল আর আগের মত সাঁতার কাটে না। কিন্তু ক্ষেতের সোনা আজও তাদের অটুট।

সে আজ একটু তাড়াতাড়ি হাল বন্ধ করে। জলখাবারের ব্যবস্থা তাকে নিজেকেই করতে হবে। তদুপরি কাল আবার খেরাই পূজা, চিফুং (বাঁশী) সে আজ কতদিন হল বাজায় নি। নিংমার (উপজাতীয় লোকগীতি) সুর তো সে ভুলেই গেছে। মনে মনে সে আওড়ায়,

থাইগীর মিখিয়া খংবা
শিজুয়াবো থানাই বা
চিফুং নি গরাং বা
বড়ো বারাই নি আচাবা ফংবা।

হাড়ির আগুনের মৃদুমন্দ তাপের মতো এই মিষ্টি রহস্যময় সুরের খেরাই পূজায় গানে আকাশ থেকে দেবতারা নেমে আসেন। বহুদিন পর তার মনটা আবার সজীব হয়ে ওঠে—ভুলে যাওয়া অজস্র স্মৃতি বিজড়িত খেরাই পূজার সেই দিনগুলো।

গরুজোড়াকে ছেড়ে দিয়ে সে দ্রুত বাড়ী চলে এল। ঘরের দাওয়ায় একখানা চাটাই পেতে মা জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে। জ্বরের বেদনা গায়ে, আরামের জন্য রোদের সেঁক নিচ্ছে। মাকে এভাবে দেখে বিরক্তিতে তার উৎসাহ কমে গেল। মরে গেলেই ল্যাটা শেষ হয়। অথচ মরবে না। তাকে জ্বালিয়ে খাওয়ার জন্য ভগবান তার গলায় কালসাপিনী ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

"ঘরে গিয়ে মরগে যা। জ্বর বাড়িয়ে আমাকে ভোগাতে চাইছিস্ কেন?"

জ্বর বাড়লে তার হবে বিস্তর ঝামেলা। যত ঝামেলা! ঘরে শুয়ে থাকলেই তো হয়। এখানে রোদে মরতে এসেছে। তার ভাগে পড়েছে পূজার চারটি মশাল দেওয়ার দায়িত্ব। কলাগাছ কেটে গুড়ির দিকটা গোল করে তাতে পুঁতে সাজিয়ে দিতে হবে। কলার খোলে করে দিতে হবে কিছু শস্য, সর্ষের তেল, তার সঙ্গে কার্পাস তূলা আর কার্পাসের সলতে। এগুলো নিয়েই হলো পূজার মশাল, সহজ ব্যাপার নয়। তদুপরি সে একা মানুষ।

তার ধমক তোয়াক্কা না করে মা মড়ার মতোই পড়ে রইল। ধমকের ফলাফল দেখার সময়ও তার ছিল না। সে কিছু না খেয়েই তাড়াতাড়ি হাতে দা খানা নিয়ে বেরিয়ে গেল। কে এত কলাগাছ কাটবে। সে দুটো মশালই দেবে কোনো মতে—মনে মনে স্থির করে ফেলল।

বাইরে এসে সে থমকে দাঁড়াল। রহনী চাল কুমড়া একটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে আসছে। তাকে দেখেই তার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। রহনী তার বাড়ির দেউরি পার হওয়া পর্যন্ত সে ভেতরেই রইল।

—"তোর শুধু রাগ হলেই হল, না?"

পূরণ ভাবেনি যে মাঠে এত গালি পাড়ার পরও রহনী তাদের বাড়ীতেই এসে ঢুকবে। সে সত্যিই একটু বিস্মিত হল। রহনীর ভাবভঙ্গিতে সেই বন্য উদ্দামতা। একই খিলখিল বেপরোয়া হাসি। যেন কিছুই হয় নি।

হাসির শব্দ শুনে পূরণের মা চমকে ওঠে, দাওয়া থেকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে যায়, রহনীর দিকে একটা বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ তার হাসিতে পূরণ আর তত বিরক্ত হল না।

"আমাকে একটা মশাল তৈরী করে দাও না।" সে কুমড়াটা মাটিতে রেখেছে, তার কণ্ঠে আবদারের সুর।

—"যা যা, আমার বলে মরবার সময় নেই। আমাকে একটা মশাল বানিয়ে দাও না? যা না, নমল বাপ না পিসেকে গিয়ে বল না ; সে মরে গেছে নাকি?"

তাকে মই দিয়ে স্বর্গে তুলে দিতে এসেছে! তার নেই মরবার সময়, তার কাছে এসেছে সোহাগ জাগাতে। আমাকে একটা মশাল দাও না! সেই নমল, তার বাপ না পিসে, সে মরে গেল নাকি। পাগলী এসেছে তার কাছে দৌড়তে দৌড়তে। রাগে সে অনেক অশ্লীল কথা বলে। তার গালে জোরসে একটা চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছা হল তার। তার কাছে সোহাগ মাগতে এসেছে আবার!

"না দিলে না দেবে। পূজা না করলে মরে যাব নাকি আমি। পিসেকে বললাম সেও দেবে না। তোকে বলে গালি খেলাম। না দিলে বয়ে গেল আমার।"

বাদ দাও, না দিলে কিই বা এমন হবে তার। পিসে তো দেবেই না, এখানেও গালি খেল। ঠিক আছে, পূজা করবে না। পূজা না করলে সেকি মরে যাবে? বেশী সাধ্যসাধনা করে কারো মন গলানোর পাত্রী নয় সে। তাই কুমড়াটা ফেলে রেখেই পটপট করে সে চলে যায়।

পূরণের মুখটি বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে গেল। রাগ করে গেলই বা চলে। তার কি হল। নিজের ব্যবহারের জন্য তার একটুও অনুতাপ হল না। দুটো কলাগাছ সে কেটে নিয়ে এল। কলাগাছের মাথার দিকটা সরু মসৃণ করতে করতে বহুদিনের পূরাণো একটা গানের কলি তার মনে এল—

নাও দান নাইচ' বদ্দারী ফোর  
নুংবো যম্ফোর খো লাংফা গুণ না ঐ,  
হে ধরম হে ধরম সাজি গৈয়া গৈয়া,  
চরম গৈয়া...

কোন অতীতে বড়ো যুবকেরা পানসি নৌকা সাজাচ্ছিল কলাগাছ দিয়ে। এমনি কলাগাছ কাটতে দেখে নদীর অপর পারের যুবতী মেয়েদের মনে মাতন লেগেছিল, তারা অনুনয় করে বলেছিল, "তোরা তোদের নৌকায় আমাদের নিয়ে যাবি না?"— রহনীর মতোই নিলাজ যুবতীর দল।

সঙ্গে সঙ্গে সে তিনটা কুমড়ার খোল সাজাল। রহনীকেও একটা দিতে হবে। নইলে তার যা মেজাজ, কে দেবে তাকে? সারা বছরের মধ্যে একবারই তো খেরাই আসে।

তার ভাত খাওয়া হয়নি। মা তাই জকাইখানি (মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের বাঁশের কাঠি) নিয়ে বেরিয়ে গেল। জ্বল গায়েই। শুয়ে বসে থাকলে জ্বর আরো জেঁকে বসবে। বিষে বিষক্ষয়। মাকে বাধা দিতে তার ইচ্ছা হল না। মায়ের

প্রতি তার অপরিসীম বিতৃষ্ণা। তাকে ভোগানোর জন্যই যেন বুড়ি বেঁচে রয়েছে!

যেখানে খেল, সেখানেই বাটিটা ফেলে রেখে মুখে বিড়ি একটা ধরিয়ে সে গেল দেবতার থানের দিকে। পূজার বাতিগুলো দেউরী (পুরোহিত) ঠিক করে রেখেছেন তো। ঐ টেঙ্গাফলের খোলগুলো না ধুলে আবার তেল ভাল জ্বলে না। আবার ধুয়ে ভাল করে না শুকালে তেল পোড়ার সময় ফরফর শব্দ করে। মাটির প্রদীপের চাইতে ঐ চেঙ্গাফলের বাতির আলোর গন্ধ তার বেশী ভাল লাগে।

যাওয়ার সময় রহনীর জন্য তৈরী করা কুমড়ার খোল সর্ষে আর তেল দিয়ে ভর্তি করে সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, নমলের ছোট মেয়েটাকে পেয়ে তার হাতে দিয়ে গেল। রহনীর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

খেরাই-এর রাতটা তার বর অস্বস্তিতে কাটল। থানে গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে। এমনকি বেমারি তার বুড়ি মাও এসেছে। কিন্তু রহনী আসেনি, না আসার কারণটা জানতে তার বর ইচ্ছা হল। কিন্তু মুখ খুলে জিজ্ঞেস করতে সে কেন জানি সঙ্কোচ বোধ করল। যে মেয়েগুলো নাচছে, তারাও রহনীর কথা কিছু বলল না। সে প্রথমে ভেবেছিল পাগলির কি মাথার কিছু ঠিক আছে। প্রথম রাতে হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল, তাই আসে নি। ভোরে হয়তো নাচতে নাচতে এসে হাজির হবে। কিন্তু চাঁদের আলো ম্লান হয়ে এল, বিলের লাল ফুলগুলো স্পষ্ট হয়ে এল, থানের বুড়া শ্যাওড়া গাছ থেকে সাদা বকের দল উড়ে গেল, কিন্তু রহনী আর এল না।

সকাল বেলা রহনীর উপর খুব রাগ হল। গুরু-গোঁসাই কিছু মানে না মেয়েটা, একেবারে পিশাচী। হাতের কাছে পেলে থানের বাথৌ (শিব) দেবতার কাছে তাকে বোধ হয় বলিই দিয়ে দিত। মুরগির রক্তের বদলে দেবতা তার রক্তই পান করতেন। এত কষ্ট করে সে মশাল সাজিয়ে দিল, তার অবমাননা করার প্রতিশোধ তাহলে ভাল করেই নেওয়া হত।

তার রাগ চরম সীমায় পৌঁছিল যখন নমল তাকে রহনীর নাম জড়িয়ে খোঁটা দিল। মদের নেশায় নমলের হুশ ছি. না। নমলকে তাড়া করল কিন্তু ধরতে পারল না, ফলে রাগে সে বাঁশের বাঁশিটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করল, তারপর বাড়ি চলে গেল। মদের নেশায় নীচে চার পাঁচজন পড়েছিল, তাদের সে মাড়িয়ে গেল।

রহনীর চোখে তখনও ঘুমের জড়তা রয়ে গেছে। চোখ মুছতে মুছতে সে আসছিল।

"মারব নাকি একটা চড়"—তাদের জাতের মধ্যে অন্য লোকের যুবতী কন্যার উপর হাত তোলার রেওয়াজ একেবারেই নেই, রাগে একসা হলেও নয়।

রহনী আশ্চর্য হয় না। সহজ ভাবে বলে—"মার না। কেলেংকারি হলে ভাল হবে। আমরাও শুয়ার খেতে পাব।"

তার সহজ সুরে বলা কথাগুলো শুনে পূরণ থমকে গেল। অন্য লোকের জোয়ান মেয়ের উপর হাত তুললে সমাজ তাকে শাস্তি দেবে। প্রায়শ্চিত্ত বাবদ শুয়ার একটা লাগবেই।

"এই ধাড়ী শুয়ারটা দেখেছো। তুমি ঠিক এমনি পূরণ—" পূরণ রাগে ধমকে ওঠে। মারতে যায়।

—"মার না। একেবারেই মেয়ে ফেল। তোমার হাতে মরতে পেলে—"

রহনীর কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই পূরণের কানে বজ্রপাত হয়। সে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিক লজ্জা নয়, কিন্তু কি যেন একটা বিশৃঙ্খল চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি সে সরে যায়। রহনীর মুখরা মুখখানির দিকে তাকাতে তার ভয় করে। সে চার দিকে তাকায়। আর কেউ শোনেনি তো নির্লজ্জ মেয়েটির এই কথাগুলো। কুমারী মেয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ এই সমস্ত কথা, আর কেউ শুনে ফেললে যে কি বলবে। পথে চলতে চলতে সে আবার সেই নির্লজ্জ কথাগুলোর কথা ভাবল। তার হাতে রহনী মরতে চায়, কিন্তু কথাগুলোর ইঙ্গিত কি অশালীন। বিবাহিত স্ত্রী স্বামীর হাতে মরার কামনা ব্যক্ত করে। কুমারী মেয়ের মুখে একথা অতি অশোভন। খুব অস্বস্তি হয় তার।

এবারের খেরাই আদৌ জমল না, আসল রংদার মেয়েটিই গেল না। হাস্যে লাস্যে মাতিয়ে তোলার যে ক্ষমতা রহনীর, অন্যরা তার কাছেই আসতে পারে না। অবশ্য মেয়েটির মাথায় কিছু ছিট আছে। কিন্তু তাকে আসলে কথাটাই জিজ্ঞেস করতে পূরণ ভুলে গেছে। সে খেরাই-তলায় গেল না কেন? মনে মনে সে ভাবল যে মাঠে পেলে জিজ্ঞেস করবে। তার জমির পাশের জমিগুলোতে এখনও কেউ লাঙ্গল দেয় নি। তই জলখাবার দিতে হলে তার জমির পাশ দিয়েই যেতে হয়। তখন তাকে একা পাবে, তখন জিজ্ঞেস করে নেবে। লোকজনের সামনে তার সঙ্গে কথা বলা বড় বিপজ্জনক ব্যাপার।

কিন্তু আসল সময়ে একটা সংকোচ তাকে বিব্রত করল। কেন যেন কুণ্ঠিত বোধ করল।

"ভোরে তুই হন্‌হন্ করে চলে গেলি? খারাপ পেয়েছিলি?"

রহনী জলখাবার নিয়ে যাচ্ছে। জবাব দেওয়ার জন্য তাই দাঁড়াল না। যেতে যেতে বলল—"যা। আমাকে তো সবাই খারাপ বলে। আমি পাগলি, সকলেরই চক্ষুশূল। তুমিই বা খারাপ পাবে না কেন?"

—"খেরাইতে গেলি না কেন?" সে উত্তর দাবী করল গম্ভীর সুরে, আগের কথাগুলো যেন তার কানেই যায় নি।

"এমনি, ভাল লাগল না, গেলাম না। বাড়ি চলে গেলাম।"

এমনিই যাইনি। যাবার ইচ্ছা হল না, তাই গেলাম না। তাতে কার কি? তার

মতে সামান্য একটা মেয়ের হাজিরের অভাবে খেরাই পূজার তো আর কোনো ব্যাঘাত হয়নি।

পূরণ নিজে হলে এমন অবহেলাভরে কথাগুলো বলতে পারত না। সারা বছরের একটাই খেরাই পূজা। প্রচণ্ড অভাব অভিযোগ ঝামেলা দুর্দৈবের মধ্যেও মানুষ খেরাই-এ না গিয়ে থাকতে পারে না। কারণ, খেরাই হচ্ছে সার্ব্বজনীন মঙ্গলের অনুষ্ঠান। সমস্ত অমঙ্গল নাশ করার জন্যই মানুষ খেরাই পূজা করে। খেরাই পূজা হচ্ছে পলাতকা দেবীর পূজা, অথচ এবার খেরাই-এর দেবী নিজেই পলাতকা থাকল। পূজার সত্যিকার দেবীর মতই হচ্ছে রহনী, যদিও সে পাগলি। সে না থাকলে খেরাই পূজা তাই জমে না, সবাই তার অভাব বোধ করে। যদিও মুখ ফুটে সে ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করা তাদের স্বভাবের বাইরে।

ক্ষেতের আলের উপর পা ফেলে ফেলে আসছিল রহনী। শিকারের লোভে পায়চারিরত সাদা বকগুলির মতই। তার প্রতি পূরণের হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুকম্পা জন্মাল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত অজানা সেই সব লোকদের প্রতি তার ঘৃণা জন্মাল, তারা রহনীর জীবনকে এমন দুঃখময় করে তুলেছে।

তাদের মধ্যে চেনা শুধুমাত্র নমল। অন্য কাউকে সে চেনে না। হয়তো অনেকে জীবিতও নেই এখন। কিন্তু তাদের কুকীর্তির ভার এখনও রহনী বহন করছে। রহনীর মত মা-বাপমরা জোয়ান মেয়ে, তার প্রতি কল্যাণ কামনায় তার মন ভরে গেল।

তার মা অনেকক্ষণ আগে জলখাবার নামিয়ে বসেছিল, এতক্ষণ তার নজরেই পড়েনি। ছেঁড়া মেখলার একটা দিক ধরে আছে, আর চুলের জঞ্জাল থেকে উকুন ধরে এনে নখে টিপে মারছে। কাছে বাটির উপর তার জলখাবার কলাপাতা দিয়ে ঢাকা। মায়ের মনে দুঃখ—ছেলে গাঁয়ের অন্য দশজনের মত মদ খায় না, কথাটা ভেবে অবশ্য কোনো কোনো সময় সে খুশিও হয়। জোয়ান ছেলেমেয়েদের কুপথে যাওয়ার সূচনা হয় মদ থেকে। পূরণের বাবাকে এমনি জোয়ান বয়সে একজন টেকেলি বাণ মেরেছিল। লখনু ওঝা বাণ কেটে কোনোক্রমে রক্ষা করে। পূরণের জন্মের ঠিক আগের কথা, সে সময়ে তার ঘর ভাঙ্গে ভাঙ্গে এমন অবস্থা হয়েছিল। মদের শক্তিও বাণের মতই। মরার আগে পর্যন্ত মদই তাকে চালাত।

পুরানো কথা ভেবে ভেবে তার বোধহয় পূরণের জন্য নূতন করে মমতা হল।

—"আয়, খা না।" খুব স্নেহের সুরে কথাগুলো বলে মা নিজেই লজ্জা পেল। এত বড় ছেলেকে এবাবে বলতে কি রকম যেন লাগে।

"রেখে যাওনা"—পূরণ ধমক দিয়ে বলে, মায়ের দিকে না তাকিয়েই। মায়ের লজ্জাটুকু সে দেখিনি, তাই মাকে সে স্মরণ করিয়ে দিল যে মা ও ছেলের মধ্যেও লজ্জার ব্যাপার একটা কিছু রয়েছে। তার মা নীরবে চলে গেল। পূরণ বলদ দুটোর

উপর অকারণেই মেজাজ দেখাল। তার বুদ্ধির অগম্য কি যেন একটা অভাব তাকে পীড়ন করছে। এমনিতে তার সংসারে দৃশ্যমান অভাব কিছু নেই। কিন্তু কেন জানি তার সবকিছু-ই শূন্য বলে মনে হল। মনের মতো কিছুই যেন সংসার তাকে দেয়নি। অথচ যা চায়নি, সে ধরনের জঞ্জালে তার সংসার ভরে রয়েছে। তার মন হঠাৎ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। জীবনটা দুর্বহ করে তোলার জন্য তার চারপাশে যেন গভীর একটি ষড়যন্ত্র চলছে।

রহনী ফিরে আসছিল। হঠাৎ রাগে জ্ঞানশুন্য হয়ে সে তাকে একটা চড় মেরে বসল। রহনী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে, চোখ মুছে সে বলল—"তোমার এত রাগ কেন আমার উপর? পাগলি বলে তো জানই। আমার সব কথা ধরার দরকার কি? মেয়ে হলে বুঝতে আমার অবস্থাটা।"

সত্যিই, মেয়ে হয়ে জন্মালে বুঝতো যে জীবনের সবগুলি দিক যার কান্নায় ভেজা, তাকে তো জোর করেই হাসতে হয়। নইলে যে হেসে খেলে পৃথিবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর তার অন্য কোনো উপায় নেই। সে কি করে বলবে যে তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র ভেতরে ভেতরে চলছে। মোটা পণ নিয়ে তার পিসে তাকে বিয়ের নামে বিক্রী করে দিচ্ছে অজানা অচেনা একটা লোকের কাছে। লোকটার বয়স কত তাও সে জানে না। ছেলেপিলে হয়নি বলে নিঃসন্তান লোকটা সন্তান লাভের আশায় তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। রহনী কি করে পূরণকে বলে যে অন্য কেউ তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে বলে নমল রাতে তাকে বেরুতে দেয় না। সব সময় চোখে চোখে রাখে।

রহনীর দু'গালে আঝোর ধারায় অশ্রু বয়ে গেল। পূরণ মনে মনে একটু বিচলিত হল। একটু মায়া হল রহনীর উপর। কিন্তু প্রকাশ্যে সে মমত্ব প্রকাশ করাটা দুর্বলতা। তাই সে ধমক দিয়ে বলে, "যা, চলে যা এখন থেকে।"

রহনী ধীরে ধীরে চলে যায়। যাওয়ার আগে বার বার পূরণের মুখের দিকে সে তাকায়। সে দৃষ্টি দেখে পূরণের মনে হল বুকের উপর দিয়ে যেন একটা জ্যান্ত সাপ চলে যাচ্ছে। রাগের মাথায় চড় মারার ফলাফলটা সে খতিয়ে দেখে নি। যুবতী মেয়ে আর অনাত্মীয় মেয়ের গায়ে হাত তোলাটা তাদের সমাজের দৃষ্টিতে মহাপাপ। এ ধরনের অপরাধীকে তাদের সমাজ কখনও ক্ষমা করে না। খুবই ভয় পেয়ে গেল সে এই কথাগুলো ভেবে। রহনী নিশ্চয়ই এত সময়ে তার পিসেকে বলে দিয়েছে, আর নমল ব্যাপারটা জানিয়েছে গাঁওবুড়ার কানে। বিকালে নিশ্চয়ই দেবতার থানে তার বিচার-সভা বসবে।

এই ধরনের অপরাধীর প্রতি সমাজের বিচার যে কত কঠিন, তা সে জানে।

তাকে উলঙ্গ করে নদীর পারে একটা খড়ের পাঁজার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। বাইরে গাঁয়ের সমস্ত লোক এসে জমা হবে। খড়ের পাঁজায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে তারপর। পাপ স্খলন করে বাঁচবার ইচ্ছা হলে জ্বলন্ত সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে নগ্ন অবস্থায় সর্বসাধারণের সামনে বেরিয়ে আসতে হবে, তারপর দৌড়ে গিয়ে নদীতে স্নান করে এলে পরই প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে।

সে সকলের সামনে এভাবে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তার চাইতে মরে যাওয়া ভাল, সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে তার মাথা ঘুরতে লাগল, তার চারদিকে যেন প্রচণ্ড একটা ঢক্কানিনাদ চলছে, সে কোনো কিছুই আর শুনতে বুঝতে পারছে না।

বাড়ি কখন পৌঁচেছে সে টেরই পায় নি। ঘরে ঢুকে কম্বলখানি গায়ে মাথায় টেনে সে বিছানায় পড়ে রইল। নিজের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য তার নিজের উপরই ধিক্কার এল।

তখন তার মায়ের উপর এক অভূতপূর্ব নির্ভরতা সে খুঁজে পেল। "—আমাকে খুঁজেত কেউ এসেছিল নাকি?"

কেউ এসেছিল নাকি তার খবরে? মাঠে ঘটে যাওয়া সেই দুর্ঘটনা যেন বহুদিন আগের একটা ব্যাপার। সে যে কি করবে, কি না করবে কিছুই ভেবে পেল না। মা ছাড়া তার আপনার লোক বলতে কেউ নেই। যারা থানে জমা হবে, কি অবস্থায় রহনীর গায়ে সে হাত তুলেছে, তা তারা বোঝার চেষ্টাও করবে না। তারা বুঝবে না যে কদিন ধরে তার মন মেজাজ ভাল নেই, তার হিতাহিত বিবেচনা লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

রহনীর যা স্বভাব, হয়তো তার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নিজেই নির্লজ্জের মতো সমস্ত গাঁয়ে কথাটা বলে বেড়াচ্ছে। সে আরো রং চড়িয়েই বলবে। আর মানুষ যুবতী মেয়ের কথা ছেড়ে তাকে বিশ্বাস করবে কেন? ফলে তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু এত সহজে মরতে তার ইচ্ছা হয় না। বিচারসভা বসার কথা স্থির হলেই সে তাহলে পালিয়ে যাবে। মাকে ফেলে রেখে যাওয়ার জন্য তার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, মা আর সুখেই মরতে পারবে।

ভেবে ভেবে পৃথিবীর দৃশ্যগুলো তার চোখের সামনে আরো বেশি মাত্রায় প্রখর হয়ে উঠল। জীবনের সময় যেন অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তার সমগ্র জীবনটাই একটা বিরাট অপচয় বলে মনে হল। কোথায় কি যে একটা অপূর্ণতা থেকে গেছে।

তাদের এই সুন্দর গাঁ, বিল, জলের উপর ভেসে থাকা ফুল আর সাদা বকের ঝাঁক, শূন্য মাঠ আর পরিচিত মানুষ সবাইকে ছেড়ে হঠাৎ মরে যাওয়ার কথাটা

সে কল্পনাও করতে পারে না। এই গাঁ যদি তাকে ভাল না বাসে তবে ভালবাসার সন্ধানে সে অন্য গ্রামে যাবে। তা বলে এমন সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে পারবে না।

কয়েক বছর আগে ছোট্ট একটা চড়ুই পাখী ধরেছিল সে, ফাঁদে ধরা পড়ে সেটা বেঁচেছিল। সে ধরতে গেলে তার হাত আঁচড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, না মরার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিল।

এই রহনী কোত্থেকে যেন কি ফুলের রস মুখে মেখে তার কাছে এসে বলেছিল,—"এই পাখীটাই আরেক জন্মে ফাঁদ পেতে তোকে ধরবে।"

সেদিনের সেই কথাটা মনে রাখার প্রয়োজন মুহূর্তের জন্যও তার মনে হয়নি। আজ মনে পড়ছে। রহনীই যে সেই অভিশাপের বাহন হিসারে এত তাড়াতাড়ি হাজির হবে, তা সে ধারণা করেনি।

বাইরে হঠাৎ রহনীর গলা শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে রইল। পেছন থেকে যেন একটা স্টীম রোলার তাকে পিষতে আসছে। আর তার দূরে সরে যাওয়ার শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

"খুড়ি, মাছ ধরতে যাবি?"

"কোথায়? বিলে না নদীতে?" পূরণের মা জিজ্ঞেস করে।

"যেখানে যেতে চাও। পূরণদা নেই?"

"আছে। ঘরে শুয়ে রয়েছে। তোর গালে কি হয়েছে?"

"মাছি কামড়েছে।"

"পাগলি। ওষুধ নেই?"

পাগলির ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে। গালে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ বসে গেছে, সেটাকে কি মাছির কামড় বসে চালিয়ে দেওয়া যায়? রহনীর গালের দাগের ব্যাখ্যা শুনে সে আর বিছানায় বসে থাকতে পারল না। ধড়মড় করে দরজার সামনে গিয়ে সে রহনীর দিকে তাকাল। রহনীও তাকিয়ে রইল তার দিকে। হঠাৎ চোখ নামিয়ে মেখলার কালো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। চৌকাঠে তার পা একটি রাখা রয়েছে। সে সুডৌল সেই পায়ের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। গামছাখানা ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করল পূরণ। রহনীকে সেই মুহূর্তে তার অদ্ভুত ভাল লেগেছে। তার প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল।

মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে রহনী পূরণের মার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তার এলোচুল, তার সরু কোমরের দোলনের মধ্যে এমন একটা ছন্দময় ভঙ্গি ছিল, যা বহুদূর পরও তার মনের মধ্যে ছবির মত ভাসত।

এক মাসের মধ্যেই নমল কাছের একটা গাঁয়ে রহনীর বিয়ে দিয়ে দিল। রহনীর মনে কোনো খেদ কিংবা মালিন্য বোধহয় ছিল না। পূরণের হয়তো অল্প খারাপ লেগেছিল। কিন্তু তার মতো মানুষেরা ভবিতব্যের নামে সব কিছু মেনে নিতে পারে।

হালে গিয়ে সেদিন রহনীর কথাই মনে পড়েছিল তার। বিলের লাল ফুল আর সাদা বককে সময়ের ছায়া স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু সময়ে রহনী বুড়িয়ে যাবে। তার ঝরঝর হাসির প্রবাহও একদিন শেষ হয়ে যাবে।

বুকে মাতৃত্বর কোমলতা নিয়ে রহনী পরে একদিন তাদের বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু তাকে দেখে আগের মত রাগও উঠল না আবার ভালও লাগল না। ❐

স্নেহ দেবী

নাহরকাটিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা এই মহিলার প্রথম গল্প সংকলন 'কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার জোনাক'। অজস্র গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

# মনে মনে

সেদিনও সকালেই মুরগীটাকে দেখল যমুনা। রান্নাঘরের উনুনে যখন আগুন ধরাতে যাচ্ছিল, তখন উঠানে কিসের একটা শব্দ পেয়ে যমুনা বাইরে এসেছিল। দেখল সেই সাদা আর মুগা রং মেশানো ফুটফুটে মুরগীটা উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যমুনা ভেতরে আগুন ধরাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিল, "কার মুরগী এটা? আজ চার পাঁচ দিন ধরে প্রায়ই আসছে। তাড়িয়ে দিলেও আবার আসে। সাহস পেলে বোধহয় ভেতরে ঢুকবে—হয়ত ধরা দেবে তারপর।"

কমলও বিছানা থেকে উঠেই দেখল মুরগীটাকে। "কার মুরগী এটা?" যমুনাকে জিজ্ঞেস করল। "আমি কি করে বলব, কে জানে কার বাড়ি থেকে এসেছে।" যমুনা বিরক্ত সুরে উত্তর দিল।

আজ কয়েক দিন হল মুরগীটা তাদের উঠানে বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। কপিচারা কটা খুঁচিয়ে নষ্ট করতে পারে বলে কমল 'হেঃ হেঃ' করে হাত তুলে মুগীটাকে ভয় দেখিয়েছিল। এই চার পাঁচ দিন যমুনাও ওটাকে দেখলেই তাড়িয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু বৃথা—তাড়ালেও মুরগীটা আবার আসে। অবশ্য কপি বা অন্য শাকসব্জীর ক্ষতি করে না, শুধু ক্ষেতের জন্য আনা গোবরের স্তুপের আশে-পাশে বসে মাটি আঁচড়াতে থাকে।

কড়াই পোড়ানোর জন্য বেড়ার কাছে কলাগাছের শুকনা খোল, সুপারির খোল, পচা খড় ইত্যাদি জমিয়ে রাখা হয়েছে। মুরগীটা সেখানেও মাঝে মাঝে হানা দেয়, কি যেন খুঁজে বেড়ায়। শুকনা কলার খোলগুলো মরমর শব্দ করে।

কমল মুখ ধুয়ে বারন্দায় এসে দাঁড়াল। যমুনা প্লেটে ছোট দুটো লিলি বিস্কুট আর এক কাপ চা বাড়িয়ে দিল।

মুরগীটা আবার এগিয়ে এসেছিল। কমল একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। যমুনা ভেতর থেকে দেখে বলল, "ওটাকে আবার সাহস দিচ্ছ।" কমল একটু হাসল, কিছু বলল না। মুরগীটা প্রথমে ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়েছিল, পরে এক পা দু পা করে এসে বিস্কুটটা খুঁটে খেতে আরম্ভ করল।

আড়াই বছরের ছেলে পোহর জেকে উঠে বিছানা থেকে কান্নার সুরে 'মা' 'মা' বলে ডাকছিল। যমুনা শোবার ঘরে গেল। পোহরকে আরেকটা শার্ট পরিয়ে কোলে করে যমুনা বাইরে আশে। মুরগীটা বিস্কুটের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, তাই দেখিয়ে তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করে।

পোহর হাত মেলে মায়ের কোল থেকে নেমে মুরগীটাকে ধাওয়া করতে চাইল। কিন্তু ভেজা মাটিতে ওকে নামতে না দিয়ে কমলের কোলে বসিয়ে যমুনা আবার রান্না ঘরে ঢুকল।

বিকালে কমল ও যমুনা দুজনেই আবার মুরগীটাকে দেখল। কমল বলল, "কারো ডিমপাড়া মুরগী হয়তো বা।" যমুনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। কমল বলল, "হ্যাঁ, অনেক মুরগীই ডিম পাড়ার সময় এরকম জায়গা খুঁজে বেড়ায়। যেখানে সেখানে পাড়েও।"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

সন্ধ্যের সময় যমুনা এমনিই বাড়িটা একবার পাক দিল।

কোথাও সামান্য একটা শব্দ হলেও কান পেতে শুনল। সকালে নিকানো উঠানে নিজেরই ফেলে দেয়া পোহরের জন্য লজেন্স বেঁধে আনা সাদা কাগজের টুকরাটার কাছে গিয়ে "কি যেন পড়ে আছে" বলে দেখে এল।

সন্ধ্যের পর উনুনের পাশে বসে কমল জিজ্ঞেস করল, "মুরগীটাকে আবার দেখেছিলে নাকি?"

যমুনা ছোট্ট করে বলল, "উহুঁ"।

পোহর রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে খানিক বিরক্ত করল। যমুনা ওকে খুব যত্নে আলতো ভাবে আবার শোয়াল। অনেক রাত পর্যন্ত যমুনার ঘুম আসছিল না। ঘরের কোণে ইঁদুর আর ছুঁচো ছোটাছুটি করছিল।

যমুনার মনে এলোমেলো ভাবনা আসা যাওয়া করছিল। পোহরের শরীরটা খুব ভাল নয়, তাই রাতে আজকাল যন্ত্রণা করে। মাস খানেক আগে যমুনা ওর দিদির বাড়ীতে গিয়েছিল। দিদির ছেলে মেয়ে তিনটে ; অভাবহীন সংসার। — একবার পোহরের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা হচ্ছিল। দিদি বলেছিল, "ওকে একটা করে আধসেদ্ধ মুরগীর ডিম খাওয়াতে আরম্ভ কর তো। আমি তো এদের সব সময় খাওয়াই। ডাক্তারও বলেছিল।" যমুনা নিস্পৃহ ভাবে 'আচ্ছা' বলে সম্মতি জানিয়েছিল।

সেই কথাগুলো মনে পড়ল। দিনে একটা করে ডিম মানে দিনে চার আনা করে পয়সা। অর্থাৎ মাসে প্রায় আট টাকা। মুরগীর ডিম তো আর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়ার বস্তু নয়? সত্যিই, কোনো কিছু রাস্তায় কুড়িয়ে পেলে মনটা বড় খুশি খুশি লাগে, সেই কুড়িয়ে পাওয়ার স্মৃতিও সহজে ভুলে যাওয়া যায় না। স্কুলে পড়ার সময়ে যমুনা একবার রাস্তায় একটা দো-আনি কুড়িয়ে পেয়েছিল। কেউ দেখে নি, যমুনারই নজরে পড়েছিল। চৌ-কোণা সেই দো-আনিটার কথা মনে হলে আজও মনটা খুশিখুশি হয়ে ওঠে।

ভাল করে মনের আনন্দে সেদিন ছোলাভাজা কিনে বান্ধবীদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছিল।

সকালে অন্য দিনের মতই ঘুম থেকে উঠে যমুনা আগুন ধরানোর আগে একবার সন্তর্পণে বাড়ীর পেছন দিকটা দেখে এল। কাপপ্লেটগুলো ধুতে গিয়ে নজরে পড়ল মুরগীটা উঠান থেকে এদিকে চলে এসেছে। যমুনাও বেরিয়ে এল। মাটি থেকে ঢিল একটা কুড়িয়ে নেবার ভান করে সে মুরগীটাকে তাড়াল। আসলে দেখতে চাইছিল কোন দিকে যায়। কার মুরগী হতে পারে এটা? পাশের ধনবাহাদুর ওদের নাকি? অথবা দক্ষিণ দিকে দূরের সরলাদের পোষা মুরগীও হতে পারে। নাকি হাটের কোনো ব্যাপারীর খাঁচা থেকে কোনো ভাবে বেরিয়ে পড়া পালানো মুরগী?

এর মধ্যে একটা ঝোপের মধ্যে মুরগীটা লুকিয়ে পড়ল।

কমল টের পেল, সে উঠে এসে যমুনার হাত থেকে ধূলো মুছিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল, "কি হল?"

"মুরগীটাকে তাড়াচ্ছিলাম।"

"ও"—একটু থেমে কমল বলল, "থাকুক না—কারো অপকার তো করে নি।"

"কার কে জানে মুরগীটা। রোজ বাড়ীতে ঢুকছে।"

"যারই হোক। এমনিতেই যাবে একদিন।"

সেদিন রবিবার ছিল। চা খেয়ে উঠে কমল বাইরের বারান্দায় বসল। সামনের পথ দিয়ে গ্রামের মানুষ জিনিসপত্র হাটে নিয়ে যাচ্ছে। কমল উঠে গিয়ে এমনিই জিনিসপত্র দরদাম করতে লাগল।

"কপি কত করে সের?"

"এখানে খুচরা বিক্রী করব না।"

"ঠিক আছে, দামটা তো শুনি।"

"কিলো এক টাকা চার আনা।"

"আচ্ছা, আর বেগুন?"

"দশ আনা"। বলে দূরে গেল ব্যাপারী।

এক জনের পর আরেক জন নানা ধরনের মানুষ আসছেই। চাল, কলা, গুড়, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নিয়ে।

"এই যে, তোমার ঝুড়িতে ডিম নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কি রকম দর?"

"টাকায় চারটে।"

"এত দাম?"

"দু টাকায় ন'টা দিতে পারব, নেবেন নাকি?"

"না লাগবে না। বাজারে সস্তায় পাব।"

"বাজারে তো আমরাই জিনিস বেচি বাবু।" বলে লোকটা চলে গেল।

রোদ চড়া হচ্ছিল। কমল গায়ের চাদরটা রেখে বাড়ীর কাজে লাগল। উঠানে গজিয়ে ওঠা বুনো গাছগাছড়া কিছু সরাল। উঠানের এখানে সেখানে ঐ মুরগীটা কিছু জায়গা নোংরা করে রেখেছিল। সেগুলো সাফ করল। শুকনো কলার খোলাগুলো সরিয়ে রাখল। ওদিকে একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি পড়েছিল, মাটি থেকে তুলে নিয়ে খড়গুলো তার মধ্যে রাখল।

তখন রান্নাঘর থেকে জল ঢেলে ফেলতে যমুনা সেখানে এল। জল ঢেলে বলল, "কি করছ?" কমল কোদালটা হাতে নিয়ে আগাছা খুঁজছিল। বলল, "এই খড়গুলো মাটিতে পড়ে থাকলে উঁই-এর পেটে যাবে। ভরিয়ে রাখলাম।

"ওগুলো দেখছি পচে যাওয়া খড়।"

"তবু কখনো কাজে লাগতে পারে।"

যমুনা একবার ভাঙ্গা ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকল, যেন পালাল। ওর লজ্জা লাগল। কার জন্যে, কেন, তা নিজেই বুঝতে পারল না। নিজেই যেন নিজের জন্য লজ্জা পাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে একটু সময় থমকে দাঁড়িয়ে পোহরকে জোরে ডাকতে থাকে সে। তারপর ওকে উপরে এনে স্নান করানোর জন্য শার্টটা খুলতে লাগল। খামোকাই পোহরের সঙ্গে কথা বলতে থাকে যমুনা, "গরম জলে গা ধুইয়ে দেব। দুষ্টুমি করবে না। কাঁদলে খারাপ ছেলে বলে ডাকব কিন্তু। পোহর আমাদের ভাল ছেলে—সুন্দর ছেলে।"

দু'তিন দিন পার হল। মুরগীটা আসে, কিন্তু ঐ সময় কমলের সামনে থাকলে তৎক্ষণাৎ যেন একটা কাজ ভুলে গেছে এমন ভান করে যমুনা সরে যায়। কমলও তাই করে। যেন মুরগীটাকে দেখেই নি। শোবার ঘরের খিড়কি দিয়ে হয়তো কমল নিজের শরীর লুকিয়ে এক আধবার তাকায়। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে অন্য কিছু দেখার ছলে যমুনাও একবার তাকায়। দুজনেরই সংকোচ—কিন্তু সংকোচের কারণ ওরা জানে না। দুজনে বাড়ীর পেছন দিকে কেনো কাজে গেলে দূর থেকে ভাঙ্গা ঝুড়িটার দিকে মনোযোগ দেয়। কাছে গেলে সেদিকে তাকায় না, যেন দেখেই নি সেখানে যে ঝুড়িটাতে একটু খড় রাখা আছে। সকালে দাঁত মাজতে মাজতে কমল বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। বিরক্ত সুরে যমুনাকে শুনিয়ে বলে, "এই মুরগীটার হাত থেকে রক্ষা নেই আর। সেদিন এটা ঠিকঠাক করে রাখলাম। আবার তছনছ করেছে।"

না শোনার ভান করে যমুনা পোহরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিন বিকেলে সরলার দশ বছরের বোনটা এল। পেছনে পেছনে একটু বড় ছেলে একটা। পরণের

কাপড়-চোপড় দেখে যমুনা বুঝল, ছেলেটা বাড়ীর কাজটাজে করে। যমুনা জিজ্ঞেস করল, "কি হল বোন?"

"না। এই এদের বাড়ীর মুরগী একটা হারিয়েছে, আপনাদের এদিকে এল কি না দেখতে এসেছে। এই— দেখগে যা।" ছেলেটাকে বলল সে। ছেলেটা এদিক সেদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখল। যমুনা জিজ্ঞেস করল, "মুরগী হারিয়েছে? কার?"

"এই এদের।"

"ওদের বাড়ি কোনটা?"

"আমাদের ঐ দিকেই—নতুন বাড়ি বানিয়েছে।"

"তাই বুঝি। মুরগীটা দেখতে কি রকম?"

ছেলেটা বলল, "সাদা ফুটফুটে। ঐ মুরগীটা সব সময় সকালে এদিকে চলে আসে, আবার সন্ধ্যের সময় চলে যায়। আজকে ওটাকে আমরা পাই নি।"

সরলার বোন বলল, "হ্যাঁ। আমরাও তো দেখি। আমাদের দিদি নতুন বাড়ীটার দিদিকে বলেছে যে আপনাদের এদিকে এলে কোনো ভয় নেই, বরং ঐ দিকের বস্তীতে গেলে মুরগী আর ঘুরে আসবে না। ঐ লোকগুলো বড্ড খারাপ। আজ বোধহয় ঐ দিকেই গিয়েছিল মুরগীটা।"

মেয়েটা আরো অনেক কিছু বলে গেল। যমুনার কানে তা বড় একটা ঢুকল না, ও ভেতরের দিকে চেয়ে দেখল, কমল চেয়ার একটায় বসে কথাবার্তা শুনছে। হাতে অবশ্য একটা বই খোলা রয়েছে।

যমুনা সরলার বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, "ঐ রকম মুরগী একটাকে মাঝে মাঝে দেখি ঠিকই।"—"আজকে দেখেছিলেন?" ছেলেটা জিজ্ঞেস করল। যমুনা বলল, "না, আজ দেখিনি।"

কথাটা ঠিক। ঐ দিন সকাল থেকে মুরগীটাকে না দেখে যমুনার মনটা খালি খালি...লাগছিল।

"নাঃ। এদিকে আসেনি। যাই তাহলে।" ছেলেটা বলল। সরলার বোনও বলল "দিদি যাই।"

"আচ্ছা।" যমুনা তাদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

এসময় খুটুং করে একটা শব্দ হল। যমুনা চমকে উঠল। মুরগীটাই এল বোধহয়। কিন্তু রান্না ঘরে ঢুকে যমুনার কান্না পেল। কোথাকার বেড়াল একটা দুধের সস্‌প্যান উলটে দিয়ে দৌড়েছে। যমুনা—"সর্বনাশ" বলে চেঁচিয়ে উঠল। কমল জিজ্ঞেস করল, "কি হল?"

"তুমি দেখ নি নাকি? কার বেড়াল কে জানে, এত লোভী!"

"লোভী কে নয়? পড়েছে পড়েছে, যেতে দাও।"

"যেতে দাও! এক টাকা সেরের দুধ। পোহরকে এখন কি খাওয়াব?" যমুনা বিড়বিড় করতে থাকে।

কমল বাইরে যাওয়ার জন্য পোশাক পরছিল। শার্টটা মাথায় গলিয়ে সে স্বগতোক্তি করল, "লোভে পাপ আর পাপ হলে..."

যমুনা কমলের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। চমকে·উঠল সে। কমল তখন শোবার ঘরে ঢুকে গেছে।

যমুনা নিজেকে বলার মত করে গজগজ করে উঠল, "লোভে পাপ! লোভ কে করেছিল তা আমি যেন জানি না।" ❐

**চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া**

জন্ম 1928, আমগুরি, শিবসাগর। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামে কারাবরণ করেন। কটন কলেজ থেকে বি. এস. সি. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করেন। আসাম ট্রিবিউন ও অসম বাতরি পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে কয়েক বছর কাজ করার পর অসম প্রকাশন পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দু'খানা গল্প সংকলন, তিন খানা উপন্যাস এবং একটি ভ্রমণ কাহিনীর লেখক।

# প্রত্যয়

এই গোটা ঘটনার প্রকৃত অর্থ কি? বাঁ হাতের চুড়ি একটা ডান হাতে বের করে আনতে চাইছিল সে, পারল না। বুকটা দুহাতে চেপে ধরল, অনুভব করল হৃদয়ের মধ্যে যে ঝড় বইছে, তা দুহাতের চাপে বন্ধ করা যাবে না।

বৈবাহিক জীবনে ওর এটা রূঢ়তম আঘাত। যাকে স্বামী বলে, জীবনের আরাধ্যতম পুরুষ বলে এতদিন বিশ্বাস করে আসছিল, সে-ই অফিসের এক সামান্য প্রমোশনের আশায় নিজের স্ত্রীর মর্যাদা এভাবে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হতে পারল। পতি-পত্নীর সম্পর্ক কি এত সামান্য, এত মূল্যহীন!

ক্ষিপ্র পদক্ষেপে প্রতুল ভেতরে ঢুকল। সে আলোটা জ্বালিয়ে দিল এবং দেখল মিনতি বিছানা থেকে উঠে তার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে তার স্বামীর সামনে এভাবে দাঁড়ায় নি, স্বামীর প্রতি এমন রূঢ়দৃষ্টিও তার এই প্রথম, কিন্তু আজ এটা না করলে নয়। তার নারীত্বকে যেই অবমাননা করুক না কেন, মিনতি তাকে ক্ষমা করতে পারে না। স্বামী হলেও না।

"বাইরে তোমার কি কাজ ছিল?" প্রতুলের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিনতি দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"কাজ না থাকলে আমি বেরিয়ে যাব কেন?"

কথাটা বলে প্রতুল একদিকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল এবং ভেবেছিল মিনতির এরকম একটা প্রশ্নের এটাই হবে একমাত্র ও প্রকৃত উত্তর। কিন্তু মিনতি তার দুটো হাত নিজের দুই হাতে চেপে ধরল। পরম বিস্ময়ে প্রতুল দেখল ওর কপালের সেই রেখাটা ফুটে উঠেছে, কোনো এক অসহনীয় অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ওর হাত দুটো কাঁপছে। বৈবাহিক জীবনের সাড়ে তিন বছর সে ওকে এমন অদ্ভুত বিব্রত অবস্থায় কখনও দেখে নি। সে ভাবছিল এর একমাত্র কারণ কি হতে পারে। মিনতি তাকে জিজ্ঞেস করল, "নিজের স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করাটা তোমার কর্তব্য নয়?"

"কেন নয়, নিশ্চয়ই।"

"তাহলে আমাকে বলতে হবে তোমার বাইরে কি কাজ ছিল?"

"আমার বাইরে যাওয়ার সঙ্গে তোমার সম্মানের সম্পর্ক কি?"

"সম্পর্ক আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি। বল, কি কাজ ছিল?"

নিজের স্ত্রীকে মিথ্যে কথা বলার সাহস আর প্রতুলের থাকল না। সত্যি কথা না বললেই মিনতি কিছু একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাবে বলে তার ধারণা হল।

"তুমি সব কথা অত গভীর ভাবে ধরবে না। বাইরে আমার বিশেষ কাজ ছিল।"

"বেরিয়ে গিয়েছিলে কি কারণে?"

"তোমরা দুজনে ভাল করে কথা বলতে পারবে বলে।"

"একজন এক দিনের চেনা লোকের সঙ্গে আমাকে এভাবে কথা বলার সুবিধে দেবার উদ্দেশ্যটা কি?"

"ধরণী চৌধুরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে বলে আমি জানি।"

মিনতির স্বর উচ্চগ্রামে উঠেছিল।

"ধরণী চৌধুরী যদি আমাকে সেই অবস্থায় অপমান করে তাহলে তোমাকে কোন—"

মিনতির হাতের মুঠি শিথিল হয়ে এল এবং কাছের বিছানায় মাথা নীচু করে সে পড়ে গেল। একটু পরে হতভম্ব নিথর প্রতুল ওর গুমরানো কান্নার স্বর শুনতে পেল।

প্রতুলের ধারণা হল, মিনতি সামান্য একটা ব্যাপারকে বড় করে তুলছে। আজকের এই জটিল সংসারে নারীর পুরুষের সামনে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নারী আজ এত দুর্বল হলে কি করে চলবে?

প্রতুল বিছানায় এসে মিনতির কাছে বসল। কিন্তু সে স্বামীর সেই সান্নিধ্যের প্রতি সাড়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন দেখাল না। প্রতুল জানে মিনতি ওর কথা শুনতে এখন একেবারে প্রস্তুত নয়, তবু যেটুকু কথা না বললে নয় সেইটুকুই মিনতির দিকে তাকিয়ে সে বলছিল, "ধরণী চৌধুরী একজন ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে বসে দুটো কথা বলতে পাওয়া আমাদের মতো লোকের বৌ-এর পক্ষে ভাগ্যের কথা। তুমি নিজে আই.এ. পাশ করেছিলে, একজন পুরুষের সঙ্গে একা বসে কথা বলার সাহস নেই বললে কে বিশ্বাস করবে? আমার প্রমোশনের ব্যাপারটা তুমি যত সহজ বলে ভাবছ তত সহজ নয়। অনেক বছরের মাথায় প্রমোশন মাত্র একবার আসে, তার জন্যে অফিসের যিনি হেড্ তাঁকে একটু ভাল কথা তুমি আমার বৌ হয়ে কেন শোনাতে পারবে না, কেন তাঁর সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য বসে থাকতে পারবে না? এক টাকা মাইনে বাড়ানোর জন্য আমাকে কত কি করতে হয় তুমি ঘরে বসে তার কি বুঝবে?"

......কান্না বন্ধ করে মিনতি প্রত্যেকটা কথা শুনে যাচ্ছিল এবং প্রতিটি শব্দ যেন ওর হৃদয়ে মর্মান্তিক আঘাত হানছিল। কথাগুলো বলে সেখান থেকে উঠে না গেলে সে এবারও প্রতুলের হাত দুটি নিজের হাতে চেপে ধরে প্রত্যেকটা শব্দের উত্তর...চিৎকার করে শুনিয়ে দিত।

গেটের শব্দ হল দারুণ ভাবে। কত বেগে প্রতুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল— শব্দ শুনে তা অনুমান করতে পারল মিনতি।

সে দাঁড়াল এবার। কান্না আর ফোঁসফোসানির স্থান অধিকার করল এবার দৃঢ়তা ও প্রত্যয়। প্রতুলের প্রতিটি কথা ওর হৃদয়ে বারে বারে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হল এবং মুহূর্তে মুহূর্তে ওর হৃদয় পরিপূর্ণ হল ক্রোধ ও অভিমানে। একটা সন্ধ্যার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বামী হিসেবে প্রতুলের আসল চেহারাটা ওর চোখে ধরা পড়ে গেল। মিনতি কখনো ভাবেনি প্রতুল এত দুর্বল পদার্থ দিয়ে নির্মিত, কখনো ভাবেনি অফিসের একটা প্রমোশনের জন্য নিজের স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব এবং সবচেয়ে বড় কথা নারীত্ব বিসর্জন দিতে সে উদ্যত হতে পারবে। কোনোদিন ভাবে নি, সেটাই আজ সত্য হয়ে উঠল এবং দিন অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়ীতে আরও কত করুণতর পরিস্থিতির সম্মুখীন ওকে হতে হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মিনতি ভাবল, তোমার অতিথিকে আমার অতিথি বলে ভাবতে আমার কোনো কার্পণ্য নেই, তোমার এবং আমার মধ্যে কোনো বিভেদ নেই বলেই আজ সাড়ে তিন বছর ধরে আমি ভেবে আসছি এবং শুধু ভাবাই নয়, আমাদের দুজনের সম্পর্ক মধুর করে রাখতে আমি দিনরাত মুহূর্তে মুহূর্তে মনেপ্রাণে চেষ্টা করে আসছি। তুমি আমাকে যা দিতে পার না তা আমি কখনো চাইনি। যে সাজে তুমি আমাকে কখনো সাজাতে পারবে না, সেই সাজের কথা আমি তোমাকে কখনো বলিনি। এমন একটা দিনের কথা তুমি বলতে পারবে কি যেদিন আমি তোমার মনে কোনোভাবে আঘাত দেবার চেষ্টা করেছি? এমন কি কোনোদিন একটা কড়া কথাও বলিনি এবং সহজ সরল ভাবে তোমার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছি বলেই তুমি আমাকে আজ গ্লানির চরম একটা মুহূর্তে নিয়ে গেলে। নিজের আদরের বৌকে অন্যের আনন্দের খোরাক হিসেবে তুলে ধরলে।

মিনতি পাশের ছোট ঘরে ঢুকল এবং জোরে দরজাটা বন্ধ করতে করতে তার ধারণা হল যেন একটা সংসারের স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয়ের মিলনের দরজাও এভাবে আজ বন্ধ হয়ে গেল।

রাতে সে কয়েক বারই প্রতুলের কথা শুনেছিল, দরজায় তার হাতের টোকাও পড়েছিল কয়েক বার। কিন্তু স্বামীর কথায় পুলকিত হত তার যে হৃদয়, সে হৃদয়ের

মৃত্যু ঘটেছে। আজই সন্ধ্যায় মনের মিলনের যে দরজা পরমাশ্চর্য এক পরিস্থিতিতে রুদ্ধ হয়ে গেল, তাকে মুক্ত করার সাহস নেই তার।

প্রাণস্পর্শী বেদনায় শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে সারারাত নিদ্রাহীন ভাবে অতিবাহিত করে ভোর হবার আগে মিনতি বাইরে চলে এল। পশ্চিমের দিক থেকে পূর্বে বাতাস বইছিল ধীরে ধীরে, সেই বাতাস যেন ওর শরীরে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করল। উপরের দিকে তাকাল সে। সুনির্মল আকাশে মহিমামণ্ডিত ভাবে অজস্র তারা জ্বলছে, অনেক তারা যেন উড়ে উড়ে এদিকে থেকে ওদিকে যাচ্ছে। পৃথিবীর কারুণ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, হৃদয়হীনতার জ্বলন্ত সাক্ষী যেন এই তারকারাশি। দুর্বল মানুষের কি ক্ষমতা আছে তার সনাতন সৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার।

মিনতি জোরে নিঃশ্বাস নিল কয়েক বার। সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন হৃদয়ের প্রত্যয় ও সততার বোধ সরল হয়ে উঠল। এবার সে ভিতরে ঢুকল এবং বিছানার পড়া মাত্র ঘুমে তার চোখ বুজে গেল।

সকালে আগের মতই সে প্রতুলকে চা-জলখাবার নিজের হাতে বাড়িয়ে দিল। প্রতুল মাথা তুলে তাকাল তার চোখের দিকে। কিন্তু সে কথা বলার কারণ ও অনুপ্রেরণা কোনটাই খুঁজে পেল না।

অফিসে যাওয়ার আগে খাওয়ার টেবিলে বসে প্রতুল জিজ্ঞেস করল, "আমার কি বড় অপরাধ হয়েছে বলে তুমি ভাবছ?"

মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন না করে মিনতি উত্তর দিল, "আমি কোনোদিন মুখ খুলে কোনো কথার প্রতিবাদ করিনি বলে, আর অন্য অনেকের মত চিৎকার করিনি বলে তুমি ভেবেছিলে আমার কোনো নিজস্বতা বা ব্যক্তিত্ব নেই। নারী সরল হলেই যে তার হৃদয়ে কিছু থাকবে না এই কথা ভাবাটা স্বামীর পক্ষে বড় অপরাধ নয়?"

"আমি তো এখনও মরিনি।"

"আমিও মরিনি, কিন্তু ভালবাসার মর্যাদার মৃত্যু হয়নি বলে বলতে পার?"

প্রতুল দেখল সেই দুটি চোখ। যে চোখের দৃষ্টি নিয়ে আগের দিন রাতে মিনতি তার দুই হাত বজ্র মুষ্টিতে খামচে ধরেছিল। এর পর আর কথা বলার সাহস তার থাকল না।

দুপুরে মিনতি একবার ভাবল, কী হবে মিছিমিছি এই বাড়ীতে একজন নিষ্ঠুর পুরুষের পত্নী হিসাবে বেঁচে থেকে? কী হবে খামাকা হৃদয়ে দুর্ভাগ্য ও ভাঙনের ধিকিধিকি আগুন নিয়ে বাইরে সতীর অভিনয় করে? তোমার পত্নীত্বের যোগ্য মর্যাদাই বা কে দেবে?

অফিসের প্রমোশনের চেয়ে একজন মহিলার প্রেম ও মর্যদা যে মহত্তর সেটা উপলব্ধি করবে কে এই বাড়ীতে?

সে জানে, এখানে সে অনিমন্ত্রিত। সাড়ে তিন বছরের এই বাড়ী প্রকৃত পক্ষে ওর বাড়ী নয়, এটা একটা অতিথিশালা মাত্র। তুমি এখানে না থাকলেও কারো কোনো ক্ষতি হবে না, অফিসে কেউ প্রমোশন না পেয়ে থাকবে না।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে সেই সিদ্ধান্ত আবার পরিবর্তন করে। প্রতুলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজায় পা দিয়ে আবার কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে সে ভেতরে ফিরে যায়।

এক সপ্তাহও হয়নি, প্রতুল তাকে খবরটা দিল ওর প্রমোশন না হওয়ার খবর। খবরটা দেওয়ার সময় তার মুখে যে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, তার দিকে সে অবাক ও অদ্ভুত ভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। চেয়ে চেয়ে কপালের শিরা ফুলে উঠেছে বলে মিনতির অনুমান হচ্ছিল। কাল্পনিক এক কাজের অজুহাতে বেরিয়ে গিয়ে ধরণী চৌধুরীর সঙ্গে ওকে বসিয়ে সে যে দুঃখ পায়নি সেই দুঃখ যেন আজ প্রমোশন না পাওয়ার খবর পাওয়ার দিনে সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করল। তার মানে, সে ভাবল, অন্য পুরুষের হাতে স্ত্রীর অপমান হওয়াটা কোনো ব্যাপারই না—আসল কথা হল প্রমোশন।

একটু দূর থেকে সে চেয়ারে বসে থাকা প্রতুলের দিকে ফের একবার তাকাল। সে কি ভাবছে মিনতির মনের কোণে তাই যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল। প্রতুল ভাবছিল, সেদিন সন্ধ্যায় মিনতির ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলে ধরণী চৌধুরী এমন একটা নির্মম কাজ কখনো করত না।

বারে বারে মিনতির মনে পড়েছিল, প্রতুলের একটা কথা। 'একটা টাকা মাইনে বাড়ানোর জন্যে আমাকে কত কি করতে হয় ঘরে বসে তুমি তা কি করে জানবে? সে ভাবল, একটা টাকা রোজগার করা কি সত্যিই এত কষ্টকর? একটা টাকা উপার্জন করার জন্য কি নিজের যোগ্যতার চেয়ে আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়? নিজের পত্নীর মধ্যে প্রেমের গ্লানি সৃষ্টি না করে টাকা উপার্জন করা এবং অফিসে প্রমোশন পাওয়া কোনো দিনই সম্ভব নয় কি?

মিনতির মন আর হৃদয় অধিকতর দৃঢ় হল। নিজের যোগ্যতায় কারো কাছে আত্মসমর্পণ না করে দুটো টাকা রোজগার করা সত্যিই কি অসম্ভব?

সিদ্ধান্তে আসতে অবশ্য পনের দিনের প্রায়োজন হয়েছিল। সকালে চায়ের টেবিলে বসে মিনতি প্রতুলকে শুধুমাত্র জানাবার জন্যই বলল, "বাড়ীতে একা থাকলে বড় বিরক্তি লাগে। একটা চাকরী করব বলে ভাবছি।"

কথাগুলোর অর্থ হয়তো সহজ, কিন্তু সে মিনতির দিকে তাকিয়ে রইল আশ্চর্য ভঙ্গিতে।

মিনতি আবার বলল, "একটা টাকা উপার্জন করতে তোমার বড় কষ্ট হয়, আমিও সেই কষ্ট করতে পারব মনে হচ্ছে।"

"আমার সম্মান?"

"সম্মান মানে?"

"বাড়ীর বৌ অফিসে অন্যের সঙ্গে বসে চাকরি করলে আমার সম্মান নষ্ট হবে না?"

মিনতির এমন বিকট হাসি পেয়েছিল, যা প্রকাশ পেলে সে নিজেই স্তব্ধ হয়ে যেত। জোর করে নিজে সে হাসি বন্ধ করল।

প্রথম বিভাগে আই.এ. পাশ করার ব্যাপারটা যে একদিন ওর জীবনের জন্য এত মূল্যবান হবে তা এতদিন সে উপলব্ধি করতে পারেনি। যুবতী হওয়ার সময় মিনতির দিদিমা ওকে বলেছিল, "মেয়েদের স্বামীর চেয়ে বড় গুরু আর কেউ নেই। স্বামীর চেয়ে বড় ভাগ্যও আর নেই।"

দিদিমা কবে পরপারের ডাক শুনে চলে গেছেন। বেঁচে থাকতে দিদিমা হয়তো স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেননি, তাঁর চির আদরের নাতনীকে স্বামীর প্রেম ও আদর থেকে বঞ্চিত হয়ে সামান্য কাগজের ইণ্টারমিডিয়েট সার্টিফিকেট বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর দিদিমা, তোমার আদরের মিনু তোমার কল্পনামতো জীবনটা সাজাতে পারল না।

পরদিন এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে হাজির হল মিনতি। নিজ হাতে দরখাস্ত করল। পনের দিন পর পরীক্ষার জন্য তৈরী হল সে। চার বছরের মেয়ের মতো গভীর একাগ্রতায় সে রাতের ঘুম নষ্ট করে বই পড়ল, সাধারণ জ্ঞানের নোট মুখস্ত করল। একদিন পরীক্ষার খবর বেরোল। তারপর একদিন দুপুরে স্বামীকে ভাত-টাত দিয়ে, নিজেও খেয়ে বেরিয়ে গেল।

মিনতি চাকরী করছে, ওর মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই অবাক হল। মা ও বোন এসেছিল ওকে দেখতে। ম্লান হেসে সে বলল, বাড়ীতে একা একা থাকলে বড় বিরক্তি লাগে—এরকম ভাবে থাকলে আমি খুব তাড়াতাড়ি বুড়ি হয়ে যাব।

মা অনুভব করলেন সন্তানহীন মেয়ের মনের অশান্তি। কিন্তু ওর সেই...হাসির অন্তরালে যে করুণতর অধ্যায় নির্লিপ্তভাবে শুয়ে আছে, মায়ের অন্তর তা অনুভব করতে পারল না।

মিনতি অফিসে কাজ করতে আরম্ভ করল গভীর একাগ্রতা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে। ওর জন্যে যেন কাজই ধন আর কাজই স্বর্গ। ওর নিজেরই ধারণা হল, যে অনুপ্রেরণায় আজ সে অফিসে কাজ করে তা না করলে তাকে উন্মাদ করে তুলতে পারে। এর আগে অনভিজ্ঞ সে তা ধারণাও করতে পারে নি।

মাত্র একটা বছর, মিনতির জন্য যেন এটা মাত্র একটা মাস।

মিনতি রান্নাঘরে ছিল। টেবিলের উপর রাখা মিনতির নাম লেখা খোলা চিঠিটা

প্রতুল একবার পড়ল। তাতে লেখা রয়েছেঃ মিনতির অফিসের কাজে অতীব সন্তুষ্ট হয়ে ওকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে—সঙ্গে তিনটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট।

একটা বিদ্বেষ মেশানো ক্ষীণ হাসি হেসে প্রতুল চিঠিটা আগের জায়গায় রেখে দিল। চিঠিতে লেখা কথাগুলো যে তার জন্য কিছুই নয়, সেটা সে নিজের মনকে বোঝাতে চাইছিল। কিন্তু পারল না।

রাতে ভাত খেয়ে প্রতুল ভেবেছিল বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুম আসবে, কিন্তু এল না। গিলতে চাইছিল, পারল না, গলায় কি যেন একটা লেগে আছে। নিশ্বাস রূদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে যেন। কপালে হাত দিয়ে অনুমান করল ঘামের কণিকা। মিনতির দুটো হাত যেন তাকে এক প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে চেপে ধরতে চাইছে। পাশের ছোট ঘরটাতে মিনতি তখন পরম শান্তি ও নির্ভয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন। ❐

**নিরুপমা বরগোহাঞি**

জন্ম 1932, গুয়াহাটি। অসমীয়া এবং ইংরেজি দু' ভাষাতেই এম. এ. ডিগ্রী নেওয়ার পর ইনি 'সাপ্তাহিক নীলাচল'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। তিনটি ছোটগল্প সংকলন ও পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

# ক্ষণিকা

প্রথমে একটা হাই তোলে, তারপর আড়মোড়া ভেঙে বন্দনা বলে উঠল—"অসহ্য লাগছে। কবে যে গাড়িখানা গ্যারেজ থেকে বেরুবে। এই দশ দিন যেন দশ যুগ বলে মনে হচ্ছে আমার। কবে যে এই শ্মশান থেকে বেরিয়ে মানুষের রাজ্যে ঘুরে আসতে পারব?"

বন্দনার বিরক্তিসূচক মন্তব্যগুলো শুনে তার স্বামী তারক দত্ত প্রথমে মুখের সিগারেটে খুব দ্রুত কয়েকটা টান দিল, তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল—"ঘরে বসে থাকতে এত বিরক্ত লাগলে ক্যাম্পাসের মধ্যে কারো বাড়িতেও তো ঘুরে আসতে পার।"

বন্দনা মুখখানা বিকৃত করে বলল—"এই দশ দিনে সে কাজটা কি বাদ দিয়েছি নাকি? তোমাদের প্রোফেসারদের কজন বিয়ে করেছে, যে তাদের বাড়িতে বেড়িয়ে দশটা দিন কাটানো যাবে? গোটা ক্যাম্পাসে যাওয়ার মতো বাড়ি আছে মোট চারখানা, সেই বাড়িগুলোতে ক'বার করে যাওয়া যায়?'

স্ত্রীর কথার উত্তরে তারক দত্ত আর কোনো কথা বলল না। বন্দনা সত্যি কথাই বলেছে। ক্যাম্পাসে মাত্র কয়েকজনই পরিবার নিয়ে বাস করে। এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি হয়েছে আজ দু'বছর হল। এখানে ইঞ্জিনিয়ার যারা কাজ করে, তাদের অধিকাংশই সদ্য পাশ করা তরুণ। তাকে নিয়ে মাত্র চারজন প্রোফেসার বিয়ে করেছে। ফলে ক্যাম্পাসটি আর তেমন জনপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। বিরাট বিরাট কোয়ার্টার, কিন্তু মেয়েদের কথাবার্তা আর শিশুদের কাকলিতে এ জায়গাটা ভরে উঠতে আরো কদিন সময় লাগবে।

তারক দত্ত বিয়ে করেছে মাত্র বছর খানেক হল। স্ত্রী বন্দনা গুয়াহাটি শহরের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই নগরের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে বড় হয়েছে। তাই বিয়ের পর যখন এখানে স্বামীর সঙ্গে থাকতে এল, তখন থেকেই জায়গাটা তার কাছে শ্মশানের মত মনে হচ্ছে। শ্মশানের মতই অখণ্ড নীরবতা এখানে সব সময় বিদ্যমান। এমন জায়গায় কদিনের জন্য বেড়াতে এলে কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সব সময় থাকতে হলে একেবারে অসহ্য লাগে, বিশেষ করে যারা বন্দনার মত কোলাহল-মুখর শহর থেকে এসেছে। শহর থেকে তাদের ক্যাম্পাসটা চার মাইল দূর। কলেজের নিজস্ব জমির সীমানা খুবই বিস্তৃত। একদিকে একটু দূরে পাহাড়, অন্য

তিন দিকে শহরে যাওয়ার পাকা সিধা রাস্তা, বিরাট বিস্তৃত একটা মাঠ, আর একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গ্রামের সীমারেখা।

নূতন যারা বেড়াতে আসে, তাদের কিন্তু জায়গাটা পছন্দ হয়। এমন নিরালা—বেশ ভাল লাগে। কিন্তু বন্দনার কোনো কোনো সময় অসহ্য বোধ হয়। বন্দীশালায় থাকার মতো একটা অনুভূতি হয়।

সমাজ বলে কিছু নেই, এমন একটা জায়গায় মানুষ থাকতে পারে? অবশ্য প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশ তাকে খুব মুগ্ধ করে, কিন্তু তাকে একটু সময়ের জন্যই উপভোগ করা যায়, চিরজীবন তার মধ্যে কাটানো যায় না। অন্ততঃ বন্দনার মতো যারা সব সময় হৈ-হুলুস্থূলের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে, তাদের পক্ষে এমন নির্জন পরিবেশে জীবন কাটানো বড়ই কষ্টকর।

এরমধ্যে অবশ্য একটাই ভাল দিক রয়েছে, সব সময় ঘরে বসে থাকতে হয় না। তারকের গাড়ি একখানা হয়েছে, এবং স্বামী হিসাবে সে খুবই দরদী এবং সহানুভূতিশীল। বন্দনার কষ্ট সে সব সময়ই উপলব্ধি করে আর তার যাতে বিরক্তি না লাগে, সে জন্য প্রায়ই গাড়িতে করে তাকে শহরে ঘুরিয়ে আনে। কিন্তু আজ ক'দিন হল গাড়িখানা গ্যারেজে পড়ে রয়েছে, তাই বন্দনারও অশান্তির শেষ নেই। ঘরে বসে থেকে থেকে হাতেপায়ে খিল ধরে গেছে।

স্বামী স্ত্রী দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। তারক দত্ত একটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল, আর বন্দনা বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসে সামনের জনবিরল রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারক হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে কথা বলল, যেন হঠাৎ একটি ভাল কথা মনে পড়ে গেছে—"চল বন্দনা, আজ ঐ গ্রামটা থেকে ঘুরে আসি গে। এতদিন ধরেই যাই যাই করছি, যাওয়া কিন্তু হয়নি।"

—"ঠিক আছে, চল।" বন্দনা খুব উৎসাহ না দেখালেও আপত্তিও করল না। বাঁশঝাড়ে ঘেরা সেই গ্রামটি ঘুরে আসার জন্য বন্দনাই মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছে, আর তারকও তাতে সম্মতি জানিয়ে বলে এসেছে—"গ্রামখানা ঘুরে দেখতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে, যাব একদিন।" কিন্তু যাওয়ার কথাটা ইচ্ছা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, কাজে আর কিছু করা হয়ে ওঠে নি। অথচ আগ্রহ দুজনের কারোই কম ছিল না। কিন্তু কি যে হয়, বিকেল তো যথা নিয়মে প্রত্যহই আসে, তার অধিকাংশ দিনই তারক স্ত্রীকে নিয়ে শহরের দিকে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। আজ এতদিন পরে সেই ইচ্ছাটা বাস্তবে পরিণত হতে চলল।

"একটু শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শীতশীত করছে, একটা শাল গায়ে জড়িয়ে নাও।"—বন্দনার অন্য কোনো প্রসাধনের প্রয়োজন ছিল না, দীর্ঘ অপরাহ্নের অনেকটা সময়ই সুন্দরী বন্দনা নিজেকে সাজিয়েগুছিয়ে আরো সুন্দরী করে তুলতে এমনিতে ব্যয় করে। শাল নিয়ে বন্দনা দু'মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল।

চারদিকে তখন রাঙা রোদের প্লাবন নেমেছে। ফাল্গুন মাসের বিকালের মিষ্টি মধুর রোদ্দুর। মাঝে মাঝে শিরশিরে বাতাস এসে গায়ে শিহরণ তোলে।

—"বা, আজ বিকেলটা তো বড় সুন্দর করেছে।" কাঁচা রাস্তায় পা দিয়ে বন্দনা বলে।

—"হ্যাঁ, সত্যিই বড় সুন্দর লাগছে। বসন্তের বিকেলগুলো সুন্দর হয়ই। আমাদের মতো গাড়ি করে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা কিন্তু এই সময়গুলো উপভোগ করার সুযোগ পায় না।" একটু যেন আক্ষেপের সুরেই তারক বলে।

একটু আগে যদিও গাড়ি করে শহরে যাওয়ার সুযোগ না থাকার জন্যই বন্দনা হা-হুতাশ করছিল, কিন্তু এখন স্বামীর কথায় সায় দিয়ে বলল, "একদিক দিয়ে কথাটা সত্যি। গাড়িতে চড়ে চড়ে আমরা কিন্তু অনেক সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মিস্ করছি। এখনই দেখো তো, বিকালে রাঙা-রোদ পড়ে ঘাসগুলো কি আশ্চর্য সুন্দর রঙ পাল্টেছে, সেই ঘাসের উপর দিয়েই আমরা কিন্তু রোজ হাঁটছি। মাথার উপর আকাশ দেখো, মেঘের টুকরোগুলোর উপর লাল রোদ পড়ে কি অপূর্ব দেখাচ্ছে। সেই আকাশের উপর দিয়ে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়ে যাচ্ছে—গাড়িতে চেপে এই দৃশ্যগুলো কিন্তু উপভোগ করা যায় না।"

তারক দত্ত একটু শব্দ করেই হেসে উঠল—"একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমি যে আত্মহারা হয়ে যাই, সেটা আমার কাছে বেশ অসঙ্গতিপূর্ণ একটা ব্যাপার বলেই মনে হয়ে এসেছে এতদিন। কিন্তু তুমি এই বনবাসে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ, এই কথা এতক্ষণ ধরে বলে এখন আবার প্রকৃতির যে মুগ্ধ বর্ণনা দিচ্ছ, সেটাই কিন্তু আরো অসঙ্গতির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে বন্দনা—"

বন্দনা মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলে—"প্রকৃতি আমি তোমার চাইতে কম ভালবাসি না। কিন্তু সব সময় সমাজ-সংসার থেকে দূরে বনবাসে পড়ে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, বুঝেছো?—এই দেখো, আমরা গাঁয়ে প্রায় এসেই গেছি—এত কাছে! অথচ দেখো তো এত কাছের এত সুন্দর মায়াভরা প্রকৃতির মধ্যেকার এই জায়গাটিতে এতদিন পর্যন্ত আমাদের আসাই হয় নি"—বন্দনার গলায়ও আক্ষেপের সুর।

তারক অল্প হেসে বলল—"রবীন্দ্রনাথ তো এমনি বলেননি যে আমরা অনেক খরচপত্র করে অনেক দূরে যাই সুন্দর সব দৃশ্য দেখার জন্য, আর ঘরের কাছে একটি ঘাসের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দুর সৌন্দর্যটা আমরা চোখ মেলে তাকিয়েও দেখি না।"

বন্দনা তখন গাঁয়ে ঢোকার রাস্তায় পা দিয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে রাস্তা ধরে তারা এসেছে, সেটা ছিল কলেজের সার্বজনীন রাস্তা, বেশ বড়সড়। কিন্তু এখন

গাঁয়ের রাস্তায় পড়তেই মনে হল দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটি পদক্ষেপেই তারা সন্ধ্যার দেশে পৌঁছে গেছে। গাঁয়ের রাস্তার দু'পাশে ঘন বাঁশবন এমন আড়াল দিয়েছে যে দিনের আলো তাতে অল্পই ঢুকতে পারে। কিন্তু সে আঁধার ঠিক কালো আঁধার নয়, বাঁশের অজস্র পাতার জন্যই বোধহয় বন্দনার এই আঁধারটাকে বড় কোমল মায়াময় শ্যামলিমা মাখানো বলে মনে হল। বন্দনার তখন মনে পড়ে গেল কলেজে পড়া কীট্সের নাইটিংগেল পাখীর 'গ্রীন ডার্কনেসে' বিচরণের কথা। সাধারণতঃ মনের সব কথাই সে তারককে বলে ফেলে, কিন্তু এই পথে পা দেওয়ার পর তার নিঃসীম নীরবতাটা এতই ভাল লাগছিল যে কথা বলে তাকে ভাঙ্গতে আর ইচ্ছা হল না। মনটা যেন হঠাৎ মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু অদ্ভুত আঁধারের সেই পথটি খুব দীর্ঘ ছিল না। একটু পরেই তারা একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ল। রাস্তার অন্য পাশে গাঁয়ের ছোট ছোট খড়ো ঘর।

বন্দনারা গাঁয়ের ভেতরে ঢুকল।

এতক্ষণ পর নীরবতা ভেঙ্গে তারক দত্ত এবারে বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—"কেমন লাগছে বন্দনা?"

অল্প হেসে বন্দনা বলে—"বেশ ভাল লাগছে। এত জল ঢেলেও আমাদের সীজন ফ্লাওয়ারগুলো আর লনের ঘাসগুলো কি রকম শুকিয়ে গেছে দেখেছো তো। ফাল্গুনের রুক্ষতা বাগানের সব গাছগুলোতেই যেন ছাপ ফেলেছে। আর এখানকার গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, যত্ন নেই, কিছু নেই, তবু যেন সবুজের উৎসব লেগে গেছে। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে। এটা কি ফুলের গন্ধ আসছে? এমন মন মাতাল করা গন্ধ তো আগে কখনও পাই নি—"

বন্দনার কথাটা সত্যি—তারকও গ্রামটাতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফুলের অপর্যাপ্ত সুবাস পেয়েছিল। কিন্তু বন্দনার মত তার কাছে গন্ধটা অপরিচিত ছিল না, নাকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝেছিল যে গন্ধটা লেবুফুলের। এখন নামটা বন্দনাকে বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে উঠল, "কি আশ্চর্য, এত সাধারণ চেনা গন্ধ। গাঁগুলোর বোধহয় এটাই বৈশিষ্ট্য, চেনা-শোনা প্রত্যেকটা ছোট আর সাধারণ বস্তুও কি সুন্দর লাগে এখানে। এই খড়ের চালে পায়রা চরছে, কচি লাউ একটা ঝুলে আছে, নিকানো ঝকঝকে উঠানে বড় ছেলে একটার সঙ্গে বাচ্চা একটা খেলছে, বুড়ো মানুষ একজন দাওয়ায় বসে আছে—এই সব ছোট ছোট দৃশ্যই কি অপরূপ যে লাগছে তোমাকে কি বলব—"

কথা বলতে বলতে তারা দুজনে গ্রামের মাঝামাঝি এসে পড়েছিল। সামনে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। একটা গেছে গ্রামের ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলের দিকে, আর অন্যটা সামনের একটা ছোট জঙ্গলের দিকে।

তারক দাঁড়িয়ে পড়ল।

—"এবার কোনদিকে যাবে বন্দনা?"

—"বসতির দিকে যেতে আর ভাল লাগছে না, ছোট এই বনটার দিকে এগিয়ে দেখি তো বেরুনো যায় কি না।"

—"চল তা হলে।" তারক পা বাড়াল।

আবার শুরু হল শ্যামল আঁধারের সমারোহ। এবার দুদিকে শুধু বাঁশের ঝাড়ই ছিল না, ছিল আরো নানা ধরনের জংলা গাছের ঝোপ—দু'দিক থেকে সেগুলো রাস্তাটাকে এমন ভাবে চেপে ধরছে যে রাস্তাটা সংকীর্ণতর হয়ে গেছে। তারক আর বন্দনার গায়ের কাপড়ে গাছগুলোর স্পর্শ লাগছে। সবগুলি গাছে আবার বুনো ফুলের সমারোহ—গন্ধে চারদিক ম' ম' করছে। সূর্য তখন এমনিতেই আরো ঢলে পড়েছে। বাঁশ ঝাড়ের আড়াল থাকার জন্য রশ্মি আরো ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। তবুও পাতার ফাঁকে দু'একটা আলোর রেখা বন্য গাছগুলোর পাতার উপর এখানে সেখানে ঠিকরে পড়ছিল। ঝিরঝির বাতাস তখনও বইছিল আর পাতাগুলোর উপর ম্লান রৌদ্রের সোনালী রেখাগুলোও যেন বাতাসের তালে তালে নাচছিল।

সেদিকে তাকিয়ে বন্দনার মনটা হঠাৎ আবেগে উথলে উঠল—গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে শুরু করল, "এই তো ভাল লেগেছিল, আলোয় নাচন পাতায় পাতায়।" রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা মাত্র কলি, কিন্তু তারকের মনে হল এই একটি কলিই যেন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সমগ্র বনানীকে ঝঙ্কৃত করে দিয়েছে। এতক্ষণ নিস্তব্ধ এই বনানী শুধুমাত্র একটা দুটো নাম না জানা পাখির কাকলিতেই মুখরিত ছিল, এখন বন্দনার গানের ঝঙ্কার তার সঙ্গে মিলে একটা অদ্ভুত মায়া বিছিয়ে দিয়েছে গোটা পরিবেশের উপর। এদিকে বাতাসের মৃদুমন্দ প্রবাহে বুনো ফুলের সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে।

তারক যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল—বাড়ি থেকে মাত্র এক ফার্লং দূরের এই গ্রামখানির কি এমন আরণ্যক সৌন্দর্য যে তাদের এমন আকুল করে তুলেছে?

বন্দনা তারকের দিকে তাকিয়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বলল—"একেবারে নন্দনকানন হয়ে উঠেছে, নয়?"

উত্তরে তারক ওমর খৈয়ামের একটি কবিতা আবৃত্তি করল।

বন্দনা কোনো কথা বলল না, তারকের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে লাগল।

হঠাৎ দু'দিকের বন শেষ হয়ে এল। দুজনেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল সম্মুখে ছোট্ট একটি সোনালী স্রোতস্বিনী। অস্তমিতপ্রায় সূর্যের রক্তিম রশ্মিগুলো নদীর ঢেউয়ের উপর পড়ে চিকিমিক করছে। ছোট্ট নদীটির জল স্বচ্ছ, গতি ম্রিয়মান, এদিকে বন, ওপারে অতি বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তর। বেশ দূরে একটা বড় বালুচর এবং তার ওদিকে একটা মাঠ। বালুচরটার এখানে সেখানে ঝাউগাছের ঝোপ,

তার পাতাগুলোও বাতাসের তালে তালে নাচছিল। ওপারের গাঁ থেকেই বোধহয় দুটো যুবতী মেয়ে নদী থেকে জল নিতে এসেছিল, এখন জলভরা কলস নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। দুজনকেই দূর থেকে সেলুলয়েডের ছবির মত দেখাচ্ছে। নাম না জানা পাখী দু-একটা চিৎকার করছে, তাতে নির্জন পরিবেশের অমোঘ প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করার চাইতে বেশি করে প্রকটই করে তুলছে। এতক্ষণে তারা নদীর একেবারে কাছে এসে পড়েছে। নদীর মুখোমুখি হতেই বন্দনা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—"দেখো কি সুন্দর নদী। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে।" খুব বেশি খুশী হলে বন্দনা এমনি করেই কথা বলে।

তারক বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আর তার মনটাও একটু উচ্ছল হয়ে উঠল। বন্দনা সত্যিই একখানা সুন্দর মুখের অধিকারী, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তারক তার মুখে অদৃশ্যপূর্ব এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্য আবিষ্কার করল যে তার অন্তর কি জানি এক নূতন আবেগে মণ্ডিত হয়ে উঠল। এই বন্দনা যেন তার প্রতিদিনের অতি পরিচিতা বন্দনা নয়, সে যেন কোনো এক অচিনপুরীর অপরিচিতা মোহময়ী নারী। তারক অবাক হয়ে গেল আর বন্দনার এই অপরিচিত সৌন্দর্যই তার মনে বিচিত্র এক আবেগের সৃষ্টি করল, নূতন আনন্দ আর পুলকে তার মনটা রঙ্গীন হয়ে উঠল। কিন্তু একটু পরেই তারকের মনে হল যে বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার অন্তরে কি যেন এক বিষাদের ছায়াপাত ঘটছে। তারক আরো একবার অবাক হল, তার মনটা হঠাৎ এমন করে গুটিয়ে গেল কেন?

তারক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল—বন্দনার মুখের যে আবেগমণ্ডিত ভাব তাকে নাড়া দিয়েছিল, তার আয়ু বড় ক্ষণস্থায়ী। একটু পরেই সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসবে আর সে আঁধার মুখের এই অপার্থিব সৌন্দর্যকে গ্রাস করে ফেলবে। দু'জনে তখন ঘরে ফিরে যাবে এবং সেখানে যে বন্দনাকে পাবে, সেই বন্দনার মুখে এই বেলাশেষের অস্তরবির রেখায় রাঙানো অপরূপ মায়াময় সৌন্দর্যের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না। সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতাই দস্যুর হিংস্রতায় সেই সৌন্দর্যকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। অবশ্য তারা দুজনে হয় তো আরো কোনো এক অপরাহ্নে, কোনো এক-ই বা কেন, যদি বন্দনার আজকের এই উৎসাহ অবশিষ্ট থাকে—হয়তো কাল বিকালেই অপরূপ সুন্দর এই নদীর পারে তারা বেড়াতে আসবে। তার পর দিনও আসবে হয়তো। কিন্তু তখনও কি আজকের মতই প্রকৃতির এই বিপুল অনির্বচনীয় সৌন্দর্য তোলপাড় করা আবেগমণ্ডিত হয়ে বন্দনার মুখে প্রতিফলিত হবে? না, তার আশা বোধহয় করা যায় না, তারক আপন মনেই মাথা নাড়ে। ধীরে ধীরে দিনগুলি বয়ে যাবে, মাঝে মাঝে এই নদীটির পারে বেড়াতে আসা হয়তো তাদের অভ্যাসে পরিণত হবে। তারপর? একদিন তারা আবিষ্কার করবে যে এখানে বেড়াতে এলে

বেশ ভাল লাগে যদিও বা, কিন্তু এর অভিনবত্ব কোন একদিন যেন হারিয়ে গেছে। সেদিন হয়তো দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার মতোই এই বসন্ত কালের বেলা বয়ে যাওয়ার রঙে রঙীন নদীটাও তার অনির্বচনীয়তা অনেকখানি হারিয়ে ফেলবে। বন্দনাও আর এই অপরূপ আবিষ্কারে উচ্ছসিত আর আবেগবিহ্বল হয়ে উঠবে না! ফলে আজ তার মুখের মধ্যে প্রকৃতির যে মায়াময় অদ্ভুত রূপের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি জীবনে আর কোনোদিনই ঘটবে না।

"এত তন্ময় হয়ে কি ভাবছো? ইঞ্জিনিয়ারত্ব ভুলে গিয়ে একটু সময়ের মধ্যেই দেখি কবি দার্শনিকের মতো আত্মভোলা হয়ে গেলে? অন্ধকার হয়ে আসছে, দেখছো না? বনের পথ, আমার গা এখনই একটু ছমছম করছে, তাড়াতাড়ি চল।"

বন্দনার কথা। একটু চমকে তারক স্ত্রীর দিকে ঘুরে তাকালো। বন্দনার কথাবার্তা অতি সহজ স্বাভাবিক। একটু আগেকার আবেগের কোনো সুরই তার মধ্যে বাজল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারক সহজ সুরে বলল—"চল।" তার মনের ভেতরে কিন্তু আর্তনাদ।

—একটু আগেকার সেই বন্দনা এত অল্প সময়ের মধ্যেই হারিয়ে গেল কোথায়? ❐

# হরির মা

**অতুলানন্দ গোস্বামী**

জন্ম 1935, কোকিলা আধার সত্র (যোরহাট)। স্কুলশিক্ষা যোরহাট, জে. বি. কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক। কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ট্যাক্স বিভাগের পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হন। 'হাম দে পুলর জোন' ও 'গল্প' নামক দুটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

মাঝের বারান্দায় মোড়াগুলো রয়েছে, সামনে সাজা পানের থালা, মা বসে পত্রিকায় চোখ বোলাচ্ছেন। বোঝা যায়, এই মাত্র অতিথি কেউ উঠে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম—"কেউ এসেছিল নাকি?" কাগজ থেকে মুখ না তুলেই মা বললেন—"হরির মা। এই মাত্র গেল।"

জায়গাটা শহরের কেন্দ্রেই বলা যায়। ট্রাঙ্ক রোডের পাশে কজন বিহারী মানুষের ঘর রয়েছে। পুরানো বস্তা কিনে তালি-টালি দিয়ে জোড়া দিয়ে বেচাই তাদের ব্যবসা। বাইরে ভেতরে সে ধরনের বস্তা কিছু জড়ো করা আছে। গরু বাছুর এখন নেই, কিন্তু তাদের নিয়মিত উপস্থিতি বা অবস্থিতির জন্যই জায়গাটা আরো দুর্গম হয়ে পড়েছে। ঘরগুলোর পাশ দিয়ে পেছনে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রাস্তার উপর দিয়ে ব্যাপারীদের বাসন-ধোওয়া ছাই মিশ্রিত জল সব সময়ই বয়ে যাচ্ছে। সেদিক দিয়ে এগিয়ে গেলে আরেকটা ঝুপড়ির মতো ঘর পাওয়া যায়। ছোট ঘর, কিন্তু সামনের ঘরগুলোর তুলনায় এই ঘরটা অনেক পরিচ্ছন্ন। পরিবেশটাও বেশ খোলামেলা। ঢোকার মুখে দু'টো পাতাবাহারের গাছ। বেড়ে গিয়ে প্রায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছে। সেই ঘরে নিতাই ড্রাইভার থাকে। অনেক দিন ধরেই আছে। নিতাই ড্রাইভারকে চেনে না, এমন লোক শহরে নেই বললেই চলে। কারণ শহরের প্রত্যেকের বাড়িতেই কোনো না কোনো সময়ে বিয়ে-থা বা অন্য উৎসব অনুষ্ঠান হয়েছে। নিজের বাড়িতে না হলেও পাশের বাড়িতে হয়েছে। সেই সমস্ত সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির বিশাল ট্যাঙ্কারটা নিয়ে জল আনে নিতাই ড্রাইভার। শহরের অনেক জায়গায় এখনও জলের পাইপ যায় নি, সেখানেও জলের গাড়ি নিয়ে যায় নিতাই ড্রাইভার।

নিতাই নিরীহ মানুষ। প্রয়োজন না হলে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। কোথাও যায়ও না। উৎসব-বাড়িতে জল দিতে গেলে ট্যাঙ্ক থেকে তা বাড়ির অন্য বড় বড় পাত্রে ভরে রাখা হয়। সেই কাজে যেটুকু সময় লাগে, সেই সময় যদি কেউ মনে করে নিতাইকে মাটির গ্লাসে করে চা আর অন্য কোনো কিছুতে করে একটু লুচি তরকারি দিয়ে যায়, তবে সে কোনো প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করে তা খেয়ে ওঠে।

নিতাই ড্রাইভারের বৌও যায় সে ধরনের উৎসব বাড়িতে। সে যায় ভিতর

বাড়িতে। মণ্ডপের নীচে বসতে লজ্জা পায়। অথচ পেছন দিকে যেখানে নিমন্ত্রিতদের পংক্তি বসেছে সেখানেও যেতে পারে না। কারো নজর পড়লে হয়তো ডেকে নিয়ে যাবে, খাবার ঘর খালি থাকলে সেখানে জলখাবার এনে দিয়ে বলবে, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।" নিতাই ড্রাইভারের স্ত্রী করুণ একটা হাসি হেসে দু-একখানা লুচি হয়তো বা খাবে, আর বাকীগুলো পুঁটলি একটায় বেঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাবে।

স্কুল থেকেই হরি আমার সহপাঠি। মৃণালও। তাই বলে তাদের সঙ্গে যে আমার গলাগলি ভাব ছিল তা কিন্তু নয়। তবুও দু'দিকের দুই সহপাঠির সঙ্গে স্বাভাবিক যেটুকু সৌহার্দ্য থাকা উচিত, সেটুকু আমার ছিল। হরি আর মৃণালের মধ্যে কিন্তু বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ হয় নি। এখন বুঝি, তার কারণ ছিল আমাদের তিনজনের মধ্যেকার সামাজিক ব্যবধান। আমরা মৃণালদের চাইতে বেশ নীচু পর্যায়ের মানুষ ছিলাম, হরিদের তুলনায় অবশ্য আমাদের অবস্থান ছিল একটু উঁচুতে। সমাজের অধিকাংশ মানুষই আমাদের স্তরের। সেই কারণে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার দরুনই মৃণালদের সঙ্গে ব্যবধান সত্বেও একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে আর গড়ে ওঠেও। হরিদের অসুবিধাটাও সেখানটায়-ই।

কলেজে দু'বছরের মত পড়ে মৃণাল কলেজ ছেড়ে দিল। মানুষ হওয়ার জন্য তার ডিগ্রীর প্রয়োজন নেই। পড়া ছেড়ে দিলেও তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়েছিল। বিভিন্ন সভা-সমিতি, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা প্রায়ই শরিক থাকতাম। হরি সেগুলোতে বড় একটা সামিল হত না। কাছে ভিড়ে পড়ার সুযোগ তার ছিল না।

নিতাই ড্রাইভার অতি কষ্টে তাকে কলেজের মাঝপথ অবধি টেনে তুলে শেষ পর্যন্ত আর পারল না। শেষে হরি নিজের পড়ার খরচপত্তরের দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই তুলে নিল। নিতাই ড্রাইভারের ছেলে বলে তার সঙ্কোচটা বরাবরই ছিল আর সে কারণে কারো বাড়িতে বড় একটা যেত না। আমাদের বাড়ি ছাড়া সহপাঠিদের বাড়িতে পর্যন্ত নয়। সে আর যেত 'বীণাপানি মেসে'। সেখানে বাইরের ছেলেরা থাকত, তারা হরিকে অস্পৃশ্য ভাবত না। মা তাকে স্নেহ করতেন, তাই আমাদের বাড়িতে সে আসত। মায়ের এই স্নেহে তার পুত্রের কোনো অবদান ছিল কি না, সে বিশ্লেষণ কখনও করি নি। অন্য বন্ধুরা যেমন আসা যাওয়া করত, হরিও ঠিক তেমনি এসেছিল। অবশ্য তার আসা যাওয়াটা ছিল একটু ঘনঘন। আমরা দুজনে যখন বি.এ. পরীক্ষা দেব, সে সময়ে হরির উপর অনেকের নজর পড়েছিল এই কারণে যে নিতাই ড্রাইভারের ছেলে বি.এ. পরীক্ষা দিতে চলেছে। হরির প্রস্তাব অনুসারেই আমরা দুজনে কিছুদিন এক সঙ্গে বসে পড়েছিলাম। বেশির ভাগ দিনই আমাদের বাড়িতে। কখনও কখনও হরিদের বাড়িতেও। প্রথম প্রথম

তাদের বাড়িতে গেলে নিতাই ড্রাইভারের বৌ বড় উচ্ছাস দেখাত। শেষের দিকে অবশ্য আমাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করত।

দুজনেই পাশ করলাম। বি.এ. পাশ করার পর হরির মুখে একটা নূতন দীপ্তি দেখা যেত। নিতাই ড্রাইভারের ছেলে বি.এ. পাশ করেছে, সেটা শহরে একটা বড় খবরও হয়ে উঠল। কেউ বললে নিতাই ড্রাইভার শুধু মাত্র একটু হেসে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করত। উপযাচক হয়ে অনেকেই উপদেশ দিলেন, পারলে হরিকে আরো পড়াতে। নিতাই কিছু না বলে তাতেও সেই হাসিই হাসে। হরির ডিগ্রী পাওয়ার কথাটা বোধহয় নিতাই পুরো বাস্তব ঘটনা বলে মনে করত না সব সময়। কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হতো। মৃণালের বাবা একদিন নিতাইকে আটকালেন। আটকানোর দরকার ছিল না, তাঁকে দেখলেই নিতাই ইদানিং কালে তার গাড়ির বেগ কমিয়ে দিত। সেদিনও একটু দাঁড়িয়ে মৃণালের বাবাকে নমস্কার জানিয়েছিল। মৃণালের বাবা প্রশ্ন করেন—"কিরে, তোর ছেলে নাকি বি.এ.পাশ করল?" উত্তরে নিতাই আবার সেই হাসিটা হাসল। "খুব ভাল কথা। বড় আনন্দ হল"—মৃণালের বাবা বললেন। নিতাই খুশিতে ডগোমগো।—"এখন কোথাও একটা মাস্টারি-টাস্টারিতে ঢুকিয়ে দে", মৃণালের বাবা পরামর্শ দেন। যেন মাস্টারি আর ড্রাইভারি বা সমজাতীয় কাজে কোনো তফাৎ নেই। নিতাই মুখে কিছু বলল না, মাথার ভঙ্গিতে সম্মতিসূচক একটা ভঙ্গি করে হাসি মুখে চলে গেল।

মাস্টারি নিতে হল আমাকেই। ভাইগুলোর দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ার দরুন চাকুরি খুঁজতে হল। হরি কিন্তু অসীম সাহসে একদিন গুয়াহাটি পাড়ি দিল। এম. এ. ক্লাশে নাম লেখাল।

পরীক্ষার ফল বেরুবার পর মা একদিন হরিকে বলেছিলেন তার মাকে আমাদের বাড়িতে একদিন নিয়ে আসার জন্য। সেই আমন্ত্রণে নিতাই ড্রাইভারের বৌ আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিল। দেখা সাক্ষাতে কেউ এলে মা যেমন মাঝের বারান্দায় পানের থালা নিয়ে বসেন, হরির মাকে নিয়েও তেমনি বসেছিলেন। শহরের সমাজে এই ধরনের সম্মান বোধহয় নিতাই ড্রাইভারের বৌ এই প্রথম পেল। মা তাকে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বসে গল্প করছিলেন, যদিও সংস্কারের বশেই তাকে 'আপনি' সম্ভাষণ করতে পারেন নি। মায়ের স্তরের মানুষ কেউ তাকে 'আপনি' বলে নি, বলা সম্ভব নয়।

আমাদের সংস্পর্শে নিতাই ড্রাইভারের বৌ বোধহয় একটা নূতন সম্মান পেল। অবশ্য তার মূলে ছিল হরির বি.এ. পাশ করার খবরটা। সে যে বি. এ. পাশ করেই থেমে যায় নি, এম. এ. পড়তেও গেছে, সেই খবরটাও।

ইতিমধ্যে আরেকটা আনন্দের অভিজ্ঞতা হল, মাও শুনে হাসলেন। নিতাই ড্রাইভারের বৌ এখন হরির মা হয়ে গেছে। কথাটা প্রথমে শুনি উকিলানী মাসীর

মুখে। আমাদের বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় একদিন ওকে উকিলানী মাসী বোধহয় দেখেছিলেন। বিকালে বেরিয়ে ফিরছি, আটকে জিজ্ঞেস করলেন—"কে বেরিয়ে গেল তোমাদের বাড়ি থেকে? হরির মা নাকি?"

হরি গুয়াহাটিতে একটা রাতের চাকুরি যোগাড় করে নিল। আমাকে লিখে জানাল। তাতে সে গুয়াহাটিতে দু'বছর ভাল ভাবেই চালাতে পারবে। আমি খুব উৎসাহ দিয়ে জবাব দিলাম। চিঠিতে মার কথা একটু জানিয়ে দিলে সে খুব উৎসাহ পায়, মায়ের উপর তার বড় শ্রদ্ধা। আর সেই শ্রদ্ধাকে সম্মান করে আমিও তার মায়ের খবর-তালাসি করি। তাতে আমাদের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। হরিরমাও কখনও কখনও আমাদের সমাজের মানুষের খবর-টবর নিতেন। তাঁকে যে আর বেশিদিন নিতাই ড্রাইভারের বৌ হয়ে থাকতে হবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আমার ভাইদের পরীক্ষার কাগজপত্রগুলি ইউনিভার্সিটি থেকে হরিই খবর করে পাঠিয়েছিল। ফল বেরুনোর পর টেলিগ্রামও করেছিল। আমি বি.টি. পড়তে চাই জেনে সে এবিষয়ে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে জানিয়েছিল। মধ্যে একবার এসে সে বোনকে এম-ই স্কুল থেকে হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে গেল।

নিতাই ড্রাইভার তার আগের চাকুরি একই ভাবে করছে। মুখের সেই নীরব হাসিটিও রয়েছে। মৃণালের বাবা একদিন ঠাট্টা করে বললেন, "তুই গাড়ি চালানোটা ছেড়ে দে। ছেলে প্রোফেসর হয়ে আসছে, তুই কি ড্রাইভার হয়েই থাকবি?" নিতাই কিছু না বলে আবার হাসল।

গরমের বন্ধে কদিনের জন্য এসেও হরি নিত্যই আমাদের বাড়িতে একবার আসত। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কোঠা একটা বাড়াল, বাড়ি ঢোকার রাস্তাটা সংস্কার করাল। আর মিউনিসিপ্যালিটিতে দরখাস্ত করল তার বাবাকে যেন ড্রাইভার থেকে ট্যাক্স দারোগা করে প্রমোশন দেওয়া হয়।

আমাদের বাড়িতে হরিকে নিয়ে আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। খুব বেশি উচ্ছাস না দেখালেও হরির উন্নতিতে বাড়ির সবাই যে খুশি তা বোঝা যায়। আমি ভাবি, হরি যদি এখানেই একটা প্রোফেসারি পায় তো সব চাইতে ভাল হয়। হরি যে পাশ করবেই, তাও এক বারেই, সেই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

একটা গরীব ঘরের ছেলে যে জীবনের কোন পথ দিয়ে কি ভাবে শেষ পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো পর্যায়ে পৌঁচায় সে বিষয়ে শহরের চিন্তার সময় নেই। তার আপ্রাণ চেষ্টা প্রথমে কারো নজরেই পড়ে না। নিতাই ড্রাইভারের মত একটা মানুষের ছেলে পড়ছে কি পড়ছে না, সে খবর করার প্রয়োজন কেউ বোধ করে নি। কিন্তু বি.এ. পাশের খবর বেরুনোর পর দেখা গেল অনেকেরই চোখ যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। খবরটাতে কেউ যে খারাপ পেয়েছে, তা নয়। কিন্তু ভাবখানা,

যেন যা হওয়ার নয়, তাই ঘটে গেল। সবাই আলোচনা করল আর ছেলেটার মঙ্গল কামনা করল। আর তারই ফলে নিতাই ড্রাইভারের বৌ 'হরির মা' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন।

হরি যদি পাশ করে আসে, আর এখানকার কলেজে একটা কাজ পায়, তবে তাদের জীবনটাই পাল্টে যাবে। নিতাইকে ড্রাইভারি কেন, ট্যাক্স দারোগার কাজও না করলে চলবে তখন। আর উৎসব বাড়িতে জলের গাড়িতে এক গ্লাস চা এগিয়ে দেওয়ারও প্রয়োজন তখন থাকবে না। আর তার স্ত্রীকেও আর ভেতর বাড়িতে তাড়াহুড়ো করে একা একা জলযোগ সেরে আসতে হবে না। সামিয়ানার তলে অন্য মহিলাদের মধ্যে হরির মা বা হরি প্রোফেসরের মা হিসাবে তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এ ধরনের কথা-বার্তায় আমাদের বাড়ির সবাই উৎসাহ ভরে যোগ দেয়।

হরির মায়ের চোখে মুখে নূতন আশার আলো ঝলক দেয়। আগের সঙ্কোচ সম্পূর্ণ ঘোচেনি, কিন্তু আমাদের বাড়িতে এলে তাঁর সঙ্কোচটুকুর প্রায় সমস্তই অন্তর্হিত হতে দেখতাম। উকিলানী মাসীও একদিন আমাদের বাড়িতে হরির মাকে পেয়ে বেশ সুন্দর করেই কথা বলছেন দেখলাম। তবুও মাকে যখন বললাম একদিন হরিদের বাড়িতে গিয়ে বেড়িয়ে আসতে, মা কিন্তু তাতে রাজি হলেন না। এইটুকু সংস্কার আমরা এখনও কাটাতে পারিনি দেখলাম।

হরি যে দু'বছর গুয়াহাটিতে ছিল, সে দু'বছরে আমাদের শহরের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক নূতন অফিস হয়েছে, নূতন সব ব্যবসা গজিয়েছে, তার সূত্র ধরে নূতন মানুষও এসেছে অনেক। তিন বছর আগে যে লাইব্রেরী হলের কাজ শুরু হয়েছিল, তা শেষ হয়েছে। কলেজের অডিটোরিয়ামটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাদের স্কুলে সায়েন্স বিল্ডিং-ও একটা হল। এদিকে গুয়াহাটিতে হরির কোর্স শেষ হয়েছে, পরীক্ষার দু'তিন মাস সময় মাত্র বাকি।

আমি ওকে চিঠিপত্র লিখি। আগের মত নিয়মিত জবাব কিন্তু পাই না। তাতে আমার আক্ষেপ নেই। সে যে কত কষ্ট করে পড়ছে, তা তো আমি জানি। কখনও চিঠি দিলেও তাতে দু'তিনটা ছত্র লেখা থাকে। তাতেও আমি আশ্চর্য হইনি, যদিও তার লেখাতে ভাষার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলাম। তাকে লিখলাম টাকা-পয়সার অভাব হলে যেন আমাকে জানায়, তবুও পরীক্ষাটা ভাল করে দেওয়া চাই। আমার একটা ভুল ধারণা হয়েছিল বোধহয় টাকা-পয়সার চিন্তার দরুন তার চিঠির ভাষার এমন পরিবর্তন ঘটেছে।

এরমধ্যে হঠাৎ হরি একদিন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমি অবাক হলাম। আমি জানি যে পরীক্ষার আর মাত্র দশ দিনের মত বাকি আছে। দাড়ি গোঁফ কদিন কাটেনি মনে হল, তাতে অবশ্য অবাক হইনি, অনেক ছেলেই পরীক্ষার

কিছুদিন আগে থেকে দাড়ি কামানো বন্ধ করে দেয়। কি ব্যাপার-স্যাপার জিজ্ঞেস করার আগেই হরি নিজেই বলল—"বুঝেছো বাবুল, পরীক্ষাটা আর দিতে পারলাম না।" আমার মুখে প্রথমে কোনো কথা সরল না, তারপর বললাম "কেন?" ভাবলাম হয়তো পড়াশোনা ভাল করে করতে পারেনি, আগামী বছর দেবে। কিন্তু হরি অবিকল তার বাবার সেই বিশিষ্ট হাসিটি হেসে বলল—"এমনি দিলাম না আর কি।"

আমরা সবাই খুব আশ্চর্য হলাম। তার চিঠির ভাষার পরিবর্তনটা সেদিনই খুব বেশি করে মনে পড়ল। আমি আর মা দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম—দেখলাম আর কোনো কথাবার্তা না বলে হরি এক দৃষ্টে উঠানের নারজিফুলের গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রথম দিন কিছু বুঝতে পারি নি। যেদিন বুঝতে পারলাম সেদিন আমাদের বাড়ির সবার মন বেদনায় বিধুর। বিধাতা বোধহয় মানুষের আশা-আকাঙক্ষা চূর্ণ করতেই ভালবাসেন। সেই বিধাতার সঙ্গে একবার মোকাবিলা করতে ইচ্ছা হল আমার। নিতাই ড্রাইভারের অমলিন হাসিটার কথা মনে হল। হরির মায়ের আশায় উজ্জ্বল মুখের কথা মনে পড়ল। হরির বোনের নূতন কাপড়ের পোষাকটির কথা মনে পড়ল, আর মনে পড়ল হরির মায়ের সামাজিক স্বীকৃতির কথা।

হরির মাথা খারাপ হয়েছে।

কেন হল, কি ভাবে হল, কেউ বলতে পারে না। কিছু দিন পর আমি চেষ্টা করলাম তার চিকিৎসার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে। কিছুই করতে পারলাম না। নিতাই ড্রাইভার দু'একবার ডাক্তার ডেকে আনল। লাভ হল না কিছু। ঠিক পাগল বলা যায় না। কেমন জানি চুপসে থাকে। কথাবার্তা বলে না। খাওয়ার ইচ্ছা হয় না। কোনো কাজ করতে চায় না, আর সন্ধ্যা হলেই পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

দু'একদিন এখানে ওখানে আলোচনা শুনলাম, সবাই ছেলেটার অবস্থা দেখে দুঃখিত। আশাহত পরিবারটির প্রতি সবাই সমবেদনা জানায়। তাতে আন্তরিকতার যে অভাব ছিল তা নয়। কিন্তু হরির চিকিৎসার জন্য উদ্যোগ নিতে কাউকে দেখলাম না।

হরির মা এরপর দু'বার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। কান্নাকাটি করলেন, বললেন পড়াশুনায় পাঠিয়ে ভুল করেছে, তাতেই ছেলেটির মাথাটি খারাপ হল। তারপর আর আসেন নি। যোগাযোগই আর রইল না। হরির বোনটিও স্কুল ছেড়ে দিল। শুধু নিতাই ড্রাইভারই তার চাকুরি এবং মুখের হাসিটি ছাড়েনি।

হরিকে ধীরে ধীরে সবাই ভুলে গেল। সব সময়ই দেখতে দেখতে তার প্রতি কৌতুহলও একদিন আর রইল না। সে সন্ধ্যায় গোটা শহর ঘুরে বেড়ায়, এটাই একটা স্বাভাবিক ঘটনা দাঁড়িয়ে গেল। কখনও বাইরে থেকে আসা আত্মীয় স্বজনকে

স্থানীয় কেউ কেউ হরিকে দেখিয়ে বলে—"ছেলেটার জন্য বড় দুঃখ হয়। জানো, ও গ্র্যাজুয়েট।"—"গ্র্যাজুয়েট? কি করে এমন হল?"—"বলবে না আর"—বলে যেটুকু জানে, হরির সেইটুকু ইতিহাস তারা শোনায়।

প্রায় দু'বছর পর আমার মামাতো বোনের বিয়ে। মামা বাগানে চাকুরি করেন, ছেলে মেয়েরা শহরে থেকে পড়ে। তাই বিয়ের যাবতীয় দায়দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে। বড় ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন, বিয়ের প্যাণ্ডেল বাঁধা থেকে শুরু করে কনের চুলের কাঁটা ক্লিপ কেনা পর্যন্ত সব দিকেই নজর রাখতে হয়েছিল।

রান্নাঘরের পাশে মেয়েদের বসার জায়গা, তার পাশ দিয়ে মূল মণ্ডপে যাওয়ার রাস্তা। মেয়েরা ভীড় করে থাকায় রাস্তাটা বড় সংকীর্ণ ঠেকছে। এর মধ্যে মৃগেনরা দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিল, তাতে আরো অসুবিধা হচ্ছিল। মেয়েরা পান সুপারি নিয়ে আনাগোনা করছিল, মাঝেমধ্যে তাদের ডেকে পান সুপারি মুখে দিচ্ছিল, তারই সঙ্গে কে কখন এসেছে, কে কখন যাবে, মণ্ডপটা আরো কি ভাবে সাজালে ভাল হত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তারা তখন আলোচনায় মত্ত ছিল ফলে অন্যদের অসুবিধা তারা লক্ষ্যই করছিল না। কেউ তাদের কিছু বলতেও পারছিল না। মামী একবার কি যেন বলেছিলেন, কাজ হয়নি। এবারে আমাকেই বলার সুবিধা পেয়ে গেলেন। কে যেন একজন মেয়েছেলে বারান্দায় বেড়ার দিকে মুখ করে মিষ্টি খাচ্ছিল। মামী আমাকে বললেন—"দেখ তো বাবুল, পথটা বড় জঞ্জাল হয়ে রয়েছে। বর আসার সময় হল, সবাই সেখানে চলে যাক। আর এই মেয়েছেলেটাকে যদি লাগে আরো কিছু মিষ্টি দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদেয় কর। পথটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দে। আর ঐ টেবিলটা একেবারে পায়খানার কাছে রেখে আসবি।" কথাগুলো মৃগেনরাও শুনছিল, তাই আমি প্রথমে মেয়েমানুষটির দিকে গেলাম। বললাম—"হল নাকি তোমার? আর কিছু দেব? তাড়াতাড়ি কর—।"

একটু ঘুরে তাকিয়ে সে বলল—"কে বাবুল?" আমি নিথর হয়ে গেলাম। শরীরটা গুলিয়ে উঠল। লজ্জায় ঘৃণায় নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছা হল। এ যে হরির মা।

কথা বলার মতো অবস্থা আমার ছিল না। হরির মা-ই প্রথম কথা বলল—"তোমাদের মামার বাড়ি বলেই এসেছিলাম। মামী চিনতে না পেরে এখানে বসিয়ে দিলেন। এই কয়টা মিষ্টি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। তোমার মাকে দেখলাম না? কোথাও কাজে-কর্মে আছেন বোধহয়। আমাকে বাইরে রেখে আসতে পারবে না বাবুল?"

আমার কান্না পাচ্ছিল। আস্তে বললাম—"পোঁটলাটা আমার হাতে দিন।" হরির মা দিতে চায়নি, প্রায় কেড়েই নিতে হল। একবার ভাবলাম ভাঁড়ার ঘর থেকে

আরো কিছু খাবার এনে দিই, কিন্তু সাহস হল না। "আসুন" বলে পা বাড়ালাম। মেয়েদের মণ্ডপের ভেতর দিয়েই। হরির মা ঘোমটাটা আরো টেনে দিয়ে আমার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন।

গেট পার হয়ে এক ফার্লঙের মতো এগিয়ে দিলাম। ফিরে এসে ভেতরে ঢুকতেই পুতুলের মা ঠাট্টা করে বললেন—"বাবুল দেখি বড় সমাদর করে হরির মাকে এগিয়ে দিয়ে এলে। কোনো রহস্য আছে নাকি?" ❐

**ইমরান শ্বাহ**

জন্ম শিবসাগর, 1938। কটন কলেজ থেকে আই-এস. সি., শিবসাগর কলেজ থেকে বি. এ. ও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমীয়ায় এম. এ. পাশ করে শিবসাগর কলেজে অধ্যাপনায় রত হন। প্রকাশিত গল্প সংকলন এ পর্যন্ত পাঁচখানা। কয়েকটি সংকলন সম্পাদনা করেছেন এবং বালজাক ও আব্বাসের গল্প অনুবাদ করেছেন।

# স্নেহ

ইচ্ছা করেই আগে বাড়িতে খবর দিই নি।

হঠাৎ এসে বাড়িতে ঢুকলে বাড়ির মানুষ ভয়ানক চমকে যাবে। মায়ের চোখের মনি আমি, ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে আসার দরুন আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথাটাও সম্ভবতঃ একটুক্ষণের জন্য ভুলে যাবেন। খবর দিয়ে না আসার ফলে নাজিয়ার চেহারাটাই যে প্রথমে কি রকম দেখাবে, সেটা কল্পনা করতেও আমার অসুবিধা হচ্ছিল। শেষের দিকে কাজের চাপে চিঠি কম দিতাম, তা নিয়ে সে অনুযোগ কম করে নি। চিঠিতে নাজিয়া এত সব লিখতে পারে, কিন্তু সামনে গেলে ওর মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আমার ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। আর আঞ্জুমান? সে তো আমায় চিনতেই পারবে না। আমাকে তো সে দেখেই নি। নাজিয়া 'বাবা' বলে চিনিয়ে দিলেই কি আর সোজাসুজি আমার কোলে আসবে? আমি কোলে নিতে গেলে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। এ মাসে তার তিন বছর পূর্ণ হবে। নাজিয়ার মতে ও দেখতে আমার মতো হয়েছে। হয়তো নাজিয়ার সেটা দৃষ্টিভ্রম।

গর্ভবতী নাজিয়াকে রেখে সুদূর রুশ দেশে যেতে আমার কষ্ট কম হয়নি। কিন্তু নাজিয়াকে সাবাস না দিয়ে উপায় নেই। সেই আমাকে সাহস দিল। মাত্র দু'মাসের নববিবাহিতা পত্নী নাজিয়াই আমাকে বলেছিল—"আরে, তা বলে তুমি যাবে না কেন? মানুষ তো যুদ্ধেও যায়, তুমি তো আর যুদ্ধে যাচ্ছ না। খোদাই তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি যখন তোমাকে এমন সুযোগ দিয়েছেন, তা ছাড়া উচিত নয়। যাও তুমি, আমার জন্য চিন্তা করবে না। তুমি যেখানেই থাকো, তোমার স্নেহ আমাকে ঘিরে থাকবেই।"

সেদিন নাজিয়ার অন্তরের ক্রন্দন আর বাইরের হাসির সমন্বিত যে রূপ দেখেছিলাম, তার কোনো তুলনা হয় না। এই জন্যই বোধহয় ওরা নারী।

বিসমিল্লা বলে বেরিয়ে পড়লাম। ইন্দো-রাশিয়ান কালচারেল রিলেশনশিপ থেকে একটা বৃত্তি পেয়েছি। খোদার আশীর্বাদে এখন কাজ শেষ করে ফিরে আসছি, এসেই গুয়াহাটিতে চাকুরিতে জয়েন করলাম, তারপর দু'দিনের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।

মাস খানেক পর গরমের ছুটি হবে কলেজের। তাই বিছানাপত্র সঙ্গে আনি নি। সুটকেশটাই শুধু নিয়েছি। মাকে তসলিম জানাব, আঞ্জুমানকে দেখব আর নাজিয়ার মিষ্টি অভিমানের অত্যাচারটুকু উপভোগ করেই চলে আসব। বন্ধে আবার যাব। সেবার পারলে মা-ওদের সঙ্গে নিয়ে ফিরব। দু'জাগয়ায় দুটো বাড়ি চালানো কলেজের শিক্ষকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

ট্রেন পৌঁছানর কথা চারটে নাগাদ। কিন্তু রাস্তায় এ বিপদ হবে কে জানত? লামডিঙে সেই যে থামল, আর নড়াচড়া নেই। নেমে ডিজ্ঞেস করে জানলাম ট্রেন কতক্ষণ যে ডিটেন থাকবে তার কোনো স্থিরতা নেই। বিশ্বস্ত সূত্রে নাকি জানা গেছে যে ডিমাপুরে নাগা বিদ্রোহীরা আক্রমণ করতে পারে, তাই মিলিটারি এসকর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের লামডিঙে থাকতে হবে।

ফলে শিবসাগর ষ্টেশনে ট্রেন যখন পৌঁছাল, রাত দ্বিপ্রহর। আমাদের ছোট ষ্টেশনে যাত্রী বোধহয় আমি একাই নামলাম। আর কেউ নামলেও দেখতে পাই নি। গাড়িকে পাশ দেওয়ার জন্য একজন রেল কর্মচারীকে যেতে দেখলাম, সে আর ঘুরে এল না। কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী তিন মাইলের চাইতে একটু বেশি। মরনৈ-এর কাছে। এত রাত্রে একা কি করে যাব ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। রিক্সা একটা পাওয়ার কোনো আশা নেই। আশেপাশে কোনো মানুষজনও নেই। একবার ভাবলাম রাতের বাকি সময়টা প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে গেলেই তো চলে। কিন্তু মন মানল না। তিন মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে বড়জোর এক ঘণ্টা লাগবে। যা হয় হবে বলে সুটকেশটা তুলে নিলাম।

গেটটা পার হয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই দেখি একজন মানুষ, হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে গেটের কাছে বসে আছে। গায়ে একটা বুক খোলা কামিজ, পরনে নীল লুঙ্গি। লণ্ঠনটা ধোঁয়াচ্ছে, ফলে চিমনির নীচের দিকে একটুকু মাত্র পরিষ্কার অংশ একটু আলো দিচ্ছে। মুখ দেখা যায় না। তবু মনে হল লোকটার অবয়বটা আমার চেনা।

"কে? আমাদের ছোটখোকা না?"

মাত্র কজন মানুষই আমাকে ছোটখোকা বলে ডাকে। গলা শুনে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলাম যে এ হচ্ছে রমজান। কিন্তু আশ্চর্য! এই বৃদ্ধ মানুষটি বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরের রেল ষ্টেশনে তিন প্রহর রাতে কোত্থেকে এল?

কিন্তু রমজান, তুমি এখানে কি ভাবে?"

"খোদার মর্জি। বলব সব। তার আগে সুটকেশটা আমাকে দাও। এত ভারি সুটকেশটা তুমি নিতে পারবে না।"

মৃদু আপত্তি করা সত্ত্বেও রমজান আমার হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে নিল।

হাঁটতে শুরু করলাম। রমজান আগে, পিছনে আমি। রমজানের একহাতে সুটকেশ, অন্য হাতে লণ্ঠন। মনে হল রমজান একেবারেই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। আমি যখন বিদেশ যাই, তখন বেশ তরতাজা ছিল। দিব্যি হাসতে হাসতে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। এখন কিন্তু ওর বেশ কাহিল অবস্থা। পা দুটো শুকনো গাছের ডালের মত দেখাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গিটা অন্য রকম, যেন বাতাসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য চলাটা এখনও দ্রুত লয়ের। লণ্ঠনের আলোটা ম্লান, নীচ অবধি পৌঁছে না। পায়ে নিশ্চয়ই জুতা নেই, নইলে শব্দ হত।

এত অন্ধকার চারদিকে। শিবসাগরে বিজলীবাতি এসেছে চার বছর হল, কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি হয় নি। যান্ত্রিক বিচ্যুতি প্রায়ই ঘটে। আজও তাই হয়েছে নিশ্চয়ই, কোথাও রাস্তায় আলো জ্বলেনি।

"তোমরা সবাই ভাল তো? কোথায় এসেছিলে বললে না তো?"

"আমাদের আর ভাল খারাপ কি বাবা। কবরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এসেছিলাম ষ্টেশনে, একজন লোককে নিয়ে যাবার জন্য।"

"কাকে?"

রমজান একটু সময় চুপচাপ রইল। যেন কি ভাবছে।

"আমার ছেলেটাকে। পরশুদিন হাটে যাচ্ছে বলে নাগিনীমরা গেল। আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরল না। গত কালই আসার কথা ছিল। দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

কথাগুলো বলার সময় রমজানকে একটু নার্ভাস মনে হল। ছেলের জন্য বৃদ্ধ বোধহয় বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কয়েক মিনিট নীরব রইলাম।

"তারপর, তোমার সব ভাল তো? কাজ শেষ হল? খোদাকে বলছি, তোমাকে আরো বড় করুন। আমাদেরই সুনাম।"

বেশ ব্যাপার। কুকুরের স্বাস্থ্য বাড়ে, গৃহস্থের যশ হয়। আমার হাসি পেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কাছেই লজ্জা পেলাম। বুকের অজানা কোথায় যেন ব্যথা বাজল। সুসভ্য মানুষ বলে বড়াই করি। কিন্তু কোন যুক্তিতে। রমজানের শ্রেণীর মানুষ যেখানে রয়েছে সে দেশ স্বাধীনই নয়। সভ্য আর হবে কোত্থেকে? স্বাধীনতার পরিচয় শুধু সরকার গঠনেই নয়। সভ্যতার পরিচয়ও পাওয়া যায় না শুধুমাত্র সাজ পোষাকে।

চাকর শব্দটি ব্যবহার করতে ভাল না লাগলেও স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে রমজান আমাদের বাড়ির চাকর ছিল। ও আসলে কোথাকার মানুষ জানি না। বাবা চা বাগানে চাকুরি করার সময় ওকে পেয়েছিলেন, তারপর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। নামটা আগে যেন আরো কি ছিল। রমজান নাম দিয়ে তাকে বাড়িতে রাখা হল। ধীরে ধীরে সে আগেকার সব সংস্কার ছেড়ে আমাদেরই একজন হয়ে গেল। লুঙ্গি পরা শুরু করল, নমাজ-টমাজ না পড়লেও কথাবার্তায় একেবারে অসমীয়া মুসলমান হয়ে পড়ল। আমাদের বাবা মা কথাবার্তায় প্রচুর আরবি ফারসি

শব্দ ব্যবহার করেন, রমজানও সেগুলো আয়ত্ব করে ফেলল। পরে বাবা কোথা থেকে অনাথা মেয়ে একটি যোগাড় করে তার সঙ্গে রমজানের বিয়েও দিলেন। দিখৌ নদীর পারে আমাদের কিছু পতিত জমি ছিল, বাবা ওদের জন্য সেখানে ছোট একটা বাড়িও তুলে দিলেন। রমজানের বয়স তখন দু'কুড়ির বেশি। কিন্তু হলে কি হয়। রাতে ঘুমানোর সময়টুকু ছাড়া সারাদিন সে আমাদের এখানেই থাকত। সমস্ত কাজকর্ম করত। খাওয়া দাওয়া সব এখানেই। বিয়ের পাঁচ বছর পর একমাত্র ছেলে রৌশনকে রেখে ওর বৌ মরে গেল। তখন থেকেই রৌশনকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে রমজান। রৌশন আমার চাইতে বছর আট দশ ছোট হবে।

"ছোটখোকা, সে দিনগুলোর কথা মনে পড়ে? আমার পিঠে চেপে যে বেড়াতে?"

"পড়ে তো। কেন পড়বে না?" আমি উৎসাহ দেখিয়ে বলি। আর বিশেষ কিছু না ভেবেই বলি—"আর তোমাকে যে জোঁক বলে ক্ষেপিয়ে বেড়াতাম, সে কথাও মনে আছে।"

রমজান এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। চলার গতি একটু অন্যমনস্ক।

আমার খারাপ লাগল। কথাটা না বললেই ভাল করতাম। ছেলেবেলায় মানুষের সরলতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা এক কথা, আর বড় হওয়ার পর সে কথা আবার মনে করিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। মানুষের সরলতাকে ব্যঙ্গ না করে শ্রদ্ধা করতে পারলে আমাদের পৃথিবীটা বোধহয় আরো অনেক সুন্দর হয়ে উঠত। ব্যঙ্গের আঘাতে সাধারণ মানুষের সরলতা নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু একটুক্ষণ পরেই রমজান হো হো করে হেসে উঠল। আমি তখন নিজেই শিশু। তারও বেশ কিছুদিন পরে বাবা মারা যান। বাবা খুব ফুর্তিবাজ মানুষ ছিলেন। আজকাল তো আমরা হাসতেই ভুলে গেছি। কিন্তু সেই প্রবীণ বয়সে বাবা নিত্যনতূন হাসির খোরাক কি করে আবিষ্কার করতেন, ভেবে আমার বিস্ময় লাগে। আর সে কি হাসি। দেড় ফার্লং দূর থেকে শোনা যায়। আমরা মুসলমান, তাই বাড়িতে মুরগি পুষি। মুরগিগুলো ঘর দরজা বড় নোংরা করে। একদিন মুরগি একটা দরজার ঠিক সামনে পূরীস ত্যাগ করল, এতটুকু, আকারটা দাঁড়াল জোঁকের মত। বাবা রমজানকে ডেকে বললেন, "রমজান, এই জোঁকটা ফেলে দিয়ে আয় তো।" রমজানের ভাষাজ্ঞান তখনও সরগড় হয়নি। অসমীয়া বোঝে কিন্তু কথা বলার একটা টান থেকে যায়। রমজান জোঁক ডরায় না। সে হাত দিয়েই জোঁক ফেলতে গেল। কিন্তু সেই বস্তুটা তার হাতে লেগে রইল। তখন সে অবলীলায় হাতটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে বলল—"তবে যে আপনি জোঁক বললেন।" তখন থেকেই আমি তাকে জোঁক বলে ক্ষেপাই। সে পেছনে তাড়া করে।

কিন্তু কেউ আমাকে ক্ষেপালে বা আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে রমজান রণসাজে আমার পক্ষে নেমে পড়ত। রমজান তখন রীতিমত পালোয়ান মানুষ। শরীরে কোনো রোগ ছিল না, কোনো নেশাটেশাও ছিল না। গায়ে জোর থাকবেই। একবারের একটা কথা আমার মনে আছে। ছেলেবেলায় আমি একটু দুরন্ত ছিলাম। মার খেতাম যেমন, মার দিতামও। অনেক দিনই রাত্রে বাবা আমার ঘুমন্ত শরীরে কটা দাগ আছে খুঁজে দেখতেন। একবার সাতাশটা দাগ পেয়েছিলেন। একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় রহিম বলে ছেলে একটাকে আচ্ছাসে পিটুনি দিলাম। একজন স্যারকে ক্ষেপানোর জন্য একটা নাম আমরা ব্যবহার করতাম, সেটা বোর্ডে লিখেছিলাম। স্যার এসে কে লিখেছে জিজ্ঞেস করায় রহিম আমার নাম বলে দেয়। স্যার বেত মারলেন। তাই রাস্তায় রহিমকে ধরলাম। কোত্থেকে তার বাবা খবর পেয়ে গেলেন, ছেলেকে মারছি দেখে আমাকে আচ্ছাসে কানমলা দিলেন। এ সমস্ত কথা বাড়িতে বলা যায় না, কিন্তু রমজানকে বলা যায়। বলে দিলামও। সেসময়ে আমাদের বাড়ি নূতন করে সারানো হচ্ছে। আমরা পাশে উলুতলিতে দাদুর বাড়িতে থাকি। বাগান থেকে আনা বড় বড় লোহার খুঁটি কটা ছিল দাদুর বাড়িতে। এককেটার ওজন হবে আড়াই মণ তিন মণ। রহিমের বাবা আমাকে কানমলা দিয়েছেন শুনে রমজানের সে কি রাগ। একটা করে সেই ভারি লোহার খুঁটি নিজের কাঁধে তোলে, আর রহিমের বাড়ির সদর দরজার সামনে নিয়ে ধপ্ করে ফেলে। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—"হ্যাঁ, আমাকে চেনে নি। একসঙ্গে দশটার মহড়া নিতে পারি। হুঁ, তাগদ দেখাচ্ছে।"...আমি ভয় পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম রমজানকে না বললেই ভাল ছিল।

রমজান এগিয়ে গেছে। যথেষ্ট তাড়াতাড়ি হেঁটেও রমজানকে ধরতে পারছি না। তার গতিবেগটা মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক লাগছে। এই বয়সে এত জোরে ও কি করে হাঁটতে পারে? অথচ একবারও দৌড়য় নি। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বললাম—"রমজান, বড় জোরে হাঁটছ। একটু আস্তে কর।"

রমজান শব্দ করে হেসে গতিবেগ কমিয়ে দিল। তার হাসিটার অর্থ ভাল করেই বুঝলাম।

ছোটবেলা আমার সবচাইতে বিপদ হত তার সঙ্গে হাটে যেতে হলে। রমজান দীর্ঘদেহী জোয়ান। আমার বয়স ছ'সাত বছর। তার উপর একটু ছোট-খাটো দেখতে। তার সঙ্গে বাজারে যাই কাগজে করে হিসাব টুকে আনতে। রমজানের হিসাবে ভুল হয়। কিন্তু রমজান যদি আস্তেও হাঁটে, তবুও আমাকে তার সঙ্গে প্রায় দৌড়ে যেতে হয়। না পেরে শেষ পর্যন্ত কান্না পায়। রমজান প্রথমে ভ্রূক্ষেপ করে না। শেষে যখন বুঝতে পারে তখন আমাকে তার কাঁধে তুলে নিত। আবার কাঁধে তুলে নিলে ভর বাজারের মধ্যেও আর নামিয়ে দিত না। আমার তখনকার অবস্থা বোঝানো যাবে না। কারো মুখের দিকে তাকাতাম না। পরে অবশ্য কাঁধ থেকে নামার একটা

কায়দা বের করেছিলাম। পরে লজ্জায় সেই কায়দার কথা অন্য কাউকে বলিনি। রমজানও জানে না।...রমজান কখন ধীরে হাঁটতে পারে না।

সেই রমজান আর আমি।

রমজানকে বাদ দিয়ে আমার শৈশবই শুধু কেন, প্রথম যৌবন-কালের কথাও ভাবতে পারি না। সে আমার বিপদের বন্ধু, আমার সারথি, আমার আন-অথরাইজ্‌ড্ গার্জিয়ান। পরীক্ষার আগে বৃষ্টি বাদলের মধ্যে ফুটবল খেলে ভিজে কাপড়-জামা নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে পারি না। বাবা বকে। এদিকে ফিল্ডও বহুদূরে। গতি রমজান। শুকনা কাপড় জামা নিয়ে জার্মানী বনের মধ্যে সে লুকিয়ে থাকে, সেখানে জামা কাপড় পাল্টে ভাল ছেলের মতো বাবার সামনে দিয়েই বাড়ি ঢুকতাম। কিন্তু তারপর পড়ায় বসতে দেরি করলে বা বসে ঝিমুনি লাগলে রমজান অন্য মূর্তি ধরত। কি বকুনি তার। সাধারণ চাকরের এই আস্পর্ধায় আমি জ্বলে-পুড়ে উঠতাম, কিন্তু উপায় ছিল না। বাবা মুচকি হেসে তার কথায়ই সায় দেবেন। এখন ভাবি রমজানের ঋণ জীবনে কোনো দিনই শোধ করতে পারব না।

আমরা দরবার ফিল্ডের ইদগাহ্ ময়দানের কবরখানার কাছে এসে গেছি। ছোটবেলা কবরস্থান আমার কাছে বড়ই ভয়ের ব্যাপার ছিল। এখনও একা হলে হয়তো বা ভয়ই করত। কিন্তু সঙ্গে রমজান রয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। এই কবরখানায় আগে বিস্তর কুল আর জলপাই-এর জঙ্গল ছিল। রমজান বস্তা বস্তা কুল আর জলপাই নিয়ে যেত। আশেপাশের ক'খানা গাঁয়ের মানুষই এখানকার কুল আর জলপাই নিয়ে গিয়ে আচার দিত, আর বছর ভরে খেত। আজকাল অধিকাংশ গাছই মরে গেছে। দুই-চারটা যা আছে, তারও আগেকার মতো ফলন নেই। আজকাল মানুষ কবরে গাছ লাগায়ও না, পাতাবাহার গাছও নয়। দু-একজন টাকা খরচ করে কবরস্থান পাকা করে। রমজানের সঙ্গে কুল পাড়তে আগে কত এসেছি। তখন আমার সমস্যা দাঁড়াত পা দেওয়ার জায়গা খুঁজে বের করা। কবর, কবর আর কবর। অথচ কবরে পা দেওয়া চলে না। কখনো বাছতে বাছতে এমন হত, দেখা যেত যে কবরের ঠিক মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আস্‌সালাম্ আলেহকুম ইয়া আহলাল কবুর।

আমি উচ্চারণ করলাম। রমজান নীরবে হাঁটছে। হঠাৎ একটা কাহিনী মনে পড়ে গেল। রমজানই বলেছিল। সত্য মিথ্যা সে-ই জানে। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা চুপ করেছিলেন, কিছু বলেন নি। বাবার কবরও এখানে রয়েছে। কাল এসে একবার জিয়ারত করে যেতে হবে। আমি ভাবলাম।

রমজান বলেছিল। আমার কাকা একজন ছিলেন। দশ বারো বছর বয়সে মারা যান। একজন মৌলবী কাকাকে আরবী পড়াতেন। সঙ্গে সব সময় খোদার কথা, দোজক বেহেস্তের কথা, ফেরেস্তার কথা, জিনের কথা বলতেন। জিন নাকি তিনি

দেখেও ছিলেন। কাকা একদিন ধরলেন জিন তাঁকেও দেখাতে হবে। মৌলবী রাজী হলেন না, কাকাও নাছোড়বান্দা। শেষে তাঁকে রাজী হতে হল।

নির্দিষ্ট দিনে কাকা আর মৌলবী গিয়ে কবরস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মৌলবীর নির্দেশে কাকা একটা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মৌলবী মুখে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন। হঠাৎ দেখা গেল সেখানে একটা কালো মূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। মেঘে ঢাকা চাঁদের মৃদু আলো। আকৃতিটা মাত্র দেখা গেল। মৌলবী কাকাকে ফিস্‌ফিস করে বললেন—"দেখেছো। কলিমা পড়তে থাকো।" কাকার হ্যাঁ-না কিছুই করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড হল। প্রথম ছায়ামূর্তি যেখানে বেরিয়েছিল তার ঠিক পাশের কবর থেকে ধীরে ধীরে আরেকটা মূর্তির আবির্ভাব হল। সঙ্গে সঙ্গে কাকাকে হাতে ধরে মৌলবী দৌড় লাগালেন। আর জিন তাদের দুজনের পিছু ধাওয়া করল। ভয়ে কাকার জ্বর আসার উপক্রম। মৌলবীর অবস্থাও তথৈবচ। রমজান পরে ব্যাপারটা বলেছিল। আসলে মৌলবী যখন কাকাকে জিন দেখাবার কথা বলেন, তখন রমজান তা শুনে ফেলেছিল। নির্দিষ্ট দিনে সে আগে থেকেই কবরে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। সময় মতো সেখানে অন্য একটা লোককে লুকিয়ে রেখে মৌলবী কাকাকে নিয়ে আসেন। কাকা জিন দেখেছিলেন ঠিকই। কিন্তু রমজান দাঁড়িয়ে পড়ায় মৌলবীর সব হিসাব গণ্ডগোল হয়ে যায় এবং ভয়ে দৌড় লাগান। কিছু বুঝতে না পেরে দুই জিনও ছুটতে থাকে...।

"রমজান, কাকার জিন দেখা তোমার মনে আছে?"

ভেবেছিলাম রমজান হাসবে। হাসল ঠিকই, কিন্তু ভীত মানুষের মতো বিষণ্ণ সেই হাসি। বলল "খোকা, সামান্য মানুষ জিন ফেরেস্তার কথা কি বুঝব। আল্লা সর্বশক্তিমান, তিনি সবার ভাল করেন।"

রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ার অবস্থা হল আমার। এই রমজান সেই রমজান। নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হলাম। আমার বয়স বাড়ছে। আঞ্জুমানেরও বয়স বাড়ছে। কিন্তু মনটা আমার সেই তরলমতিই রয়ে গেছে। অথচ সেই রমজান যে ইতিমধ্যে দার্শনিক হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল অন্য একটা কথা। হয়তো কোনো সম্পর্কই নেই আজকের চিন্তার সঙ্গে কথাটার। একটা উর্দু কবিতা—

"সুবহ কি ভুলা আগর শাম ঘর লৌট আয়ে
তো উনসে ভুলা নহী কহতে...।"

পৃথিবীতে কি হয়ে এসেছিলাম, এখানে কি করলাম, সেগুলো কিছুই বড় কথা নয়। বড় কথা হল কি হয়ে আমি পৃথিবী ছাড়লাম...।

বাকি রাস্তাটা নীরবে কাটিয়ে বাড়ির সদরের সামনে এসে পৌঁছালাম।

"খোকা, স্যুটকেশটা ধর, আমি যাই।"

"কেন, বাড়ি ঢুকবে না?"

"না, এখন যাই, অনেক দেরী হয়ে গেল।"

রমজান চলে গেল। আমি একটু তাকিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। রমজান চলেছে। পা দু'খানা এত সরু। লণ্ঠনের আলো এত ম্লান। পা দু'খানা পুরো দেখাই যাচ্ছে না। মাটিতে পা পড়ছেই না যেন, মনে হয় বাতাসেই...

আমাকে দেখে সবাই অবাক। শুয়ে পড়লেও মা ঘুমোন নি। ডাকতেই, 'ছোটখোকা' বলে উঠে এলেন। নাজিয়াকে জাগালেন। বিস্ময় চোখে নাজিয়া উঠে এল।

"এত রাতে তুই একা এভাবে"—মা বললেন।

"একা আসিনি তো"—আমি বলি, "আমাদের রমজানকে পেয়ে গেলাম। তার ছেলেকে আনতে ষ্টেশনে গিয়েছিল। নাগিনীমরা গেছে নাকি। আসেনি আজও।"

"রমজান? তার ছেলে?"

মা এবং নাজিয়া কে কোন শব্দটা উচ্চারণ করল ধরতেই পারলাম না। নাজিয়া থপ্ করে চেয়ার একটায় বসে পড়ল।

"কি? কি হল?"

"রৌশন তো তুই যে বছর গেলি সেই বছরই কলেরায় মারা গেল।" মা বললেন,—"সেই দুঃখে রমজান পাগলের মতো না খেয়ে না শুয়ে দিন কাটাত, সেও গত বছর এমন দিনে মারা গেল। আমরাই তো কাজকাম সব করলাম। বিদেশে দুঃখ পাবি বলে তোকে জানাই নি। তাদের বাড়িটাও এবার নদী নিয়ে নিল।"

তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে এলাম। রমজান যদিও জোরে হাঁটে তবুও এইটুকু সময়ের মধ্যে নিশ্চিয়ই এক ফার্লং-এর বেশি যেতে পারে নি। দূরে নিশ্চয়ই লণ্ঠনটা দেখা যাবে। থাকলে দেখা যাবে নিশ্চয়ই। নদীর পারে রমজানের বাড়ি পর্যন্ত এদিক থেকে একেবারেই ফাঁকা। কিন্তু বেরিয়ে এসে শুধু অন্ধকারই দেখলাম। ভালুকের লোমের মতো ঘন কালো অন্ধকার।

ভেতরে চলে এলাম। মা চেয়ার একটায় আমাকে বসিয়ে দরুদ পড়ে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। নাজিয়াকে বললেন—"হাজী সাহেব এক জনকে এনে জমজমের জল একটু খাইতে দিয়ে হবে।"

নাজিয়া তাকাল। বেচারির মুখখানা সাদা কাগজের মতো বিবর্ণ দেখাচ্ছে। কেন জানি, আমার একটুও ভয় হল না। হেসে নাজিয়াকে বললাম—"ভয় করছ কেন, নাজি? রমজান খোলা মনের মানুষ ছিল। আমাকে ছেলের মতোই ভালবাসত...। চল, আঞ্জুমানকে দেখাও...।" ❐

# তিনের তিন গেল

**মহিম বরা**

জন্ম 1926, নগাঁও, হাটবর। 1952 সালে অসমীয়ায় এম. এ. পাশ করে স্কুলের শিক্ষাকতা, 'নূতন অসমীয়া'র সহকারী সম্পাদক, এবং গুয়াহাটি আকাশবাণী কেন্দ্রে গ্রামীণ অনুষ্ঠানের পরিচালক ইত্যাদি কাজে সুনামের সঙ্গে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর নগাঁও কলেজে আধ্যাপনার কাজ নেন। প্রকাশিক গল্প সংকলন— 'কাঠনিবারি ঘাট', 'বহুভূজী', 'ত্রিভূজ', 'মই', পিপলি আরু পূজা'। রচনা সংকলন হল—'মোমাইর পদুলিত বান্ধিলো ঘোরা', 'হেরোয়া দিগন্ত'। 'মায়া' এবং 'পুতুল ঘর' নামে দু'খানা উপন্যাসও বেরিয়েছে।

সোমবার। হাটবার। হাতে চাষবাসের কাজও তেমন কিছু নেই।

পূর্ণকান্ত পাটিতে শুয়েছিল, একবার এপাশ ওপাশ করল। বড় ছেলেটি বেড়ার ওপাশে পিড়িতে বসে কি একটা অঙ্ক করছে। বোধহয় বিয়োগ অঙ্ক, 'দুই থেকে পাঁচ যায় না, ফলে ধার আনতে হবে এক, মিলিয়ে হল বারো। বারোর পাঁচ গেল, রইল ছয়। ওদিকে রইল তিন, তিনের মধ্যে তিন গেল, অর্থাৎ তিনে তিনে মিলে গেল—'

সে 'আবার', 'কিন্তু', 'অর্থাৎ', ইত্যাদি শব্দ অবলীলায় উচ্চারণ করে যায়। এত সহজে দশ ধার করা যায়? আর এক ধার করলে দশ হয় কি করে? এক নয়, দুই নয়, পুরো দশই ধার দিল কে? তিন তিন এত সহজে মেলে না, মিললে বড় ছোট তিন ভায়ের মধ্যে খাওয়া শোয়া নিয়ে এত ঝগড়া বিবাদ হয় কেন? তিনের তিনই অবশ্য বাদ যেতে পারে।

এদিকে রান্নাঘরে চা জলখাবার নিয়ে ছোট ও মেজ ছেলের সঙ্গে গিন্নীর চিৎকার চেঁচামেচি যথা নিয়মে চলছে—"নেই বলছি। দেখ্ তো, হাঁড়ির গায়ে একটু মাত্র লেগে আছে। এটুকুও তোকে দিয়ে দিলে বাবা চা খাবে কি দিয়ে। পুরো খাবারটাই গুড় দিয়ে লাল করে ফেলেছিস, আর কত লাগে? বাবা আজ হাটে গেলেপর না গুড় আসবে?"

কথা শেষ হতে না হাতে আবার চেঁচিয়ে ওঠে, "নিবি না, নিবি না বলছি ওইটুকু। সকাল বেলা বাবা কি ফিকে চা খাবে? বলছি বাছুরটি বাঁটে মুখ দিচ্ছে না, তাই দুধ দোয়ানো যাচ্ছে না। কোনো মতে টেনে টুনে এটুকু এনেছি, অন্তত চা-টুকুর রং তো হবে। খা খা, দুধ না হলেও পেটে যাবে ঠিকই।"

পূর্ণর মনের মধ্যে সবগুলো কথাই পাক খেতে লাগল। হঠাৎ কি যেন একটা মজা পেয়ে মুখখানা হা করে শব্দহীন হাসি হাসল সে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেটুকু রোদ আসছিল, তাতেই আরামের উত্তাপটুকু লাগছিল, তবু হাত তুলে মাথার

দিকের জানালাটা অল্প ঠেলে দিল। নাগাপাটির উপর বাঁশের খাপ বসিয়ে তৈরী জানালা, বেত দিয়ে ঝোলানো—জোরে ঠেলে দিলে ঘর ঘর শব্দ করে সরে যায়। জানালা দিয়ে দেখা গেল সূর্য বাঁশঝাড়ের উপরে উঠেছে। সূর্যের না হয় কাজ রয়েছে, তাই উঠেছে। সে উঠে কি করবে? বাজারে নিয়ে যাবে কি? ছেলে-পুলেগুলোকে বঞ্চিত করে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে? হাতড়ে হাতড়ে শিয়রের দিক থেকে একটা বিড়ি বের করে জ্বালিয়ে শুয়ে শুয়েই টানতে লাগল।

কে যেন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। গুড় নিয়ে যে কান্নাকাটি করেছিল, সেই মেজ ছেলেটি। —"বাবা, উঠছ না কেন। বাজার থেকে গুড় আনবে না?"—তার হাতে মুখে জলখাবার লেগে রয়েছে।

বেড়ার অপর দিক থেকে তিনে তিনে মিল খুজনেওয়ালা ছেলেটি হাঁক দেয়—"বাবা, বাজারে গেলে আমার জন্য কাগজ এক দিস্তা নিয়ে এসো। "ভূগোলের খাতা নেই, মাষ্টার মারবে।"

একেবারে ছোটটি জলখাবারের বাটিটি হাতে নিয়ে ঢুকল। তার সারা গায়ে জলখাবারের গুড় ইত্যাদি লেগে রয়েছে। তার ফরমাস লজেন্সের, "ও বাবা, আমার জন্য লজেন্স আনবে।"—তার পরই ভাবল সেও বাবার সঙ্গে বাজারে যায় না কেন? তাহলে লজেন্স আনার কাজটা তো সে নিজেই করতে পারে। তাই বলল—"ও বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে বাজারে যাব।"

তাদের মা ঘরে ঢোকে।

"বেলা গড়িয়ে দুপুর হতে চলল, এখনও যে ওঠার নাম নেই?" বলে ছোট ছেলেটিকে খপ্ করে ধরে ফেলল, বোধহয় মুখ ধোয়াতে নিয়ে যাবে। অন্য হাতের আঙ্গুল তিনটি তুলে দেখাল—"তিনটি রয়েছে, আমি দেখেছি। বাগানে গিয়ে দেখো তো নিয়ে যাওয়ার মতো আর কিছু আছে কিনা।"—শেষের কথাগুলো বলতে বলতে ছোট ছেলেটিকে মুখ ধোয়ানোর জন্য নিয়ে গেল।

আঙ্গুলে দেখানো বস্তুটি যে সংখ্যায় তিন, তা সেও জানে। আগের দিনই সে দেখে রেখেছে। গতকাল থেকেই সে ঠিক করতে পারছে না কি করে। ছেলেটা ধুইয়ে ফিরে যাওয়ার সময়েও পূর্ণকে শুয়ে থাকতে দেখে তার বৌ এবার গলা চড়াল—"বাঁশের আগুন, চট করে ঠাণ্ডা ছাই হয়ে যাবে। আবার আমি আগুন করতে পারব না।"

এবার পূর্ণকান্ত সত্যিই উঠল। সকালের চায়ের গ্লাসটা সে ছাড়তে রাজী নয়। মুখহাত ধুয়ে পেছনের চালাঘরে একটা মোড়া নিয়ে বসল। তার হাতে চায়ের গ্লাসটা তুলে দেওয়ার পরই স্ত্রীর ফসমাসটা সে জানতে পেল—"চল্লিশ নম্বরী সূতা এক পোয়া দেখবে তো, সূতার অভাবে গামছা কখানা তো তাঁতেই পচল। আর আধ পোয়া কাপড়-ধোয়া সাবান আনবে।"

—"কাপড়-ধোয়া সাবান? কেন, গত রোববারে যে আনলাম। আধ পোয়া সাবান। শেষ হয়ে গেল?"

—"কোথায় গত রোববার? মধ্যে আরেক রোববার যে চলে গেল। তোমার কাপড়-জোড়া দু-ধোয়া খেল না? এদের পেন্ট সার্ট একটু একটু সাবান দিয়ে সঙ্গে কলাক্ষার দিয়ে ধুয়েছি বলেই না দু'সপ্তাহ গেল। তারপর কখনও কখনও গা হাত ধুতেও লাগে।"

"গা ধুতে? লাগে না আমার সাবান গায়ে দিয়ে বিলাতী হতে।" গা হাত ধোয়া কথাটার অর্থ পূর্ণ বুঝল না বা বুঝতে চাইল না।

—"আতাই (মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রচারিত ধর্মমত অনুসারে একই গুরুর দীক্ষিতরা একে অন্যকে 'আতাই' সম্ভাষণ করে; গুরুভাই), আছ নাকি?"

—"আতাই, এসো, এসো, ভেতরে এসো। এই মাত্র মুখ হাত ধুয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছি।" গ্লাসটা নামিয়ে পূর্ণকান্ত বেড়ার কাছ থেকে পিঁড়িটা টেনে সামনে আনে।

—"এখন উঠলে?" টঙ্ক বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ছোট ভারটি এনেছিল, তা একদিকে সরিয়ে রেখে পিঁড়িতে বসল।

বিয়ের পর দুজনে এক সঙ্গে শরণ (দীক্ষা) নিয়েছিল। তাই 'আতাই' সম্পর্কটা আধ্যাত্মিকও। ওর বাড়ি মাইল খানেক দূর। অন্য একটা গ্রামে। বাজারে যেতে হলে এ পথ দিয়েই যেতে হয়।

—"আমি খুব ভোরে উঠেছিলাম আজ, বাগানের বেড়াটা ঠিক করলাম, গরু ভেঙ্গে দিয়েছিল। বাগান খুঁজে মোচা, লেবু কিছু পেলাম। শুকনা বাঁশ কেটে জ্বালানির জন্য নিলাম। তারপর হাত পা ধুয়ে ঘরে পাকা আঠিয়া কলা কিছু ছিল, সেগুলো নিয়ে বাজারে যাচ্ছি।"

পূর্ণকান্তর স্ত্রী ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে বাটি একটার মধ্যে ফিকা চা কাঁসার থালায় সাজিয়ে এনে টঙ্কর সামনে রাখল। আতাইকে চা পান যাই দেওয়া হোক, এভাবেই দেওয়ার নিয়ম।

তারপর দাঁড়িয়ে ঘোমটাখানা ঠিক করে নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—"মানুষের তো কাজের লেখা-জোখা নেই। আমাদের তো ডাকতে ডাকতে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল। বাগানে গেলেই হয়। গেলে মোচা, করলা আমাদেরও বেরুবে।"

"ঠিক আছে"...বলে পূর্ণকান্ত আরেক ঢোক চা গিলে আগের মতোই মুচকি হেসে বলে "খাও আতাই, শুধু চা, তাও আবার ফিকা।"

"গরু লাথি ছুড়ছে। হাত বাঁটের কাছে নিতেই দেয় না",—স্ত্রী তখনও কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলে চলল—"একটু আগে এলে একজনের ভাগের দুধই দুজনকে দিয়ে চায়ের রং ফিরিয়ে দেওয়া যেতো।"

"গরুটি বেচে দুধেলা গাই একটা কিনে আনো", চায়ে চুমুক দিয়ে টঙ্ক বলে।
—"এ্যা, পাপ হবে আতাই, ধর্ম সইবে না।"

টঙ্ক এবার হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—"তুমি আগের মতোই রয়ে গেলে আতাই। আজকাল যুগ পাল্টে গেছে। আগের ধরণ ধারণ আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। গত যুদ্ধে দেখলে না, মিলিটারিকে গরু চালান দেওয়ার ঠিকা নিল বড় বড় হিন্দুরা। আমাদের মতো মানুষের ধর্মের চিন্তা না করলেও চলবে। ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়ানো দরকার, তাতে তাদের মাথা ভাল হয়।"

মধ্য থেকে স্ত্রী বলে চলে—"কে দুধ খাবে? ছেলেমেয়েরা? দুধ যখন হতো, তখনও তো একটু মাত্র চায়ের জন্য রেখে বাকীটা মুহুরির বাড়িতে দিয়ে আসত। তা থেকে খাজনার টাকা জমা হওয়ার কথা ছিল। মুহুরি খাজনা জমা দিচ্ছে বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলো ক্রোক। খাঁটি দুধ অন্যের কাছ থেকে কিনলে দিতে হয় এক টাকা, আমাকে দেবে ছ'আনা।" একই সুরে কথাগুলো বলে একটু থেমে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যটা উচ্চারণ করে, "বেল পাকলে কাকের কি?" এগুলো ঘরোয়া সুখ দুঃখের কথা, কোনো কিছু পাওয়ার আশায় কেউ বলে না। আতাই-এর সাংসারিক অবস্থা প্রায় তাদেরই মতো। শুধু মাত্র মন পাতলা করার জন্য নিজের মানুষের কাছে বলা।

পূর্ণকান্ত আতাইকে পান তামাক দিতে বলে উঠান ছাড়িয়ে বাগানে ঢোকে।

ইতিমধ্যে তার স্ত্রী টঙ্কর সামনে পানের বাটা দিয়ে এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে এনেছে। তারপর দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, "বাজারে নিয়ে যাওয়ার বস্তু বলতে আছে মানভোগ কলা কয়টা। তাও গরীবের কপালে হাঁসের ডিমেরও কুসুম থাকে না। গোটা কাঁদির মধ্যে মাত্র তিন সারি ভাল কলা বেরুল। বাকিগুলো সব সরু সরু। বাচ্চারা দেখবে বলে ভাঁড়ারে লুকিয়ে রেখেছি। ভালগুলো পেকে সুন্দর রং বেরিয়েছে। বাড়ির সেরা জিনিস বলে গোসাঁই-এর সেবায় কয়েকটা দেওয়ার কথা ছিল। এদের বাবা বলে তার চাইতে বেচে দিয়ে তা থেকে আধসের চানামটর কিনে গোসাঁই-এর ভোগে দিলেই চলবে।...এখন বের করে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে কঠিন, ছোট ছেলেটা দেখলে আর উপায় নেই, একেবারে কচ্ছপের কামড়।"

টঙ্ক তামাক টানতে টানতে এক মনে কথাগুলো শুনে গেল। কিছু একটা না বললেও চলে না, কিন্তু কি বলবে? তবু বলে—"ছেলেমেয়েরা মানভোগ কলা খেলে শরীরে জোর হয়, চেহারা হয় মানভোগ কলার মতোই। শহরের মানুষ কিনে খাওয়ায়। তাইতো তাদের ছেলেমেয়েরা পড়শোনায় ভাল। দেখতেও ভাল হয়। আমাদের কলাগুলো যেমন সরু সরু, তেমনি..." আতায়নীর ব্যবহার করা শব্দটাই সে ব্যবহার করল।

আতায়নী তাকে পান তামাক খেতে দিয়ে চালাঘরটার অন্য মাথায় ঢেঁকিতে পা লাগাল।

পূর্ণকান্ত বাগান খুঁজে খুঁজে মোচা দুটো আর এক কুড়ির মতো করলা এনে রাখল। তারপর হুড়মুড় করে গায়ে জল ঢেলে বাজারের জন্য তৈরী হল। যাওয়ার আগে ভাঁড়ারে ঢুকে খড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা কাঁদি থেকে তিন সারি ভাল কলা কেটে আলাদা করল। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান কলাগুলো দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। আরো সরু সরু দুয়েক সারি আছে, কিন্তু সেগুলো কি রকম যেন হেজে গেছে। সেগুলো যদি কখনও পাকেও, তবু দরকচা মেরে থাকবে।...নগদ অন্তত তিনটা টাকা পাওয়া যাবে, কাগজ এক দিস্তা, চল্লিশ নম্বরী সূতা,—গামছা বেচলে দেড় টাকা করে পাবে, গুড় না হলেই নয়, নুন, লজেন্সও আনতে হবে—ডাল মাছ তো লাগবেই।

কলাগুলি কাপড়ে বেঁধে চোরের মতো ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে আসছে, মেজ ছেলেটা কোথায় যেন খেলছিল, মৌজাদারের পেয়াদার মতোই হঠাৎ এসে উদয় হল।

—"বাবা, ওদিকের ঐ পোটলাটায় কি আছে?"

—"কিচ্ছু না...কিচ্ছু না" কি বলে ফাঁকি দেবে ভেবে না পেয়ে ধমক দিয়ে বলে, "যেখানে খেলছিলি সেখানে যা না।"

সে দৌড়ে এসে খপ করে পোটলাটিতে হাত বসায়, কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কাঁচা সোনার বরণের কলা উঁকি মারে।

—"কলা, কলা, কোথায় পেলে? আমায় দাও।"

ছোট ছেলেটাও কোত্থেকে ছুটে এসে কলা কলা বলে চেঁচাতে লাগল। বড় ছেলেটাই শুধু চিন্তিত ভাবে আলাদা দাঁড়িয়ে রইল। হুলুস্থুল শুনে ঢেঁকি ছেড়ে তাদের মাও চলে এসেছে। টঙ্কও। তার মধ্যে 'কলা দাও', কলা দাও' পরিত্রাহি চিৎকার। তাদের মা কঞ্চি একটা হাতে নিয়ে বলল, "গুড় দিয়ে বাটি রাঙা না হলে জলখাবার মুখে রোচে না, ভাজা না হলে ভাত চলে না। ওগুলো কোত্থেকে আসবে, কলা যদি বাজারে বিক্রি না করে?"

ছেলেদের মারের ভয় নেই, তাদের কলা চাই-ই। পূর্ণ মাথার উপর পোটলাটা তুলে নিয়ে বলল, "তোদের জন্য ভাঁড়ারে আরো রয়েছে, কাল পাকবে, তখন খাবি।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাসি একটা বমির মতোই গলা পর্যন্ত এসে তার আটকে গেল। সকাল থেকেই হাসিটা রয়েছে। ভাঁড়ারে কলা রয়েছে শুনে মেজ ছেলেটা সরে গেল। ছোটটা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

বড় ছেলে এসে ছোট ভায়ের হাত ধরে বলল, "বাবা তোকে বাজার থেকে লজেন্স এনে দেবে, কলা বেচলেই তো লজেন্স আনতে পারবে।"

"লজেন্সও চাই, আমার কলাও চাই।" —সে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল। তার গলা কান্নার ভেজা, দৃষ্টি বাবার মাথার উপরের পোটলার দিকে।

"জলখাবারের গুড় আনতে হবে না? আমার কাগজে আনবে"—বড় ছেলে আবার বোঝানোর চেষ্টা করে।

"আমার চাই না"—বলে সে কঁকিয়ে চীৎকার করে উঠল।

বাবা মায়ের চোখের দিকে তাকায়। অর্থ—দিয়ে দিই একটা।—"দেবে না। একটায়তো হবে না, তিনটা লাগবে, তিন আনা পয়সা। এক সের নুন, একপো গুড় আর আধপো সাবান হয়ে যাবে। কলা তিনটা তো টপ করে গিলে ফেললেই শেষ...(মগজ ভাল হয় আতাই বলেছিল)। মা ছেলেকে বাপের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল।—"মিছেমিছি কলাগুলো ছিড়লে আঁটিটা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন কে কিনবে?" বলে সে স্বামীকে চোখের ইঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে বলে।

দুই গুরুভাই বেরিয়ে গেল। জিনিস কম, ভারে করে নেওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক দিন ভার কাঁধে নেয়নি, একটু সঙ্কোচও রয়েছে। ইংরেজী স্কুলে দুটো শ্রেণী সেও পড়েছিল। অবশ্য এখন ইংরেজী কেন, বাংলা অক্ষরও অতি কষ্টে পড়তে হয়। অনভ্যাসে হতো বিদ্যা। ভাঙ্গা হোক, পুরানো হোক সাইকেল একটা ছিল, এতদিন তাই ঠেলে ঠেলেই বাজার হাট করত। সেদিন সেটাও ক্রোক করে নিয়ে গেল দেনার দায়ে। দেনার টাকা দিতে না পারলে সেটা নীলাম করবে। সূতা আনলে গামছা বুনবে, গামছা বেচলে টাকা আসবে।...আজকের কলা বেচলেও দু'টাকা মতো হবে, কিন্তু তা থেকে কি আর বাঁচবে?

বাজার প্রায় দেড় মাইল দূর, দুজনে দ্রুত পা চালায়। পথে হলধর দোকানীর খপ্পরে পড়ল। পেটমোটা নাছোড়বান্দা বুড়ো পথে খাপ পেতে বসে থাকে প্রতি হাটবারেই। বাকী নিয়ে যে খদ্দেররা ডুব মেরে গেছে, তাদের ধরে ধরে গালি-গালাজ দেয় আর জিনিসপত্র আদায় করে।

"কিরে পূর্ণকান্ত, কি আনলি?"

"কি আর আনব, দাদু। কলা তিন আঁটি, কয়েকটা করলা, আর কলার মোচা।"

"ভীম-কলার মোচা নাকি? দেখি দেখি, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। কি দাম?" বুড়ো এগিয়ে এসে পোটলার কলাগুলি দেখে অবাক হয়ে যায়।—"আরে, আমাকে এক আঁটি দিয়ে যা। দাম কত?"

"একটা এক আনা। তাড়াতাড়ি করুন, বাজার ধরতে হবে।"

"একটা এক আনা! একি শহর টাউন পেয়েছিস নাকি? দু পয়সা করে দে।"

"না পারব না। বাজারে গেলে ছ পয়সা করে দর পাব।"

"ছ পয়সা কেন, দু আনাই পাবি। এদিকে তিন মাস আগে গুড় এক সের, নুন এক সের এসবের দাম যে বাকী ফেলে রেখেছিস, মনে নেই।"

পূর্ণর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। একদিন বাজারে কিছুই বেচতে না পেরে যাওয়ার সময় এই দোকান থেকে কিছু জিনিস ধারে নিয়েছিল। এমনি অবশ্য এই দোকান থেকে জিনিস নেয় না। কাছে আরেকখানা দোকান রয়েছে। তবুও বুড়ো ধর্ম সাক্ষী করে ধার দিয়েছিল।

"নেওয়ার বেলা সবাইর মনে থাকে, দেওয়ার বেলা নেই।" বুড়োর বাক্যবাণ শুরু হল।

শেষ পর্যন্ত দামদর করে কলা এক আঁটি, মোচা একটা আর বারোটা করলা দিয়ে ধারটা শোধ করল পূর্ণ। যাই হোক, বোঝাটা হালকা হল। তিন আঁটির এক আঁটি গেল। বাজারের মুখে এসে পোটলাটা আতাইর ভারে দিয়ে দিল। নইলে শুধু শুধু দু'পয়সা 'তোলা' দিতে হবে। যথা লাভ।

বাজারের সামনের দিকের জায়গাগুলোতে ব্যাপারীরা ইতিমধ্যেই বসে পড়েছে। তারা জায়গা খুঁজে খুঁজে একটা মোড়ে বসল। তখন জিনিসপত্র সব পূর্ণর জিম্মায় দিয়ে টঙ্ক বেরুল লং-ক্লথ কাপড় এক গজ কিনতে। তার বউ পয়সা জমিয়ে দেড়টা টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে।

পূর্ণ একটু সরে গিয়ে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে গ্রাহকের অপেক্ষা করতে লাগল। রোদের তাপ বড় বেশী। একটু দূরেই মাছের বাজার। গরমে পচা মাছের গন্ধ বেরিয়েছে। পূর্ণর মাছ কেনার প্রশ্নই ওঠে না। এমনি দেখার জন্য মাছবাজারে এক পাক ঘুরে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু সেখানে ঠেলাঠেলি ভীড় দেখে সে ভাবল কি গরজ যাওয়ার। শুধু শুধু লোভ লাগানো। দু'সপ্তাহ আগে ধান কিছু দিয়ে মেছুনির কাছ থেকে মাছ কিনেছিল ছেলেদের তাড়নায়। তারপরে সন্দেহ জাগিয়েছে, খোরাকির অভাব পড়তে পারে।

সাদা সার্টপ্যাণ্ট পরা, চোখে চশমা, স্থানীয় ডাক্তারবাবু তার মালের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সে এগিয়ে এল।

"বড় ভাল কলা ক'টা এনেছিলে?"

"বেশি নয়, এই দুই আঁটি। মোট তিন আঁটি মাত্র ভাল কলা হয়েছিল।"

"ঘরে এক আঁটি রাখলে? আসলে ছেলেমেয়েদের এগুলো খাওয়াতে হয়, খুব ভাল জিনিস। সরকার সব জায়গায় কাগজ সাপটে দিয়েছে, দেখোনি।"

ডাক্তারবাবু আঙ্গুল তুলে রাস্তার দিকে দেখালেন। পূর্ণ দেখল যে সেখানে গাছের উপর একটা নূতন ছবি লাগানো হয়েছে। তাতে এক গ্লাস দুধ, কিছু ফলমূল, মাছের ছবি। বই-এ এসব কথাই থাকে, ছবিতেও এসব কথাই লেখা।

"এক আঁটি নিয়ে যান স্যার।"—কলা এক আঁটি সে ডাক্তারের সামনে তুলে ধরে।

"দাম কত নিচ্ছ?"

"ঘরের জিনি়স, দাম দিতে হবে না স্যার।"

এই ডাক্তার সেবার বড় ছেলেটির অসুখের সময়ে শুধুমাত্র ওষুধের দামটুকু নিয়ে কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন, চিকিৎসা করেছিলেন। ভিজিট হিসাবে ঘরে বোনা গামছা একখানা মাত্র দিয়েছিল। তার স্ত্রী কেঁদে বলেছিল—"আপনি দেবতা, নইলে আমার ছেলে বাঁচত না।" সেই ডাক্তারের থেকে আজ দাম নেওয়া যায়? উচিত হবে না।

ডাক্তার আট আনা পয়সা দিলেন। সে ফিরিয়ে দিল। অগত্যা ডাক্তার চার আনা পয়রা দিয়ে কলার মোচা আর করলা কয়টা কিনলেন। সঙ্গে-আনা চাকরটি জিনিসগুলো থলেথে ঢুকাল।

কলা তিন আঁটির দুই গেল, রইল এক।

যাঃ। এক হিসাবে ভাল কাজেই লাগল। ডাক্তারবাবুকে হাতে রাখা দরকার। ছেলেমেয়ে নেই, মধ্যবয়সী মানুষ—কি যেন রহমান নাম। শিবসাগরের দিকে বাড়ি। পয়সা চার-আনা কাগজ কিনতে লাগবে।

আবার সে গাছতলায় যাবে, এমন সময় কাছে চেনা গলা একটা শুনে ঘুরে তাকাল। মুহুরি।

"কি হে পূর্ণকান্ত, কি করছ?"

সাদা কালো চুল সুন্দর করে সিঁথি করা, কালো মুখখানা নিভাঁজ, মধ্য বয়স্ক মানুষ, মৌজাদারের চেয়েও তার প্রতাপ বেশি। মুহুরিবাবু কাছে এলেন। পূর্ণ কি উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, ফলে তিনিই আবার বললেন, "আমাকে দুধ দিচ্ছ না, তখন বলছ দুধ নেই। অন্যকে কি করে দিচ্ছ।"

পূর্ণকান্ত ভয় পেয়ে গেল। "হায় ভগবান, আজ সকাল বেলা-ই ফিকা চা খেয়ে এসেছি আতাই আর আমি, আতাইকে জিজ্ঞেস করুন। তাকে এখনই পাবেন, কাপড় কিনতে গেছে।"

মুহুরী অবশ্য জেনেশুনেই মিছে কথা বলেছেন। তবু ছাড়েন না। বলেন, "হ্যা, এখন আমি হাটের মধ্যে তোমার আতাইকে খুঁজতে যাই। পরে আমি তোমার আগের দুধের দাম খাজনার সঙ্গে কাটিয়ে নিয়েছি। বাকী খাজনার জন্য ক্রোক বেরিয়েছে। তাড়াতাড়ি পয়সা যোগাড় করে সাইকেলখানা ছাড়িয়ে নাও, নইলে ক্রোক হয়ে যাবে।"

"আগের খাজনা বাকী ছিল না তো।" পূর্ণ সোজাসুজিই বলে ফেলে।

—"ছিল কি ছিল না গিয়ে দেখে এসো। আমি জানিয়ে রাখলাম, পরে দোষারোপ করো না।" তারপর সুরটা নরম করে বললেন, "এই জিনিসগুলো তোমার নয়?"

—"আমার শুধু কলাগুলো, বাকী সব আতাই-এর।"

"ও কলাগুলো চোখে লাগার মতো। এই সমস্ত ভাল জিনিসের ভাগ আমি

আর পাই না। শুধু বিপদের সময়ে দাদা দাদা। দাম কত নিচ্ছ—" বলে হাতে কলাগুলি নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর কলার পাতা একটা নিয়ে তার মধ্যে কলাগুলি রেখে শক্ত করে গিঁট দিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিলেন।

—"দাম আর কি বলব?" অনাবশ্যক কথাগুলো হজম করে পূর্ণকান্ত কলার মূল প্রসঙ্গে চলে এল—

"আমার হিসাবে দেড় টাকা হয়।"

"যা যা। দেড় টাকা বললেই হল। এইমাত্র ডাক্তারকে বিনে পয়সায় দাওনি। আমি বুঝি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করিনি?...দেশ কাল উল্টে গেল। ডাক্তার ইঞ্জেকশনে জল ঢুকিয়ে বিঁধিয়ে দেয়, তার হল খাতির। আর আমি যে নীলাম থেকে আটকে রেখেছি, আমার বেলা বুড়ো আঙ্গুল।"

"তা নয় দাদা, আপনার বৌমা..."

"হ্যা"—বলে বাধা দিয়ে মুহুরী বললেন, "বাদ দাও, বাদ দাও, দাম যা হবে খাজনাতে যাবে, আমি নীলামের দিন কেটে নেব।"

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে মহুরী চলে গেলেন। তিনিও যে একজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, মানুষের উপর তারও যে এক্তিয়ার আছে, এই আত্মসন্তুষ্টির ভাবটি তার রাগত মুখের মধ্যেও ফুটে বেরুল।

ওদিক থেকে টঙ্ক এল ঘামে একাকার হয়ে। হাতে ছোট্ট একটা পুঁটলি, মুখ-ভরা বিরক্তি।

"আরে সবগুলো হয়েছে রক্তচোষা। সাতটা দোকান ঘুরে এক টাকা বারো আনার নীচে কাপড় এক গজ কোথাও পাওয়া গেল না। দোকানী, ব্যাপারী, এম.এল.এ., মন্ত্রী সকলেই এক বস্তু। বলছি আতাই, কমুনিসরাই ঠিক বলে, সবাইকে কমুনিস্ (কম্যুনিষ্ট) হতে হবে। আরে, তোমার কলা তিন'টি কোথায় গেল?"

—"লঙ্কায় গেলে সকলেই রাবণ আতাই, সে সোস্যালিষ্টই হোক আর কম্যুনিষ্টই হোক। দুঃখীর দুঃখ কখনও ঘুচে না। দেশ স্বাধীন হল, কার জন্য হল? কলার কথা বলছ? ও বোঝা পাতলা হয়ে গেল। তিনের তিনই মিলিয়ে গিয়ে খতম।" —পূর্ণ মুহুরীর ঘটনার বর্ণনা দিল।

"বাং দিয়ে পিটিয়ে লম্বা করে দিতে পারলে না। তুমি কি হে আতাই? বাচ্চাদের মুখের গ্রাস কেড়ে এনে অস্থানে দান করলে? আমি থাকলে মুহুরীকে আজ—"

—"যেতে দাও আতাই, ভাগ্যখানা কে কেড়ে নেবে? স্বয়ং রাজাও পারবেন না।" তাড়াতাড়ি ছাতাটি টঙ্ককে দিয়ে বলে, "তুমি একটু বসো তো, আমি বাজারটা একটু ঘুরে আসি।" বলে তাড়াতাড়ি পূর্ণ পা চালায়। কারণ টঙ্ক রাগী মানুষ, পারলে হয়তো কলাগুলো ছিনিয়ে আনবে।

এখন সে কিনবে কি? কাগজ তো নিতেই হবে। বই কাগজের দোকানে যেতে

গিয়ে দেখল এক জায়গায় নমোরাম গুড় বেচছে। নমোরাম আর সে একসঙ্গে পাঠাশালায় পড়েছে। তার গুড়ের রঙটা বড় সুন্দর, তাই লোকেরও খুব ভীড়। নমোরামের পাশে বোধহয় তার ভাই, পয়সা গুনছে। নমোরামের মাথা ঘোরানোরও সময় নেই, গুড় মাপছে। সে একটু সময় দাঁড়াল।

একবার হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেল।

—"আরে পূর্ণ নাকি? অনেক দিন দেখিনি।'

—"তোমাকেও দেখিনি। ভাল আছ?"

—"আছি মোটামুটি। তোমার গুড় লাগবে নাকি?"

—"না, এমনি দেখছি।"—এই কথাগুলো বলেই পূর্ণ ঘেমে গেল। কি করে সে নমোকে বলবে যে তার আধা সের বা এক সের বাকীতে লাগে? কোনোদিন বাকী চায়নি। এমনিতে স্কুলে অবশ্য নমোরাম গুড় বা মিছরি এনে বিলি করত। পূর্ণকে বেশি করে দিত কারণ পূর্ণ তার অঙ্ক করে দিত।... এখন এত লোকের সামনে, তাও আবার ভাই সঙ্গে রয়েছে। নমোরাম আবার গুড় মাপতে লাগল। পূর্ণও এক পা দু পা করে বইয়ের দোকানে গেল।

"শ্রীরামপুরী কাগজ নেব। দিস্তা কত?"

"এক টাকা।"

"রাম রাম। ছেলেমেয়েরা পড়বে কি করে?"

"আর বলবে না। তোমার কতখানি লাগবে?"

"আধা দিস্তা দরকার ছিল। দুই চার আনা বাকী দেবেন নাকি?"

দোকানী পাচন-খাওয়া মুখ করে বলল—"বাকীর কথা আর বলবে না। কত মানুষের ছেলেমেয়ে বাকীতে বই কাগজ কিনে নিজেরাই এখন ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে গেছে, এখন তারা আবার তাদের ছেলেমেয়ের জন্য বই কাগজ কিনতে আমার দোকানে আসে। ওদিকে আমি এই দোকানখানি নিয়ে যে তিমিরে..."

"বাদ দিন তাহলে। চার আনা পয়সা আছে। চার আনার কাগজই নেব।"পূর্ণ বলে।

কাগজ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় দেখল একটা দোকানে ডাক্তারবাবু বড় বড় খাসিয়া আলু কিনছেন। আলুগুলো দেখলেই খেতে ইচ্ছা হয়। বড় ছেলেটা কার বাড়িতে যেন নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে অড়হর ডাল আর আলুর দম দিয়ে লুচি খেয়ে এসেছিল। তারপর থেকে বহুদিন ধরে তেমনি রান্না করে দেওয়ার জন্য মার কাছে বায়না করছে। কিন্তু নেবে কি করে? এত দাম।

ডাক্তারের চোখে পড়ার আগেই সে সরে এল। বেলাও অনেক হল। আতাইয়ের জিনিসগুলোও এতক্ষণে বিক্রি হয়ে গেছে। তবুও সে আবার ঘুরে নমোরামের কাছে গেল। ননোরাম জিনিসপত্র গোছাচ্ছে, বিক্রি শেষ।

"কিহে নামো, দাঁও মারলে আজ।"

"দাঁও আর কি মারব। তবে আজকের গুড়টা ভাল ছিল।"

"একটু গুড় আমারও দরকার ছিল। এত লোকের মধ্যে বলতে ইচ্ছা হল না বুঝলে।...তুমিই বা কি ভাববে।" বলে পূর্ণ নমোরামের একেবারে কাছ ঘেঁষে বস্তার উপর বসে পড়ল।

"কেন? নিলে না কেন?" আ! তবু আমার জন্যে এক সের রেখে দিয়ো একথাটা বলতে কি বাধা ছিল? ছিঃ, কি মানুষ হে তুমি?"

ঝরতি পড়তি নীচে যা আছে, তাই দাও ভাই। তোমায় বলব কি, আমার হাতে এক পয়সাও নেই।"

নমোরাম একটু আড়ালে ভাইকে লুকিয়ে চার আনা পয়সা পূর্ণকে দিয়ে বলে—"ঝরতি পড়তি আর কি পাবে? এই পয়সা দিয়ে আর কারো কাছ থেকে কিনে নিয়ো।" তারপরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "পরে মনে করে আমাকে ফেরৎ দিলেই হবে।"

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে পূর্ণ চলে এল।

দুই ভ্রাতাই ঘরের দিকে রওয়ানা হল।

লজেন্স নেওয়া হল না, সূতা না, সাবান না।

বাজারের নানা মানুষের ভীড়, বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান, কোলাহল সব পূর্ণর চোখ আর কানের কাছে অস্পষ্ট হয়ে এল। স্পষ্ট হয়ে উঠল তার সেই ছোট ছেলেটার মুখ, সে কলা খাবে বলে তাকে জাপটে ধরে তার পায়ের উপর চোখের জল ফেলেছিল। স্পষ্ট হয়ে উঠল বিবর্ণ মুখে, করুণ চোখে দাঁড়িয়ে থাকা বড় ছেলেটার ছবি, ছোট ভাইকে দেওয়া তার স্তোকবাক্য কানে বাজল। আর কলার প্রত্যাশায় ঘুরঘুর করা মেজ ছেলেটার ছবিও ভেসে উঠল।

আরেক বার সেই হাসিটা মারাত্মক ভাবে চাগিয়ে উঠল, কোনোক্রমে সে সামলে নিল। রাস্তার লোকে পাগল ভাববে যে! ❐

**লক্ষ্মীনন্দন বরা**

জন্ম 1932 সন। নগাঁও-এ প্রথম দিকের শিক্ষা, অতঃপর গুয়াহাটি থেকে বি.এস.সি পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সে এম.এস. সি. পাশ করেন। যোরহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কৃষি কলেজের অধ্যাপক। শ্রীবরার নয়খানা উপন্যাস এবং এগারোখানা ছোট গল্প সংকলন রয়েছে। এ ছাড়াও একটি নাটক এবং সদ্য শিক্ষিতদের জন্য লিখিত দু'খানা বই-এর লেখক।

# গুরু পর্ব

পিতা হচ্ছেন আদি গুরু, তিনি কিন্তু সোজা ভাষায় কিছুই বলেন না। এই সমস্ত বাঁকা কথাগুলো অন্তরেও বাঁকা হয়ে ঢোকে। যদি কখনও উঠানে ধান মাড়াই দিতে দিতে একটুক্ষণের জন্যে ভেতরে যাই, তক্ষুণি চিৎকার করে বলবেন, "দাও তো মা, ওকে ভাল করে জুতসই একখিলি পান খাইয়ে দাও তো।" আমি লজ্জা পেয়ে সরে আসার পথ পাই না, কারণ আমার বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ'মাস। 'ঘরে পরার পোশাকটা বদলে ফেলো', বললেই বুঝতে হবে যে মাঠে যেতে বলছেন। 'কাছাটি গুটিয়ে নাও' বললে বুঝতে হবে বাঁশ কাটতে যেতে হবে। সকাল বেলা ডেকে নিয়ে যদি বলেন, "খোকা, গাড়িটার ছই লাগাতে হবে," তখন আমার বৌ-এর মুখের রং-বেরং-এর হাসিটা আর কোনো সীমা মানবে না। কারণ রাতে আমি বলেছিলাম যে বাপের বাড়ি পাঠাব না, তাই সকালে এই বিপরীত পিতৃআজ্ঞা।

দ্বিতীয় গুরু নিতে হল পিতার আদেশেই। তিনিই আমার গন্ধর্বগুরু, গীতপদ আর সুত্রধারী তাঁর কাছেই শিখেছিলাম। লেখাপড়া করতে গিয়ে শিক্ষাগুরু যাঁদের পেয়েছিলাম, তাঁদের ধরছি না। তাঁরা হচ্ছেন সরকারী মাইনে পাওয়া গুরু ; শুধু আমার নয়, সবারই গুরু।

একদিন বাবা বাইরের ঘরে বসে বেত পরিষ্কার করছিলেন। আমি বসে রয়েছি পাশের ঘরে, বৌর সঙ্গে গল্প করছি। বাবার সঙ্গে গল্প করতে এলেন শ্রীধর, ভোটোক, ভোকোলা আর বসন্ত। তাঁরা চারজনও বুধবারী গোঁসাই-এর কাছে একই সঙ্গে মন্ত্র নিয়েছেন। বাবা 'গৃহতে থাকিয়া দেখিনু তোমার চরণ' বলে ঘোষা (বৈষ্ণব পদ) একটা গেয়ে ষাষ্টাঙ্গ হতেই তারা পরস্পরের হাত মাটিতে স্পর্শ করে আসন নিলেন। আমি ক্ষণিকের জন্য বাইরে এসে ব্যাপারটা দেখে গেলাম। বসন্তই কথা শুরু করলেন, "বাঞ্ছা আতাই, দেশ কাল কি হল বলতো। সূত্রধর নিজেই তো দেশ ছেড়ে গেল। কদিন হল মাষ্টারির কাজ পেয়েছে কাহিগুড়িতে। সঙ্গে মাটি জমি নিয়ে চাষবাস শুরু করেছে। ভাদ্র হেন মাসটাতেও আসতে পারবে না জানিয়েছে।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই ভোকোলা দাদা বলল, "কথায় বলে—ধন রইল পড়ে, দেহ গেল উড়ে, তথাপি মন হয় বিষয় বিকল। হরি হরি, কতদিনই বা আর এই পচা শরীরটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারব? তবুও এই কাণ্ড।"

তক্ষুণি টিকটিকি একটা টিকটিক করে উঠল, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে পরম উৎসাহে তিনটি টোকা মেরে শ্রীধর বায়েন বললেন, "কথায় আছে, 'বিষয়ের সুখ সে যে তিলে হয় চুর, যমের কিঙ্করে ধরে নিবে যমপুর।' তবু মানুষের সুমতি আর হয় না। আমি বলেছিলাম, বল সুত্রধার (অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্মীয় নাটকের মুখ্য পরিচালক), এই খোলসটা খসে যেতে আর কদিন বাকী। এই কটা দিন সকলকে নিয়ে হরি নাম জপ করে কাটিয়ে দাও। সূত্রধারের মত হল তার বিপরীত।"

তিন জনের এই কথাবার্তার মধ্যে বাবা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তিনজন অবশ্য কথা বলছিলেন তাঁর সমর্থন আশা করেই। শেষ পর্যন্ত বাবার গম্ভীর কণ্ঠ কানে এল, "সূত্রধার ভাল করলে কি খারাপ করলে বিচার করে বলতে পারছি না ভাই। এ ব্যাপারে মুকুন্দ গোঁসাইর মতটিই আমি সার বলে মানি। তিনি বলেছেন যে আমার বিষয় বাসনা ত্যাগ করার ইচ্ছা থাকলেও সে কথা আমার নিজের মুখে উচ্চারণ না করাই ভাল। ত্যাগ করার কথা মুখে বলে বেড়ালে ত্যাগ করা যায় না। তখন আরো বেশী করে জড়িয়ে পড়তে হয়। আমরা কে সংসারী নই বল? তাই ওসব কথা বাদ দিয়েছি। সূত্রধারের নূতন অঘটন আর কি হল?"

বাবার কথায় তিনজন একটু মিইয়ে গেলেন। এখন পর্যন্ত ভোটোক গায়েন কোনো কথা বলেন নি, এখন তিনি আসল কথা বলতে মুখ খুললেন, "আমরা আর এসব ভেবে চুল ছিঁড়ে কি করব? সূত্রধারকে হিতাহিত জ্ঞান দেওয়ার আমার গরজ নেই। সেকথা বাদ দাও। কথা হচ্ছে মাধবদেবের জন্ম তিথিতে ভাওনা (ধর্মমূলক নাটক) গাইতে হবে না? এই সূত্রধারই তো এতদিন পর্যন্ত ভাওনার মূলটা ধরে রাখত। এখন নিরুপায়। নামঘর (সমবেত উপাসনার স্থান) খালি থাকতে পারে না বাঙ্‌থা আতাই।"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই গম্ভীর হয়ে পড়লেন। পাশের ঘরে বসে শুনতে পেলাম না ফিসফিস করে কি আলোচনা হচ্ছে। কিছু পরে বাবার গলা শোনা গেল, "সেবারে যে দুরাচার রাজা সাজবে বলে আমাকে ঠকিয়ে দশ টাকা নিয়ে সে পয়সা খরচ না করে রাংতার জিভ একটা লাগিয়ে অসুর সেজেছিল, এবারে তার রক্ষা নেই।" প্রকারান্তরে কথাটা আমাকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে বুঝলাম, কিন্তু তেমন ভয় পেলাম না। কথাগুলো হাসি মুখে বলছেন বলে মনে হল। আতাইরা সবাই আমার প্রশংসা করছিলেন বলেই মনে হল। হঠাৎ ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাবা হাঁক দিলেন, "কি, তোর চুল আঁচড়ানো শেষ হল না এখনও।" অর্থাৎ আমাকে তাঁদের সামনে হাজির হতে হবে। কাছে যেতেই বললেন, "তোকে সূত্রধারের দ্বায়িত্ব নিতে

হবে। কাল আমি মুকুন্দ গোসাঁইকে বলে দেব বাড়ি এসে শেখাবেন। তাঁর নিজের বাড়িতে তো একপাল ছেলেমেয়ে। শুনছিস্, তো?"

আমি 'হ্যা' হলে হতভম্ব হয়ে রইলাম। মনের আনন্দও মুখে ফোটানোর উপায় নেই। সূত্রধার হওয়ার ভাগ্যে মনটা টগবগ করে উঠল। নূতন বৌকে নিজের গুণটা এবারে দেখানো যাবে।

মুকুন্দ গোঁসাইর নাম ছোটবেলা থেকে শুনেছি। নগাঁয়ের ভাটি অঞ্চলে তার নাম সবাই জানে। গোঁসাইর গান যে একবার শুনেছে, সে সুর তার কানে বহু দিন বাজতে থাকে। লোকের মতে ধনশ্রী রাগ শুদ্ধ করে গাওয়ার মতো গুণী মুকুন্দ গোঁসাই ছাড়া নেই-ই বলতে গেলে। আমি অবশ্য গোঁসাইকে চোখে দেখিনি। গোঁসাই থাকেন চারিপোতা সত্রে, আমাদের এখান থেকে দু'মাইল দূর। আমাদের সমাজ ভিন্ন, তাছাড়া আমি ভক্তও নই। তাই সম্পর্ক কম। তাছাড়া বয়স হওয়ার দরুন গোঁসাই এখন চলাফেরা করেন কম।

বাবার মুখে শুনেছি যে এককালে চারিপোতা সত্রের প্রভুরা খোলে তালে গন্ধর্বের মতোই ছিলেন। কোন একটা গুরুচরিতে রয়েছে যে পরম গুরু শঙ্করদেব আর ধর্মপুরুষ মাধবদেব একবার নৌকা করে যাওয়ার সময় চারি (লগি) পুঁতে এখানে ভাত রান্না করেছিলেন। তাই এই সত্রের নাম চারিপোতা সত্র। সত্রটি অনেক প্রাচীন। এখানকার প্রাচীন সত্রধিকারীদের দেবতার মতো মান্য করা হত। মুকুন্দ গোঁসাইর গুণও অনেক। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের চার ভাগ নাট (সঙ্গীত বহুল নাটক) অবলীলায় গেয়ে যেতে পারেন। রাগরাগিনী ইত্যাদির উপর দখল তো বলে শেষ করা যায় না। খোলে তালে গীতে কথকথায় ভাবে ভক্তিতে তিনি পূর্বসুরীদের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছেন। তবুও আগের সেই রমরমা অবস্থা আর নেই। স্থায়ী ভক্তের সংখ্যা দিন দিন কমছে। গোঁসাইর নিজের অবশ্য তেমন কোনো পোষ্য ছিল না। মেয়ে একটিকে বিয়ে দিয়ে একাই ছিলেন। কিন্তু পরে বিধবা ভ্রাতৃবধূ আর তার ছেলেমেয়েদের আশ্রয় দিয়ে তাঁর দিন চলা দায় হয়েছে।

উঠান থেকে গোচারণের মাঠ দেখা যায়, সেখানে দেখলাম বাবা একজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। ময়লা ধুতি আর পাতলা চাদর গায়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। টিকালো নাক আর প্রশস্ত ললাট দেখে প্রথমেই আলাদা ধরনের মানুষ বলে চেনা যায়। কপালে চন্দনের ফোঁটা আর দীর্ঘ চুলের উপর তুলসী পাতা কয়টা একটা পবিত্র ভাব ফুটিয়ে দিয়েছে। আগন্তুক যে আমার গুরু তা বুঝতে পারলাম। সামনে যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতেই বাবা বললেন, "মাদুর তো ওখানেই রাখা আছে।" বুঝলাম বসার অনুমতি দেওয়া হল, আমি বসে পড়লাম। বাবার কথা শুরু হল, "আর কি বলব, প্রভু শুধু একেই কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছেন।" মনে হল দূর থেকেই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে গোঁসাই আগের কথার সূত্র ধরে বললেন, "মনে উৎসাহ পেলে কাক যেমন কা কা করে, আমিও তেমনি নামঘরে ঢুকে চেঁচামেচি করি। এমনিই। এককালে বরগীত শুনলে বনের হরিণও কান খাড়া করে শুনত। হিংস্র জন্তুও চিৎকার চেঁচামেচি ছেড়ে দিয়েছিল। বরারি রাগ শুনে সাগর তলায় মাছের উথাল পাথাল লেগে গিয়েছিল।

মৎস্য যত সাগরের ত্বরা করি যায়
সেই বেলা কানাই বরারি রাগ গায়।

এই হল দেববিদ্যা। আমরা কি তার যোগ্য?"

গোঁসাই-এর এই নম্রতা শুনে পুনরায় মুগ্ধ হলাম।

বাবা বললেন, "তুই লেখাপড়া জানা ছেলে। তোকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন জগৎগুরু, অর্জুনের সখা। তবু বাণ ছোঁড়ায় সময়ে অর্জুন কাকে স্মরণ করতেন—তাঁর ইষ্টগুরু কে ছিলেন?" কথাটা বুঝতে পেরে মাথা সোজা করে আমি বললাম, "শিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্যকে।" বাবা খুশি হয়ে বললেন, "ঠিক কথা, শিক্ষাগুরু দ্রোণকেই। দ্রোণ ছিলেন দরিদ্র, শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবের বিপরীতে যুদ্ধেও নেমেছিলেন। তবুও অর্জুনের গুরুর প্রতি ছিল অচলা ভক্তি। সেই কারণেই অর্জুন হলেন মহাধনুর্দ্ধর, যার সব শরসন্ধানই অব্যর্থ।" কথা থেকে বুঝলাম যে নবাগত গুরুকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে, তাই তাঁকে আবার প্রণিপাত করলাম। গোঁসাইও মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ করলে। "বিদ্যায় মন লাগুক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

পরদিন থেকে শিক্ষা গুরু হল। প্রথমে কয়েকটা গীতের সুর আর সূত্র-নাচে প্রয়োজনীয় খোলের বোল শেখাতে মনস্থ করলেন। প্রথম দিনই বলেছিলেন যে খোল তাল মৃদুঙ্গ নাগরা ইত্যাদি দেববাদ্যের ক্ষমতা অসীম। গুরুপুরুষ শঙ্কর যখন প্রথম খোলের ছাউনিতে 'ঘুণ' দিয়েছিলেন, তখন এত সুন্দর বোল উঠত না। একদিন ঘুণ দেওয়া খোলটি রোদে দেওয়ার পর কাক এসে খুঁটে গেল। তারপরই দেখা গেল গুরু শঙ্করের ইচ্ছামতো খোলে বোল উঠেছে। কারণ কাকের মুখের মধ্যে উচ্ছিষ্ট ভাত লেগে ছিল। সেই উচ্ছিষ্টের সংশ্রবেই খোল প্রাণ পেল। তাই আজকেও ঘুণ লেপ দেওয়ার সময়ে তার সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ভাত মিশিয়ে না দিলে ভাল বোল উঠে না। মৃদঙ্গর বেলাও সেই একই কথা। গুরুপুরুষ মৃদঙ্গ তৈরী করে তাকে কি ভাবে বাজানো যায় তা ভেবে দুদিন কাটিয়ে দিলেন। এমনি সময়ে আকাশ থেকে একটা পাখী উড়ে এসে তাঁকে কিছু ধ্বনি শিখিয়ে গেল। সেটাকে তিনি মৃদঙ্গের বোলে রূপ দিলেন। সেই পাখিটার নাম ভদোকালি। এখনও সেই পাখি কোনো কোনো বছরে পৃথিবীতে নেমে আসে। কথাগুলি যে ধরণের হোক, গুরুর মুখে বাদ্যযন্ত্রের পবিত্রতার বিবরণ শুনে মনটা একটা বড় কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল।

সূত্রধারের ভূমিকা শেখানোর জন্য রুক্মিনীহরণ নাটকখানা বেছে নেওয়া হল। গুরু প্রত্যহ সকালে আসেন আর সন্ধ্যায় বাড়ি যান। নূতন নূতন রাগরাগিনী আর পদ শিখে মনে বড় আনন্দ হচ্ছিল। গুরুর কণ্ঠের গান শুনে তো বিমোহিত হওয়ার অবস্থা। গলার কাঁপানিতে করুণ বা হর্ষের সুর কি করে আনা যায়, তা বুঝতে পারলাম। আমি মনোযোগ দেওয়াতে বাবা খুব খুশি। গোঁসাই আসার পরই তিনি প্রতিদিন দুপুরে এক ধামা করে চাল চাকরকে দিয়ে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। গোঁসাইকে টের পেতে দেন না। চাকরটা যদি কখনও ইতঃস্তত করে, তো বলেন, "তুই কি বুঝবি? এমন মানুষ যে আমার ঘরে পা দিচ্ছেন, সেই আমার ভাগ্য।"

গুরুর কৃপায়ই হোক আর বাবার চেষ্টায়ই হোক, ভাওনার অভিনয়ের সময়ে আমি সূত্রধার রূপে বেশ কাজ চালিয়ে দিলাম। গাঁয়ের সবাই বলল যে কমবয়সী এই সূত্রধারকে তাদের পছন্দ হয়েছে। গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে এল। পিতার অনুরোধে গুরু আরো পনেরো দিন যাওয়া আসা করলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে আবার রাসযাত্রায় সময়ে অভিনয়ে নামতে হল। এবারে গুরুর কাছে শিখিনি, তাই মহলা ঘরে আমার কি দুরবস্থা। দু'একদিন মহলা করার পর নিজেকে দিক্কার দিলাম। কেলি-গোপালের শেষের দিকের কোনো শ্লোকই আমি গাইতে পারি না। এমন নামী গুরুর কাছে খরচপত্র করে শেখার পরও গাইতে পারি না দেখে নিজেকে বড় অক্ষম মনে হল। গুরুর কাছে যাওয়ারও উপায় নেই, তিনি রোগে একেবারেই শয্যাশায়ী।

একদিন নাটকখানি সামনে নিয়ে মনমরা হয়ে বসে রয়েছি, এমন সময় হেমারবাড়ির রূপাই সূত্রধার এসে হাজির। মনের দুঃখে নিজের সমস্ত অক্ষমতার কথা তাঁকে বললাম। তিনি সব নাটকের সব শ্লোকই সুন্দর করে গাইতে পারেন।

আমার কথা শুনে তিনি যে কথা বললেন তা আমার মনে শেল হয়ে বিঁধল। তিনি বললেন যে রাগ আয়ত্ত করার একটা সুন্দর নিয়ম তো রয়েছে। যেমন সিন্ধুরা রাগে প্রথম সাতটা আখর কোমলে গেয়ে তারপর গলা ওঠাতে লাগে। আহীর রাগে প্রথম দুটো আখর ধীরে টেনে তারপর করুণ সুরে একসঙ্গে গেয়ে যেতে হয়। শ্রীগান্ধার রাগে প্রথম তিনটা আখর জোরে, তারপর ধীরে ধীরে গলা নামিয়ে আনতে হয়। এই উপদেশ অনুসারে দশটার মতো শ্লোক গেয়েই তাঁর কথার সারবত্তা বুঝতে পারলাম। যাওয়ার সময় রূপাই সূত্রধার বললেন, "আপনার শিক্ষক আপনাকে বারবার অভ্যেস করিয়ে কিছু সুর মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন, কিন্তু কোন রাগ কি করে চিনবেন, একটা রাগের সঙ্গে আরেকটার সাধারণ পার্থক্য কি, এগুলো শিখিয়ে না দিয়ে আসল চাবিকাঠিটিই ধরিয়ে দেন নি।

কথাগুলো শরীরে যেন বিষ হয়ে ঢুকল। শিখতে পারিনি, সেটা আমার দোষ। তার জন্য অক্ষম শিষ্যের গুরু দোষের ভাগী হতে পারেন না।

রূপাই সূত্রধার বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের বিখ্যাত কুচুটে বুড়ি বেরিয়ে এল। আমাদের দুজনের কথা বুড়ি শুনেছে বলে মনে হল। পরের দোষ গেয়ে বেড়ানোতে এই বুড়ির জুড়ি নেই, অথচ বুড়ি নিজেই হচ্ছে দোষের হাঁড়ি। তাই ওকে দেখলেই আমার রক্ত মাথায় উঠে যায়। বুড়ি বলতে শুরু করল, "সরুমণি, আমিও তাই বলি। রূপাই তো আসল কথা বলে গেল। হাজার হোক মুকুন্দ হচ্ছেন গোঁসাই । গোঁসাই মানুষ শূদ্রকে অকপট চিত্তে সব কিছু দিতে কোনো সময়েই চায় না। একটা শূদ্রের ছেলে নাচেগানে গীতপদে নামধাম করে ফেলবে, এটা গোঁসাইদের কোনো সময়েই পছন্দ হয় না। এগুলো যে তাদেরই আলাদা সম্পত্তি।"

আমার দিক থেকে কোনো উৎসাহ না পেয়ে বুড়ি কথা বন্ধ করল, কিন্তু সরে গেল না। তখন তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলাম। গুরুর কথা বারবার মনে হতে লাগল। শোওয়ার সময় মনে হল গুরু এই এক মাস ধরে শয্যাগত বলেই বুড়ি কতগুলো বাজে কথা বলতে পারল, রূপাই সূত্রধার নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করল। গুরুর অসুখটা ছাড়ুক। সব কিছু শিখে নিন্দুকদের থোঁতামুখ ভোঁতা করে দেব। গীতপদ রাগিনী তো আর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে শেখানো অঙ্ক নয় যে নিয়মটা শিখলেই সব হয়ে গেল। ছাঁইপাশ এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে রাত দুপুর হয়ে গেল। বিছানা থেকে উঠে উঠানে গিয়ে দেখি মাঝ উঠানে বাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কোথায় যেন প্যাঁচা ডাকছে। কাছের বাঁশ ঝাড়ের ঘন অন্ধকার জোনাকির মিটমিটে আলোয় যেন আরো রসহ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে এসে বাবা বললেন, "কিছু শুনতে পাচ্ছ না?" ভাল করে কান পেতে শুনে আমার বুকটা ধপাস করে উঠল। দূরে মাঠের ওপাশে সম্ভবতঃ ধমপুরা পুকুরের পার থেকে নারী কণ্ঠের করুণ আর্তি ভেসে আসছে। বাবা গম্ভীর ভাবে বললেন, "এ কোনো সাধারণ নারীর কান্না নয়। ইনি আমাদের এ অঞ্চলের ভাগ্যলক্ষ্মী। কোনো সন্ত মহন্ত চলে যাওয়ার সময় হলে এ কান্না শোনা যায়। সেবারে পছন্দের বাবা মারা যাওয়ার সময়ও এমনি কান্না শোনা গিয়েছিল। মুকুন্দ গোঁসাই-এর এই শুক্লপক্ষ পার হবে না বলে মনে হচ্ছে।"

বাবার কথাগুলো কান্নার চাইতেও ভয়াবহ শোনাল। সেদিন থেকে বাবা প্রত্যেক দিনই গুরুর ঘরে যেতে শুরু করলেন। আমিও তিন চারদিন পরপর একবার যাই। গানের বিভ্রাট বা সূত্রধারের কথা মন থেকে উধাও হয়েছে। গুরুর ঘরের খড়হীন চাল, তাঁর ভ্রাতৃবধূর রুক্ষ কেশ আর করুণ মুখচ্ছবি, আর ছেলেমেয়েগুলোর অসহায় অবস্থা দেখে প্রত্যেক দিনই ভাবতাম—এই অবস্থায় রুক্মিনীর রূপ সুন্দর করে বর্ণনা করা, প্রেমবিহ্বল বিরহ গীত আর ঈশ্বর মহিমার পদ মনের মধ্যে গেঁথে গেয়ে যাওয়াটা কম আশ্চর্য কথা নয়। কঠিন শিলার উপর গানের ফুল ফোটানো কম কথা নয়।

ভক্তদের পরিচর্যার অভাব ছিল না, কিন্তু গুরুর ভাল হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। পায়ের দিকটা শুকিয়ে গেল, কানের লতি ঝুলে পড়ল, নিঃশ্বাস মাঝে মধ্যে পড়ে কি পড়ে না। একটু আধটু ওষুধ দিতে গেলে খেতে চান না। নুন গরম করে সেঁক তাপ দিতে গেলাম, বললেন, "মরা হাঁসকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ কি?" আমি দুঃখিত মনে নিরাশ হয়ে বসে রইলাম।

একদিন সন্ধ্যায় গুরুর কাছে কেবল আমি আর বাবা বসে রয়েছি। তিনি আমাদের দুজনকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "বাঞ্ছা আতাই, আমি দু'দিন ধরে অপেক্ষা করে আছি আপনাকে আর ছেলেকে কখন একটু একা পাব। আজ সেই সুবিধা পেয়েছি। না হলে হয়তো মনের কথা মনেই থেকে যেতো। কথাটা বড় কঠিন, আমি আপনার কাছে আর ছেলেটির কাছে অপরাধী হয়ে আছি। সব কথাই আজ বলে যাব। আমাকে শেষ করতে দেবেন, মধ্যিখানে থামিয়ে দেবেন না। সব কথা বললে মনে শান্তি পাব। নিজের শরীরের অবস্থা বুঝছি, মরবার আর চারদিনও বাকী নেই। আপনারাও বোধহয় দুটো একটা লক্ষণ দেখছেন। তা ছাড়া কাল একটা স্বপ্ন দেখলাম। বালিসত্রের মহীদেও আতাই প্রায় ন'বছর হল দেহ রেখেছেন। কাল দেখলাম তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। তিনি যেন বরদোয়ার (শঙ্করদেবের জন্মস্থান) কাছে আশ্রয় নিয়েছেন আর অনেক সাধুসন্তের সঙ্গে সুখে হরিনাম কীর্তন করে সময় কাটাচ্ছেন। তিনি আমাকে নিতে এসেছেন। বারবার অনুরোধ করায় আমিও রাজী হয়ে গেলাম। এই স্বপ্ন থেকেই বুঝলাম যে আমার আয়ু আর নেই। জানেনই তো স্বপ্নে যদি মৃত ব্যক্তি কারো মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়, তবে তার প্রাণ সংশয়। আমার দিকে স্নেহভরে তো তাকিয়েছেনই, একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে বসেছিলেন।"

শোয়া অবস্থায়ই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করলেন, "যাই হোক যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটা কথা স্বীকার করে না গেলে মরেও শান্তি পাব না। এই ছেলেটিকে যে শিখিয়েছি, তাতে বিস্তর ফাঁকি থেকে গেছে। প্রথম মাসেই তাকে আরো ভাল ভাল জিনিস শিখিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু শেষে আমার বিষয় জর্জর পাপী মন বাদ সাধল। ভেবেছিলাম বাকীটা কার্তিক মাসে শিখিয়ে দেব। কিন্তু অসুখের জন্য তাও হল না। আসল সত্য কথাটা মুখে আটকে যাচ্ছে।"

গুরুর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কম্পিত হচ্ছে দেখে বাবা, 'সে সব কথা বাদ দিন' বলে কথা শুরু করতে গেলেন। কিন্তু গুরু তখন বাবাকে বাধা দিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন, "ছেলেটিকে ফাঁকি দিয়েছি ঈর্ষাবশতঃ নয় বাঞ্ছা আতাই, বিষয়ের জঞ্জালে পড়ে। আপনি জানেন, বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েগুলির কি অবস্থা। শ্রাবণ মাসের পর ঘরে ধান একমুঠিও থাকে না। আজ দু'বছর হল কিছু কিছু জমি বিক্রী করে

কোনো ক্রমে চলছিল। পৌষের আগে চুক্তির ধান পাই না। এই হল অবস্থা। এই সময় আপনার অনুরোধে ছেলেটিকে শেখাতে গেলাম। কোনো কথাবার্তা না বলে লুকিয়ে আপনি ধানচাল দিতে শুরু করলেন, তাতে কিছু সুরাহা হল। তখন একটা কথা মনে হতেই আমার মন পিশাচ হয়ে গেল। কিন্তু বাঞ্ছা আতাই, একটা অতি সাধারণ কথা কেন আমার মনে জাগল না?"

গুরু কি একটা গুরুতর কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাবা কথাটা অনুমান করেই যেন গুরুর মনকে হালকা করার জন্য বললেন, "কি কথা প্রভু।"

গুরু বললেন, "আমার একথা মনে আসা উচিত ছিল যে আপনার ছেলে সরুমণির শিক্ষা শেষ হয়ে গেলেই তার সঙ্গে বা আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে না। অনটনের দিনগুলির কথা ভেবে আমার মন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল। তাই সরুমণিকে সবকিছুই অতি ঢিমে-তেতালায় শেখাতে শুরু করেছিলাম।" গুরু এমন আবেগের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে তিনি আমার উপস্থিতির কথাও ভুলে গিয়েছিলেন।

বাবা সেদিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। আমিও গুরুর দিকে তাকিয়ে দেখি যে তার মুখের রং যেন কি রকম হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বাবার দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কেন এমন ভাবনা হবে না বাঞ্ছা আতাই। আজ একমুঠো পেটে জুটল তো কাল কি হবে তার চিন্তায় অস্থির হতে হয়। আমাদের গোঁসাইদের দুঃখের কাহিনী অন্যে জানে না। এই অবস্থায় দুই সন্ধ্যা স্নান করলে আর চন্দনের ফোঁটা চড়ালেই কি অন্তরখানি শুচি হয়ে যাবে? দেববিদ্যা শেখাবার সময়ও তো এই পার্থিব মনটাকে আলাদা করে সরিয়ে রাখতে পারি না। শাস্ত্রে পেয়েছি যে আগামীতে কি হবে তা ভাবতে নেই। সেই চিন্তা আগামী দিনগুলো নিজে করবে। সে কথার সারমর্ম কিছু বুঝলেও আমার মতে শাস্ত্রের সব মতই যুগধর্মের বাইরে নয়। দু'কুড়ি বছর আমি বহুকে মন উজাড় করে শিখিয়েছি। তখন আমার চারদিকে আনন্দের জোয়ার রয়েছে, রাগের প্রতিটা লয়ে মনটা পবিত্র হয়ে যেতো। এখন ভাবি, হে প্রভু, এমন বিপাকে ফেলে বন্দীর কাছ থেকে হৃদয়টা কেড়ে নিলে? ঠাকুর ঘরে পদ গাই, বাজাই, ঘোষা আওড়াই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে থই না পেয়ে কাঠখোট্টা গদ্যেই জিজ্ঞেস করি, হে নারায়ণ, বন্দী আমি, তোমার মহিমা কি বুঝব? তোমার সৃষ্ট সাধারণ জীবেরই তো একজন আমি। তবুও বিশ্বাস আছে যে আমি দুঃখ পেলে বোধহয় তুমিও দুঃখ পাবে। এই ক্ষীণ শান্ত্বনা নিয়ে বাঞ্ছা আতাই, এতদিন বেঁচে ছিলাম। তাই মিনতি করি, মূঢ়মতি আমি পাকেচক্রে পড়ে যে প্রথম আর শেষ পাপ কাজ করেছি, তা যেন আপনি নিজগুণে মার্জনা করুন। আরেকটা কথা। এই চালের উপর রাগ ও তাল সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ লেখা পুঁথিগুলি রয়েছে, আমার চিতার আগুন নেভার আগেই সেই

পুঁথিগুলি আপনি নিয়ে যাবেন। আমার দুই পুরুষ আগের এক ভক্ত এগুলো লিখে রেখেছিলেন। আপনার ছেলে তা থেকে যা শিখতে পারে শিখুক। দেববিদ্যার বীজ এই ভাবে দু'জন এক জনের মধ্যে রেখে না গেলে সংসারটা যে মরুভূমি হয়ে যাবে।"

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা, আমার প্রতি কোনো রাগ রেখো না।" আমার চোখে জল এল। কথা শেষ করে গুরু বাবার হাত ধরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাবা কোনোক্রমে বললেন, "আপনি এমন..." তাঁর মুখেও আর কথা যোগালো না। বাবার কাতরতা দেখে গুরুর বিশ্বাস হল, আর তাঁর বিবর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গুরুর সেবা যত্নের সুযোগ কিন্তু দু'দিনও পাওয়া গেল না। মৃত দেহটির কাছে আছাড় খেয়ে তার ভ্রাতৃবধূ শেষবারের মতো কাঁদলেন—জীবনে আর কারো জন্যে কাঁদতে হবে না বলেই হয়তো। অসহায় ছেলেমেয়েগুলি অতীত ভবিষ্যৎ কিছু না বুঝে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। উঠানে যারা জড়ো হয়েছিল, গুরুর জন্য তাদের সবার চোখে জল এল।

অনাথ শিশুগুলির পুতুলের মতো মুখে তাদের ভবিষ্যতের ছবি দেখলাম। ভাবলাম, মানুষের স্নেহ-মমতার মধ্যে বেঁচে থাকার দিন এদের শেষ হয়ে গেছে, ভবিষ্যতের কঠোর জীবনে এদের কারু মুখেই ধর্মগীত আর বেরুবে না। কদিন পরেই মানুষের কাছে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে এরা গাইবে—

এমন সুন্দর দেহ কোন দিন যায়,
এ মন ভরসা নাই...। ❒

**মহেন্দ্র বরঠাকুর**

জন্ম 1938, শিবসাগর জেলার মহখুটিতে। কলা স্নাতক। প্রথমে শিক্ষাকতা। 1967 সাল থেকে আকাশ-বাণীর কর্মী। 1969 সালে প্রথম উপন্যাস উদাসী সন্ধ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত অন্য উপন্যাস ঃ বেগম পারা, বেলিয়ল, পনীয়া সোণর দেশ। কয়েকখানা বেতার নাটক ও ব্যঙ্গ রচনার লেখক। মঞ্চনাটক 'জন্ম'। কলেজ জীবন থেকেই গল্প লিখেছেন, যদিও এখনও সংকলন গ্রন্থ বেরোয় নি।

# কিছু ভাল লাগছে না

মোটের উপর আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি আর পারি না। আমার মন বলছে কিছু একটা করার জন্য। কি করব অবশ্য বলতে পারছি না। কিন্তু কিছু একটা হুলুস্থুল করতে, একটা অঘটন ঘটাতে, একটা কিছু এলোমেলো ব্যাপার করতে আমার মন চাইছে। বলতে পারব না কেন এমন লাগছে। কী যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করছি। আমার সামনে রাখা আয়নাখানি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে মন চাইছে, চেয়ার টেবিলগুলো ভাঙ্গতেও মন চাইছে। কেন এমন হয়েছে বলতে পারি না, কিন্তু সাধারণ ভাবে করা যায় না এমন কিছু করতে আমার মন চাইছে। আমার অসহ্য লাগছে, মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। কিছু একটা না করতে পারলে মন শান্তি পাচ্ছে না, কিন্তু এমন লাগছে কেন? তাহলে কি আমার রাগ হয়েছে? কিন্তু রাগটা কার উপর? রাগ উঠলেই বা আমি কাকে কি করতে পারি? রাগ অবশ্য বলতে পারি না। সেই দু'মহলা বাড়ির একেবারে কোণের সেই ঘরটা, যেখানে দামী কার্পেট, প্রকাণ্ড টেবিল, গান্ধী নেহরুর ছবি ইত্যাদি সুন্দর ভাবে সাজানো, সেখানে যে বিলেতী পোশাক পরা মোটা-সোটা মানুষটি, বা ধপ্‌ধপে চুড়িদার পাঞ্জাবী পরা নেতা-নেতা চেহারার মানুষটি, বা ক্ষীণ, শক্ত ফ্রেমের চশমা-পরা এণ্ডির চাদর গায়ে পণ্ডিত-পণ্ডিত চেহারার মানুষটি, তাঁদের একজন বা সবাইর উপরই কি আমার রাগ হয়েছে? হতেও পারে। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়, এখন পর্যন্ত আমি বোধহয় তিনকুড়ি দু'বার বা তিনকুড়ি ছ'বার এ ধরনের লোকের সঙ্গ পেয়েছি। স্কুল ছাড়ার পর এদের আমি তিনকুড়ি দু'বার বা তিনকুড়ি ছ'বার বোধহয় সেলামই দিয়েছি। আর এরা সেই তিনকুড়ি দু'বার বা তিনকুড়ি ছ'বারই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। কামাখ্যা পাহাড়ে ওঠার রাস্তাটা কে বাঁধিয়েছেন, আমার গায়ের জামাটার বোতামের সংখ্যা কত, আইনষ্টাইনের আবিষ্কার করা "থিয়োরি অব (ধ্যেৎ, ভুলে গেছি)—" কোথায় যে কোন ফুটবল খেলায় কে ভাল খেলল, রাজ্যের হাইকোর্টের মুখ্য ন্যায়াধীশ কে, গরুর শরীরে কটা হাড় থাকে, ইত্যাদি বহুতর কথা বলে তারা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করেছেন।

হতেই পারে, এদের ওপর আমার রাগ হতেই পারে। আমি শুনেছি বড় মামা আমার উপর রাগ করেছেন। করুক রাগ। আমি কি করতে পারি? বড় মামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"এই, তুই আজকাল কি করিস?" বলে দিলাম—"ইণ্টারভিউ দিই।" মিথ্যা বলেছি নাকি? একথাটা বলার জন্য যদি রাগ করে থাকেন তবে আমার কি করার আছে? রাগ হচ্ছে, সত্যিই আমার বড় রাগ হচ্ছে। কার ওপর রাগ বলতে পারি না, কিন্তু রাগ হচ্ছে এটা সত্যি। হাইস্কুল পাশ করে আমি চাকুরী খুঁজতে শুরু করলাম। সবাই বলল টাইপটা পাশ করে নিলে সুবিধা হবে, করলামও। চার কুড়ি টাকা আর তিন মাস সময় নষ্ট করে টাইপের ডিপ্লোমা একটা নিলাম। নিয়োগ বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখালাম। কর্মখালির বিজ্ঞাপনের জন্য খবরের কাগজ একটা রাখলাম। কিছুই হল না। কিচ্ছু না। এখন অনেকে আমাকে পরামর্শ দিল যে শর্টহ্যাণ্ড শিখে নাও, অনেক চাকুরী মিলবে। শর্টহ্যাণ্ড শেখার পর বলবেন বি.এ.টা পাশ করে নাও। বি.এ. পাশ করলে বলা হবে সিম্পল গ্র্যাজুয়েট হলে কি আর হবে, অনার্স থাকলে বরং কথা ছিল। ফলে কিছু হবে না, এগুলো সব বাজে কথা। এখন ডিপ্লোমাটাই শুধু রয়েছে, টাইপ করা বোধহয় ভুলেই গেছি। 'প্র্যাকটিস' করার সুবিধা না পেলে আমি কি করব? টাইপ শিখলাম বলে তো বাড়িতে একটা টাইপরাইটার এনে রাখতে পারি না। আমার মনের এই পৃথিবীতে যে সমস্ত লোককে আমি ভাল মানুষ বলে ভেবেছি, তাদের আসলে মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। টাইপের ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম, আমাকে জিজ্ঞেস করল নোবেল পুরস্কার জয়ী সাহিত্যিক একজনের কথা, কি নাম যেন বলেছিল—? বেকেট? হ্যাঁ, বেকেটই। স্যামুয়েল বেকেট গদ্য লিখেছেন কি পদ্য লিখেছেন আমি কি করে জানব? আমি কি কোনো সাহিত্যসভার সভাপতির পদ চাইছি যে আমার সে সমস্ত কথা জানতে হবে? কিন্তু তা না জানলে আমি নাকি চাকুরীর যোগ্য নই। না হলে আর কি করা যাবে? কোন রাজ্যে কে মন্ত্রী রয়েছেন তা আমি জানি না। এক সময়ে সে সমস্ত মুখস্ত করে রেখেছিলাম, পরে ধীরে ধীরে সেগুলো নিরর্থক হয়ে গেছে, কারণ প্রায় সবাই বদলে গেছেন। সব সময় এসমস্ত নাম নূতন করে কি করে মনে রাখা যায়? আমার এ সমস্ত ভাল লাগে না। আমার তাহলে ইণ্টারভিউ যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের উপর রাগ হয়েছে নাকি? কেন, বাবার উপরও তো আমার রাগ হতে পারে। বাবা বলেছেন, "বড় কষ্ট করে তোকে বড় করেছি। যতখানি সামর্থ ছিল, ততখানি পড়িয়েছি। জ্ঞান বুদ্ধি যা হওয়ার হয়েছে। এখন আমি তোর জন্য ভাবব, না তুই আমার জন্য ভাববি?"

আমি জানি না কে কার জন্য ভাববে। আমাকে বড় করতে বাবাকে কেন কষ্ট করতে হয়েছে তাও আমি জানি না। যদি হয়েই থাকে, তবে তার জন্য আমি দায়ী নাকি? আমার এ সমস্ত কিছু ভাল লাগে না। কিছু একটা করতে হবে তা

আমি বুঝি। বাবা মার জন্য, বাড়ির জন্য আমার কিছু একটা মাসে উপর্জন করার ব্যবস্থা করা দরকার কিনা তা জানি না। কিন্তু আমার নিজের জন্য যে কিছু একটা করা দরকার, সেটা আমি বুঝি বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি বুঝি, সব বুঝি। আর আমি এটাও বুঝি যে আমি চাকরী-বাকরী করে উপার্জন করলে মনিকা, দীপিকা, বাবুল—অর্থাৎ আমার ভাই বোনেরা আমাকে ভয় করবে, সম্মান করবে, সমীহ করবে, সবই করবে। এ সমস্ত কথা আমি বুঝব না কেন? বড় মামার উপরই আমি রাগ করেছি কিনা কে জানে? দু'বছর পর এসে বড় মামা মস্ত একটা লেক্‌চার দিলেন আমার কর্তব্য সম্পর্কে। তাঁর মতে আজকালকার ছেলেমেয়েরা একেবারে যেন কি হয়ে গেছে। তাঁদের দিনে আমাদের বয়সের ছেলেমেয়েরা বাবার পয়সায় অন্ন ধ্বংস করতে বড় লজ্জা পেতো নাকি। বড় মামা এও বললেন যে তিনি হাইস্কুলে মাত্র দু'বছর পড়ে বাগানে কাজ নিয়ে টাউনে বড়সড় বাড়ি করে বসেছেন। তিনটি বোনকে বিয়ে দিয়েছেন। নিজের ছেলেকে পড়িয়ে শুনিয়ে চাকুরীতে ঢুকিয়েছেন। হতে পারে। তোমাদের দিনে যে সব ভাল ভাল কাজগুলো হতো তা আমার জানা আছে বড় মামা। এখন যে পৃথিবী রসাতলে গেছে তার কারণও আমার জানা আছে। এত লেকচার দেবে না। দরকার নেই এই সমস্ত লেকচারের। হুঁ, আমার নাকি বিজনেস করা উচিত, পড়াশুনা না করলে আজকাল ভাল চাকুরী হয় না। সে আমি বুঝি, কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে যে ফাইভ পর্যন্ত পড়া তোমাদের গ্রামের কোন এক ছেলে মন্ত্রী না মন্ত্রীর সমান বড় চাকুরী করে এবং তার নীচে এম.এ. পাশের চাইতে বিদ্বান মানুষ কাজ করে। হুকুম দিতে হলে ফাইভ পর্যন্ত পড়া মানুষটি এম.এ.পাশের চাইতেও বেশি বিদ্বান চাকুরেটিকে দিয়ে থাকে। নিজেই সেই সমস্ত কথা বলে এখন আমাকে বিজনেস করার কথা বল কেন? বিজনেস করা উচিত তাও বুঝি। দাও তো দেখি এক থোক টাকা। বেশি লাগে না—এক হাজার টাকা দিয়েই সাহায্য কর। ভবিষ্যতে শোধ দেব। হুঁ, তখন আর কোনো কথা সরবে না, ইচ্ছা থাকলে নাকি মূলধন না হলেও বিজনেস করা যায়। দাও না পথ দেখিয়ে, দাও তো, তারপর করব সব করব, তোমার বুদ্ধি কি আমি নিই নি। তোমার কথা মতো আমি কতবার রাজধানী যাতায়াত করলাম বল তো? আসা যাওয়াতে কত টাকা খরচ হল জান নাকি? কত টাকার ষ্ট্যাম্প কিনেছি খবর রাখো? এখন দু'বছর পর খবর এসেছে একুশ' 'শ' টাকা জমা দিলেই ব্যাঙ্ক নাকি আমাকে টাকা ধার দেবে। কোথায় পাব আমি একুশ' 'শ' টাকা? এই যে রাজধানী যাতায়াত করে এতগুলো টাকা উড়ালাম, তা থেকে কি লাভ হল বল? লাভের মধ্যে বাবা আমাকে দেখতে পারেন না। ইণ্টারভিউ দেওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া খুঁজে পাই না। ট্রেজারি চালান লাগলে দরখাস্ত এখন আর করি না। বুঝেছো, কখনও রিক্সা চালাতে মন যায়। কিন্তু যে স্বাস্থ্য নিয়ে আমি এক কুড়ি পাঁচ বছরে পা দিয়েছি, সে স্বাস্থ্য নিয়ে যে রিক্সা চালানো যায় না, তা তোমরা আমাকে

দেখলেই বুঝবে। আমার স্বাস্থ্যটাকেও তোমরা ভাল করে দিতে পারলে না। এত ঝামেলার মোকাবিলা করার জন্য তোমরা আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছ? সাত-আট বছর স্কুলে যাতায়াত করেই বা আমি কি পেয়েছি? সেই ঘোপা মাষ্টারের 'গরু', 'গাধা', 'মা-বাপের রক্ত চোষ', 'নরকে যা' ইত্যাদি গালাগালি, ভূগোলের মাষ্টার বগলা স্যারের, "ভূগোল আসলে বাড়িতে পড়তে হয়, ক্লাসে ভূগোল পড়া হয় না,' ইত্যাদি উপদেশ। "বাপু বলতো ভারতের মধ্যে সবচাইতে বেশি চায়ের ফলন কোথায় হয়?"

ঃ "আসামে, স্যার।"

ঃ হ্যাঁ, আসামে। চা বাগান দেখেছিস্? তোর মামা না কে যেন বাগানে কাজ করে?"

ঃ হ্যাঁ, স্যার।"

ঃ "মাঝে মাঝে তোদের বাড়ি আসে না?"

ঃ "আসেন, স্যার।"

ঃ "চা পাতা আনে না? মাকে বলবি মাষ্টার মশাই একটু চা পাতা চেয়েছেন, বুঝলি?"

ঃ বলব, স্যার।"

ঃ "হুঁ, বাগানের চায়ের স্বাদই আলাদা। এই দোকানের চা খেতে খেতে—"

এই সমস্ত কথা সবই মনে আছে। না, এই সমস্ত কথা আর বলব না। বললে সবই জট পাকিয়ে যাবে। কেউ যেন আমাকে আর নীতিকথা শোনাতে না আসে। নীতিকথা আমিও কম জানি নাকি? "সদা সত্য কথা বলিবে," "পরের অপকার করা মহাপাপ", "চুরি করা পাপ," ইত্যাদি ইত্যাদি নীতিবচনগুলো কে মানছে? সত্যি বলছি, আমার কিছু একটা গুরুতর করতে ইচ্ছা হচ্ছে আর তাই খুব রাগ হয়েছে। সঠিক বলতে পারব না। পুলকের উপরও আমার রাগ হতে পারে। পুলক আমার ছোটবেলা থেকেই বন্ধু। দু'জন একসঙ্গে পড়েছিও। স্কুলে এক সঙ্গে গেছি। পরে সে আমার চাইতে বেশি পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। এখন বুঝি খুব বড় চাকুরি করে। ঘরবাড়ি করেছে, মোটর গাড়িও একটা কিনেছে। কিনুক, আমি কি আপত্তি করেছি নাকি? না আমি তার কাছে টাকা চাইতে গেছি? আমি জানি বাপু, শুধু চাকুরীর বেতনে 'গাড়ি-বাড়ি-নারী' কেউ বাগাতে পারে না। ফুটুনি করলে কি হবে? সেদিন তার সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি হওয়ায় জিজ্ঞেস করল—"কিরে, তোর খবর কি? কোথায় কি করছিস?" আমি যতখানি পারি আন্তরিক ভাবেই তাকে আমার জন্য একটা চাকুরী খুঁজে দিতে বললাম। সে খপ করে বলল— "চাকুরী? কত ইঞ্জিনিয়ারিং—মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট বেকার হয়ে বসে রয়েছে। তোর কথা বাদ দে।"

সে আমার কথা বাদ দিতে বললেই কি আমি আমার নিজের কথা বাদ দিতে পারব? আরেকটা কথা আমার মনে লেগেছিল। সেদিন তার সঙ্গে তার নূতন বিয়ে করা বৌ ছিল। আমার সঙ্গে অন্ততঃ পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দিল না। অথচ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই অপর দিকে থেকে আসা একজন হাকিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ব্যাপারটা আমার মনে লেগেছিল। আমারও সেণ্টিমেণ্ট বলে একটা বস্তু রয়েছে, এই পুলকের দৌলতে আমার ঘরে বাইরে শান্তি নষ্ট হওয়ার যোগাড় হয়েছে। বাড়িতে ভাল ছেলের উদাহরণ দিতে হলেই মা-বাবা পুলকের কথা বলেন। আমি চুপ করে থাকি, যদিও মাথাটা গরম হয়ে ওঠে।

বাড়িতে আর কত বসে থাকব? ভাল লাগছে না। মাথাটা বড় ব্যথা করছে। উঠেও যেতে ইচ্ছা হয় না। চা এক কাপ খাব নাকি? কাকে চা এক কাপের কথা বলা যায়? মনিকাকে বলা যাবে না। সে এতক্ষণে কোথায় কার সঙ্গে যাবে বলে 'মেকআপ' করে বেরিয়ে গেছে। চুপ করে থাকি, যদিও আমি সবই বুঝি। মাকেই ডেকে বলব নাকি? দূর, মা হয়তো বলে বসবেন, "এত ঘন ঘন চা খেতে হলে দুধ চিনির যোগাড় দিতে হয়।" হয়তো তার চাইতেও কড়া করে বলতে পারেন, "বাইরে গুণ্ডামি করে বেড়াবে আর আমি চা জলখাবার জুগিয়ে যাব—।

দরকার নেই। তার চাইতে বাইরে গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে কোনো দোকানে বসলে হয়। সামসুলের ওখানে গেলে সব চাইতে ভাল ছিল। কিন্তু তাকে তো বাড়িতে পাওয়াই যায় না। আজকাল কি যেন ইউনিয়ন করছে। ইউনিয়গুলো ঠিক কি সমস্ত করে আমি ভাল জানি না। কখনও বা ষ্ট্রাইক করে, কখনও বা মিটিং, হাত উচিয়ে বক্তৃতা দেয় দেখেছি। ওরা কখনও কখনও বেশ ভাল ভাল কথা বলে। বড় বড় কথা বলে। কি সমস্ত পাওয়া না পাওয়া, কি সমস্ত পুঁজিপতি, শ্রমিক এমনি সব কথা। সংগ্রাম করার কথাও বলে। সমস্ত কথা অবশ্য আমি বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও কখনও করিনি। কিন্তু ওরা কিছু একটা হুলুস্থুল করলে আমার খারাপ লাগে না। ওদের সঙ্গে মিলে কিছু একটা করতে আমারও ইচ্ছা হয়।

অ! সেই মিটিং টি! কলেজের ছেলেমেয়েরা মিলে যে মিটিংটা করেছিল! কেন যেন মিটিংটা ডেকেছিল? ও , টেষ্ট পরীক্ষায় অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ফেল করার প্রতিবাদে। বেশ গরম গরম কথা হচ্ছিল কিন্তু। দেখতেও বেশ ভাল লাগছিল, সেই মেয়েগুলো জড়ো হয়ে কি যেন করছিল। মিছিমিছি হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে। ছেলেগুলোও—কি যে এই সব। এ সমস্ত দেখলে আমার রাগ ওঠে। উঠবে না কেন? বন্দনা নামে সেই মেয়েটি মৃগেনের সঙ্গে কম লটঘট করেছিল? মৃগেনকে পাগল করে দিয়ে অন্য একটা ছেলের সঙ্গে শেষে পালিয়ে গেল। ভালই হয়েছিল, এদের এইভাবে শাস্তি পাওয়াই উচিত। প্রেম? থুঃ! এখন

আবার শুনছি মৃগেন নাকি আবার কার সঙ্গে ভিড়েছে। বুরবক! আবার ফাঁসবে। আচ্ছা, সেই যে ছেলেটি মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়েছিল—আমি অবশ্য তত ভাল করে বুঝিনি কথাগুলো। আমার মজা লেগেছিল তার ভঙ্গিটা— হাত ঘুরিয়ে, গলার শিরা ফুলিয়ে কাকে যেন ঘুষিয়ে মারতে যাচ্ছে। ইচ্ছা হয়েছিল সেই ছেলেটির মতো আমিও কিছু একটা করে বসি। আমার কি বলার মতো কোনো কথা ছিল? নিশ্চয়ই ছিল, অনেক ছিল। ইণ্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পরদিন ইণ্টারভিউর 'কল লেটার' পাওয়ার কথা, অথবা আরেক দিন আসার কথা, তিনকুড়ি দু'বার না ছ'বার ট্রেজারি চালান দেওয়ার জন্য তিনকুড়ি দু'দিন না ছ'দিন ট্রেজারিতে বসে বসে সময় নষ্ট করার কথা, অনেক কথা বলার ছিল। আমার কথাগুলো কাউকে শোনাতে পারি না, তাই আমার শরীরে সব সময়ই একটা জ্বালা থাকে, গা যেন পুড়ে যায়। থিয়েটারে যা দেখেছিলাম—যুদ্ধযাত্রার আগে সেনাপতি যেমন করে কথা বলে, ঠিক তেমনি সেই ছেলেগুলির কথা শুনেও আমার মনটা দপ্‌দপ্ করে উঠেছিল। ছেলেটির কথা শেষ হওয়ার পরই আমি মাইকটার কাছে পৌঁছেছিলাম এবং মাইকটা ধরে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তক্ষুনি ছেলে একটা এসে "বাইরের মানুষ," "বাইরের মানুষ" বলে আমাকে ঠেলতে শুরু করল। আমাকে ধাক্কা দিলে আমার রাগ হবে না? দিলাম তার নাকে একটা ঘুষি চালিয়ে। তারপর কি যে হল। মাথায় প্রথম আঘাতটার কথা মনে পড়ে, তারপর আর কিছু মনে নেই। ক'দিন যে হাসপাতালে ছিলাম কে জানে? ছিলাম নিশ্চয়ই বেশ কিছু দিন। এখন আমাকে বাড়িতে না আনলেই হতো। অনেকখানি রক্ত নাকি বেরিয়ে গেছে আমার।

ইস্, গোটা শরীরটাই ব্যথা করছে। মাথাটা ভারভার ঠেকছে। তবু আমার উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিছু একটা করতে ইচ্ছা করছে। আমার মন চাইছে এই আয়নাটা ভেঙ্গে ফেলতে, ঐ চেয়ারটা ভেঙ্গে ফেলতে, মন চাইছে...। ❒

**Laser typeset at The Excutive Printer, 37, A. P. C. Road, Calcutta-700009 Printed at : Shagun Offset, New Delhi**